বন্দে মাতরম্

জগদীশ ভট্টাচার্য

কবি ও কবিতা প্রকাশন
১০ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ
১৩ আষাঢ় ১৩৮৫
June 1978

মুদ্রক
এস. কুণ্ডু
জয়গুরু প্রিন্টার্স
৪এ, বৃন্দাবন বোস লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রকাশক
মিহির ভট্টাচার্য
১০ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদের অক্ষরশিল্পী
গৌতম ভৌমিক

যাঁরা
বন্দে মাতরম্ মন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে
স্বদেশের বন্ধনমোচনের জন্য
জীবন উৎসর্গ করেছেন
তাঁদের স্মরণে

গ্রন্থকারের নিবেদন

১

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের ইতিহাস, অর্থ ও তাৎপর্যের অনুসন্ধান করাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। আমাদের ধারণা 'বন্দে মাতরম্' আমাদের 'জাতীয় সংগীত'। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে জাতীয় সংগীত বা রাষ্ট্রীয় সংগীত—National Anthem বা National Song-এর কোনো উল্লেখ নেই। আমাদের গণপরিষৎ ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর ভারতের সংবিধান রচনা সম্পূর্ণ করে তা জাতিকে উপহার দেন। সংবিধানের চিত্রিত মুখবন্ধের ভাষা হল 'In our Constituent Assembly this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.' কিন্তু গণ-পরিষদের শেষ অধিবেশন বসে ১৯৫০ সালের ২৪শে জানুয়ারি। সেদিনই সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ 'জাতীয় সংগীত' সম্পর্কে বিবৃতি দেন। সভাপতির বিবৃতিতে দেখা যায়, বিষয়টি অনেকদিন ধরেই আলোচনার অপেক্ষায় ছিল। কথা ছিল তা প্রস্তাবের আকারে গৃহীত হবে। সংবিধান রচনা সম্পূর্ণ হয়ে যাবার প্রায় দুমাস পরে পরিষদের অন্তিম অধিবেশনে সদস্যগণ যখন তাতে স্বাক্ষর যোজনার জন্য সমবেত হন তখন অকস্মাৎ সভাপতির মনে পড়ে যায়, 'জাতীয় সংগীত' সম্বন্ধে প্রস্তাবগ্রহণ বাকি রয়েছে। তখন আলোচনার আর অবকাশ ছিল না, অতএব সভাপতি বিবৃতি দিয়ে বললেন, 'জনগণমন'ই হবে ভারতের রাষ্ট্রীয় সংগীত, আর 'বন্দে মাতরম্'ও সমভাবে সম্মানিত হবে এবং 'জনগণমনে'র সমমর্যাদা পাবে।' 'shall be honoured equally with Jana Gana Mana and shall have equal status with it.' [দ্রষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১০৭-১০৮]।

১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারি ভারতের আইনমন্ত্রী এইচ. আর. গোখেল সংবিধানের প্রারম্ভিক ভূমিকায় [The Constitution in operation] বলেছেন, 'The framing of the Constitution was completed by November 26, 1949, and while a few of the provisions came into force on that day, the remaining provisions came into force on January 26, 1950.' কিন্তু এই 'অবশিষ্ট বিধানসমূহে'র মধ্যে 'জাতীয় সংগীতে'র কথা কোথাও নেই। সেই জন্যই আমরা বলেছি, ভারতীয় সংবিধানে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় সংগীত অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

কিন্তু 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র ১৯৬৪ সালের সংস্করণে, ষোড়শ খন্ডের ১৩৫ পৃষ্ঠায় 'National Anthems' শিরোনামায় 'জনগণমন'কেই ভারতের রাষ্ট্রীয় সংগীত বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে : "Jana Gana Mana" words by R. Tagore, tune attributed to him but probably traditional (adopted 1950).

এই মন্তব্য শুধু কৌতুককর বলেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই সম্পর্কে ১৯৩৭ থেকে ১৯৫০,—এই চোদ্দ বৎসরের কালসীমার মধ্যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কীর্তিকলাপের কথাও এসে পড়ে। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী ভারতের জাতীয় সংগীত ছিল বন্দে মাতরম্। অবশ্য তার সঙ্গে আরো দু-একটি গানের উল্লেখও করা কর্তব্য। তন্মধ্যে ইক্‌বালের 'সারে জহাঁ সে অচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হমারা' গানটির কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। টেন্ডুলকরের গান্ধীজীবনী 'Mahatma'-র প্রথম খণ্ডে 'পলাশী থেকে অমৃতসর' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'Bankim's "Bande Mataram" and Iqbal's "Hindostan Hamara" were the battle hymns which resounded throughout India.' [পৃ ৬]। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯২০-২১ সাল থেকে আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তার তিনটি জয়ধ্বনি ছিল। মহাত্মা গান্ধীর মতে পর্যায়ক্রমে এই ধ্বনিত্রয় হল : ১. আল্লা-হো-আকবর, ২. বন্দেমাতরম্ অথবা ভারত-মাতা-কি-জয়' এবং ৩. হিন্দু-মুসলমান-কি-জয়'। [টেন্ডুলকর, ২/৭]। দ্বিতীয় ধ্বনি সম্পর্কে, টেন্ডুলকর বলেছেন, গান্ধীজি 'ভারত-মাতা-কি জয়'-এর স্থলে 'বন্দে মাতরম্'-ই বেশি পছন্দ করতেন। কেননা, গান্ধীজির মতে "It would be a graceful recognition of the intellectual and emotional superiority of Bengal".

ধ্বনি সম্পর্কেই শুধু নয়, 'বন্দে মাতরম্' সংগীত সম্পর্কেও মহাত্মা গান্ধীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আজীবন অবিচলিত ছিল। ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারি তিনি 'হরিজন' পত্রে লিখেছিলেন, 'It is enthroned in the hearts of millions. The flag and the song will live, as long as the nation lives (বর্তমান গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ২৪]।

কিন্তু রাজনীতির ইতিহাস সহজ পথে চলে না। ১৯৩৭ সালে পৌত্তলিকতার অপরাধে কংগ্রেস 'বন্দে মাতরমে'র অঙ্গচ্ছেদ করলেন। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৭ সালে ন্যুইয়র্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় ভারতের জাতীয় সংগীত হিসাবে বাদ্যযন্ত্রে 'জনগণমন'কেই বাজানো হল। এই

নিয়ে গণপরিষদের ভিতরে এবং বাইরে প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠলে জওহর-লাল গণপরিষদে বিবৃতি দিয়ে বললেন, বাদ্যযন্ত্রে অন্য কোনো সংগীত না থাকায় বাধ্য হয়েই এই ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। তারপর পরিষৎ কর্তৃক গঠিত 'জাতীয় সংগীত নির্ধারণ কমিটি' রায় দিলেন যে, এর পর থেকে 'বন্দে মাতরম্' এবং 'জনগণমন'—উভয় সংগীতকেই ভারতের জাতীয় সংগীত হিসাবে স্বীকার করা হবে। 'বন্দে মাতরমে'র প্রথম সাত পংক্তি হবে কণ্ঠসংগীত। আর 'জনগণমন' হবে যন্ত্রসংগীত। এই সিদ্ধান্ত অসংগত হয়েছে বলা যাবে না। পৃথিবীর অন্তত আরো দুটি রাষ্ট্রে দুটি করে জাতীয় সংগীত আছে। তাছাড়া, একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, বাদ্যযন্ত্রে 'বন্দে মাতরমে'র চেয়ে 'জনগণ-মন' অনেক বেশি শ্রুতিসুখকর। কাজেই 'বন্দে মাতরম্'-কে কণ্ঠসংগীত এবং 'জনগণমন'কে যন্ত্রসংগীত হিসাবে যে সুপারিশ করা হয়েছিল, সর্বজন-গ্রাহ্য না হলেও তা অসংগত হয় নি। কিন্তু গণপরিষদের অন্তিম অধিবেশনে এ সুপারিশও অগ্রাহ্য করা হল।

২

'বন্দে মাতরম্' পৌত্তলিক কি না, এবং এর অর্থ ও তাৎপর্য কি, তা বুঝতে হলে বঙ্কিমমানসের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। 'ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে'র ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'কবিতা দর্পণ মাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্তি—তাহা ত আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে, এই কীর্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান শিক্ষা ও জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।'

বঙ্কিমচন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গি আমরা সমর্থন করি। তাই এই গ্রন্থে বঙ্কিমমানসের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে যে 'নবধর্মে'র কথা বলেছেন তার মূলসূত্র হল: বৃত্তিনিচয়ের অনুশীলন প্রস্ফুরণ ও সামঞ্জস্যবিধানের ফলে মানুষ যে মনুষ্যত্ব লাভ করে সেই মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম। এই সূত্রানুসারে বঙ্কিমচন্দ্রকে মানবতাবাদী বলাই সংগত। অধ্যাপক বিনয় সরকার বলেছেন, It is not without significance that Chatterji is interested in recreating Hinduism on non-theocratic, godless and humanistic Comptist foundations--

['Villages and Towns as Social Patterns', পৃ ৩৫৯]। অধ্যাপক সরকারের এই মন্তব্য নির্বিচারে গ্রহণ করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম জীবনে নাস্তিক ছিলেন, একথা তিনি নিজেই বলেছেন। 'সাকারোপাসনা জ্ঞানোন্নতির কণ্টক-স্বরূপ'—এও তাঁরই উক্তি। 'বন্দে মাতরম্' এই সময়েরই রচনা। কিন্তু শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মচেতনার পরিবর্তন ঘটেছিল। সাময়িক-পত্রে 'ধর্মতত্ত্বে'র যে রূপ ছিল, গ্রন্থ-প্রকাশকালে তার পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তিত ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র মানবতাবাদী হলেও নিরীশ্বর নন। বর্তমান গ্রন্থে এবিষয়ে নাতিবিস্তর আলোচনা করা হয়েছে।

আমরা বলেছি, 'বন্দে মাতরম্'-এর যুগল-মহাভাষ্যকার হলেন বিপিনচন্দ্র পাল ও ঋষি অরবিন্দ। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য এই গ্রন্থে বারবার উদ্ধৃত হয়েছে। বিপিনচন্দ্র পাল শ্রীঅরবিন্দ-সম্পাদিত 'ধর্ম' পত্রিকায় 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে যে অসামান্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেই প্রবন্ধ বন্দে মাতরম্ সংগীতের অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণে আমার বিশেষ সহায়ক হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধে ব্যবহৃত পরিভাষা—'অভিধেয়' ও 'অনুবাদ'—আমি গ্রহণ করেছি : এবং স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীরের ব্যাখ্যায় তাঁর 'ধ্যান' ও 'সমাধি'র কল্পনা আমার পথপ্রদর্শক হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক যে, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের স্বরূপনির্ণয়ে আমি 'পঞ্চদশী' ও 'বেদান্তসার' থেকে যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছি, এবং উল্লেখপঞ্জীতে সেগুলির যে বঙ্গানুবাদ সংকলন করা হয়েছে, তা শুধু দুর্বোধ্যই নয়, আপাতদৃষ্টিতে বিভ্রান্তিকর বলেও মনে হতে পারে। আমি আমার বক্তব্যের সমর্থনে সহজতর সংজ্ঞা না পাওয়ায়, বাধ্য হয়েই বেদান্তের পারিভাষিক সংজ্ঞা উদ্ধার করেছি। তাতে সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের আভাসমাত্রই পাওয়া যাবে, আমি তত্ত্বের গহণ অরণ্যে প্রবেশ করিনি।

৩

ইতিহাস রচনায় আমি অপটু। বন্দে মাতরম্-এর ইতিহাস লিখতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং স্বদেশী যুগের কথা এসেছে। এ সম্পর্কে আমার নিজস্ব বক্তব্য বিশেষ কিছুই নেই। আমি পূর্বসূরি-গণের, বিশেষ করে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড° রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলা দেশের ইতিহাস'ই অনুসরণ করেছি।

স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা, তরুণ গবেষক সুমিত সরকারের 'The Swadeshi Movement in Bengal—1903-1908'

শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থখানি অজ্ঞাতপূর্ব তথ্যরাজিতে সমৃদ্ধ। কিন্তু 'স্বদেশী আন্দোলনে' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র ও সংগীতরূপে যে অভূতপূর্ব প্রেরণা সঞ্চার করেছিল তার প্রতি গ্রন্থকার সুবিচার করেননি বলে আমি মনে করি।

স্বদেশী আন্দোলনের সাফল্য ও পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামে তার গুরুত্ব-বিচারে দুটি বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। সুমিত সরকার তাঁর গ্রন্থের উপসংহারে লিখেছেন :

'The Swadeshi movement of 1903-8 leaves on the observer of the present day two major impressions, contradictory and yet perhaps equally valid—a sense of richness and promise, of national energies bursting out in diverse streams of political activity, intellectual debate and cultural efflorescence ; and feeling of disappointment, even anticlimax at the blighting of so many hopes.' (পৃ ৪৯৩)।

স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে এই পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের এক প্রান্তে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে আছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার, অন্য প্রান্তে 'বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন—১৯০৩-১৯০৮'-গ্রন্থের লেখক স্বয়ং। আমরা অবশ্য রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রমুখ ঐতিহাসিকগণেরই সমর্থক। কেননা আমরা মনে করি, আন্দোলনের ফলেই বঙ্গভঙ্গ রোধ সম্ভব হয়েছিল, এবং 'স্বদেশী আন্দোলনে'ই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

৪

১৯৩৭ সালে কংগ্রেস কর্তৃক 'বন্দে মাতরম্'-এর অঙ্গচ্ছেদের দুর্ভাগ্যজনক ইতিহাস বর্তমান গ্রন্থে অনিবার্য ভাবেই এসেছে। 'বন্দে মাতরম্' পৌত্তলিকতাদোষদুষ্ট—মুসলিম লীগের এই অভিযোগের ফলেই এই অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা হয়েছিল। বন্দে মাতরমে পৌত্তলিকতা আছে কিনা—এ বিষয় নিয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এই আলোচনার পুরোভাগে স্থাপিত হয়েছে বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতা, 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু'র সম্পাদক, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিস্ময়কর বিশ্লেষণী বক্তব্য।

কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে মুসলিম লীগের দাবি যে একটা বড় সমস্যার সৃষ্টি করেছিল তা অস্বীকার করে লাভ নেই। এই সমস্যা জটিলতর

হয়েছিল এই জন্য যে, মুসলিম লীগের বাইরেও কেউ কেউ এই সংগীতে পৌত্তলিকতার সন্ধান পেয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ভারতে হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার কথাও এসে পড়ে। একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, ভারতের মুসলমান সমাজ দু-ভাগে বিভক্ত ছিলেন। এক ভাগ জাতীয়তাবাদী, অন্য ভাগ স্বাতন্ত্র্যবাদী। এই স্বাতন্ত্র্যবাদই পরে দ্বিজাতিতত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই দুই ভাগের মধ্যে কারা সংখ্যায় ভারি ছিলেন সেটা সংখ্যাতাত্ত্বিকের গণনার বিষয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা চিরদিনই স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে ছিলেন।

বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যার আবার একটা বিশিষ্ট রূপও ছিল। ১৮৮১ সালের লোকগণনা অনুসারে দেখা যায়, সেসময় ব্রিটিশ ভারতে যত মুসলমান ছিলেন তার অর্ধেক বাস করতেন 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি' অর্থাৎ বৃহত্তর বঙ্গদেশে। [পৃ ২১]। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নির্ণয়ন হয় জাতি, ধর্ম ও ভাষা ওপর ভিত্তি করে। বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মাতৃভাষা এক, জাতিতত্ত্বের বিচারেও বাংলার হিন্দু ও মুসলমান অভিন্ন। বাংলার বেশির ভাগ মুসলমানই আগে হিন্দু ছিলেন, ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। মুসলমান হওয়ার পর ধর্মসংস্কৃতির দিক দিয়ে হিন্দুদের সঙ্গে পার্থক্য অবশ্যই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই পার্থক্য দুর্লঙ্ঘ্য ছিল না। আমরা এই গ্রন্থে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' [১৮৭৫] থেকে উদ্ধৃতি সংকলন করে দেখিয়েছি যে, উক্ত গ্রন্থে তিনি হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধের কথা বলেছেন। ভূদেবের মতে হিন্দুরা ভারতমাতার গর্ভজাত সন্তান, মুসলমানেরা তাঁর স্তন্যপালিত সন্তান। ভূদেব বলেছেন, 'এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্যপালিত দুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয়, সকলের শাস্ত্র মতেই হয়। অতএব ভারতবর্ষ-নিবাসী হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ জন্মিয়াছে।' [৩১]। এই সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে সুস্পষ্ট ভাষাতেই প্রকাশিত হয়েছে। [পৃ ১২]।

যদি তর্কচ্ছলে বলা হয়, এটা আদর্শবাদী ভাবনার কথা, বাস্তব সত্য তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে নি, তাহলে নিশ্চয়ই তা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু, আমি বিশ্বাস করি, লর্ড কার্জন বাংলার হিন্দু-মুসলমানে যে বিভেদনীতির বীজ বপন করে গিয়েছিলেন তার ফলেই ভারতে স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলমানেরা বিশেষ উৎসাহিত হয়েছিলেন। তারি অন্তিম পরিণতি ঘটেছে ভারতবিভাগে। আমি মনে করি, তৃতীয় পক্ষের উসকানি যদি না

থাকতো তাহলে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ ক্রমশ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হত। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিকে, এবং মহাত্মা গান্ধী-পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে তা প্রমাণিত হয়েছে।

সমাজে বা দেশে অবশ্য যেখানে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর সমস্যা রয়েছে সেখানে সংখ্যাগুরুর দায়িত্বই বেশি। কংগ্রেস ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে মুসলিম লীগকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য 'বন্দে মাতরমে'র অংগচ্ছেদ করেছিলেন। কিন্তু তাতেও তাঁদের সন্তুষ্ট করা যায় নি। কেন করা যায় নি, তার কথা রেজাউল করীম তাঁর 'বন্দে মাতরম্ ও মুসলমান সমাজ' গ্রন্থে বিশদীভূত করেছেন। বর্তমান গ্রন্থে ৮৮-৮৯ এবং ১২৭-২৮ পৃষ্ঠায় তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে।

এই প্রসংগে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের আত্মজীবনী 'India Wins Freedom' [১৯৫৯] গ্রন্থ নতুন আলোকপাত করেছে। মৌলানা আজাদের জন্ম মক্কায়। তাঁর পূর্বপুরুষ তথাকার মুসলিম সমাজে বিশেষ মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী ছিলেন। তাঁর যখন বয়স মাত্র দুই বৎসর তখন তাঁর পিতা সপরিবারে কলিকাতা চলে আসেন। তিনি প্রাচীন পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন, কাজেই পুত্রকে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত না করে প্রথমে ফার্সী ও আরবী ভাষা শেখান এবং মাদ্রাসায় না পাঠিয়ে গৃহে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের অধীনে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। যৌবনে আজাদ বিপ্লবী দলের সংগে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি মিশর, তুরস্ক ও ফ্রান্সে যান। মিশরে মুস্তাফা কামাল পাশার অনুগামীদের সংগে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। পরে ইরাকে ইরাণী বিপ্লবী এবং তরুণ তুর্কীদের সংগেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। আরব এবং তুরস্কের বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ দৃঢ় হয়। সেখানকার তরুণ বিপ্লবীরা ভারতীয় মুসলমানদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে যা বলেছিলেন তার উল্লেখ করে তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

'They expressed their surprise that Indian Musalmans were either indifferent to or against nationalist demands. They were of the view that Indian Muslims should have led the national struggle for freedom, and could not understand why Indian Musalmans were mere camp-followers of the British. I was more convinced than ever that Indian Muslims must co-operate in the work of political liberation of the country.' [পৃ:৭]

মৌলানা আজাদ ১৯১২ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি বলছেন, তখন মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব ছিল আলিগড় দলের হাতে। তাঁরা মনে করতেন, স্যার সৈয়দ আমেদের নীতি অনুসরণের দায়িত্ব তাঁদের স্কন্ধে ন্যস্ত হয়েছে। 'Their basic tenet was that Musalmans must be loyal to the British Crown and remain aloof from the freedom movement.' মৌলানা আজাদ এই প্রতিক্রিয়াশীল পন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করলেন। ১৯১২ সালের জুন মাসে তিনি 'আল হিলাল' নামে এক উর্দু সাপ্তাহিক প্রকাশ করলেন। তাঁর জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল চিন্তাধারা অচিরকাল মধ্যে মুসলমান সমাজকে আকৃষ্ট করল এবং মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে 'আল হিলালে'র প্রচারসংখ্যা হল ছাব্বিশ হাজার। একখানি উর্দু সাপ্তাহিকের এই প্রচারসংখ্যা সেদিন কল্পনাতীত ছিল। মৌলানা আজাদের প্রগতিশীল চিন্তাধারা মুসলমান সমাজে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। [পৃ ৭-৮]।

কাজেই মুসলিম লীগকে ভারতের মুসলমান সমাজের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান মনে করা এবং লীগের মতবাদকে সমগ্র মুসলমান সমাজের মতবাদ বলে গ্রহণ করা হলে জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণের প্রতি অবিচার করা হয়। মুসলিম রাজনীতিক্ষেত্রে মিঃ জিন্নার আবির্ভাব ঘটে এই সময়েই। প্রথমে তিনি কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ১৯২০ সালেই তিনি কংগ্রেস পরিত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করেন, এবং ভারতকে খন্ডিত করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত তিনিই লীগের নেতৃত্ব করেছেন।

৫

বন্দে মাতরম্ সংগীতের ইতিহাস লিখতে গিয়ে ভারতীয় রাজনীতির এই কুটিল চক্রে আমাকে অনুপ্রবেশ করতে হয়েছে। কিন্তু এ ইতিহাস মূলত বিবৃতিমূলক। আমি প্রথমেই বলেছি বন্দে-মাতরম্-এর ইতিহাস, অর্থ ও তাৎপর্যের অনুসন্ধানই আমাকে এই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত করেছে।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথের একটা বড় ভূমিকা ছিল। ১৯৩৭ সালে বন্দে মাতরম্-এর অঙ্গচ্ছেদের সঙ্গেও তাঁর নাম যুক্ত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কবি, তাছাড়া ১৯৩৭ সালে তাঁর বয়স ছিয়াত্তর পেরিয়ে সাতাত্তর। উপরন্তু তখন তিনি কঠিন অসুস্থতার পরে দেহে মনে ক্লান্ত এবং অবসন্ন। জওহরলালের সঙ্গে একান্তে তাঁর কি কথা হয়েছিল তা জানার উপায় আর নেই। তবে 'বন্দে মাতরম্'-এর স্থানে 'জনগণমন' ভারতের জাতীয় সংগীত হতে পারে বলে তিনি চিন্তা করতেন একথা মনে করার কোনো প্রমাণ

আমার কাছে নেই। অন্তত জওহরলালের যে মনে ছিল না, সেকথা তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই প্রকাশ করেছেন।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে একমাত্র মহাত্মা গান্ধীই শেষ পর্যন্ত 'বন্দে মাতরম্'কে সমর্থন করে গেছেন। সমগ্র গান না হোক, অন্তত প্রথম পংক্তি-সপ্তক মুসলিম লীগ স্বীকার করে নেবেন, এই ছিল তাঁর আন্তরিক আশা।

সুভাষচন্দ্র অবশ্য সমগ্র বন্দে মাতরম্-এরই সমর্থক ছিলেন এবং সর্ব ভারতে এই সংগীতকে সর্বজনপ্রিয় করার জন্য বাঙালীদের উদ্যোগী হতে তিনি আহ্বান করেছিলেন।

'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার সাফল্য নির্ভর করে ভূয়োদর্শী তথ্যসংকলনের উপর। স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কিত বহু গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

কিন্তু এই অপূর্ব সংগীতের অর্থ ও তাৎপর্য নির্ণয় 'ভেলায় দুস্তর-সিন্ধু উত্তরণে'র মতোই দুঃসাধ্য কর্ম। 'বন্দে মাতরম্' রচনার শতবর্ষ উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এর শব্দানুসারী ভাবার্থসন্ধান এবং তদনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ কাব্যবিচার আজ পর্যন্ত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ইতিহাস-রচনা 'বজ্রবিদ্ধ মণিমধ্যে সূত্রসম প্রবেশ'-এর সঙ্গে উপমিত করেছেন কালিদাস। কিন্তু কাব্য-বিচারে তন্ময়ীভবনযোগ্যতা অত্যাবশ্যক। আমার সে শক্তি নেই। তবু, 'আমার যেটুকু সাধ্য' আমি তা-ই করেছি। জানি ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে, কিন্তু অযোগ্যজনের প্রথম প্রয়াসের ত্রুটিবিচ্যুতি একদিন বিদগ্ধজনের পরি-শীলিত প্রজ্ঞার স্পর্শে সার্থক হয়ে উঠবে এই প্রত্যাশাতেই এই দুরূহ কৃত্যে ব্রতী হয়েছি।

৭

বর্তমান গ্রন্থ 'কবি ও কবিতা'র একাদশ বর্ষের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় অবশ্য যথাসাধ্য সংশোধন ও সংযোজন করা হয়েছে। 'কবি ও কবিতা'র 'বন্দে মাতরমে'র তৃতীয় কিস্তি পাঠের পর বিশ্বভারতীর প্রথম রবীন্দ্র-অধ্যাপক, প্রবীণ আচার্য শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে আশীর্বাণী প্রেরণ করেন তাকেই আমি আমার এই সামান্য প্রয়াসের পরম পুরস্কার বলে মনে করি। প্রচ্ছদের চতুর্থ পৃষ্ঠায় তাঁর বাণী মুদ্রিত হয়েছে। প্রবীণ শিক্ষাব্রতী মণীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়ের কাছেও আমি বহুভাবে ঋণী।

১৮৭১ সালের জনগণনার সংখ্যানিরূপণে আমি সরকারী রিপোর্ট দেখা

প্রয়োজন মনে করিনি, কেননা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত সংখ্যাই প্রাসঙ্গিক আলোচনায় প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে।

তথ্যসংগ্রহে আমাকে সাহায্য করেছেন বহুশ্রুত পণ্ডিত ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী, আনন্দবাজারের বর্তমান গ্রন্থাগারিক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমির পূর্বাঞ্চলীয় সম্পাদক ড° শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম-শরৎ-গবেষক গোপালচন্দ্র রায়, জাতীয় গ্রন্থাগারের নচিকেতা ভরদ্বাজ, বঙ্গবাসী কলেজের গ্রন্থাগারিক রতেশ্বর দাশগুপ্ত, এবং শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী উষারানী চক্রবর্তী।

তিনখানি দুর্লভ গ্রন্থ আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক ড° ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগের অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড° শিশিরকুমার দাস।

সংস্কৃত ভাষা ও দর্শন সম্পর্কে আমার দু একটি দুরূহ প্রশ্নের অনায়াস উত্তর দিয়ে আমাকে বিস্মিত করেছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ড° ননীলাল সেন। 'কবি ও কবিতা'য় 'বন্দে মাতরম্' প্রথম কিস্তি প্রকাশের পর 'মিথ্', 'রিচুয়াল' এবং 'কবিকল্পনা' সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ড° পশুপতি শাসমল আমাকে প্রথম থেকেই সচেতন করে রেখেছিলেন।

আমার পরম স্নেহাস্পদ ড° অরুণকুমার বসু এবং ড° রমেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত [উভয়েই আমার প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমানে কৃতী অধ্যাপক] আমার রচনাকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য নিত্যতৎপর ছিলেন।

এই গ্রন্থরচনায় আমি অকুন্ঠ ও অকৃপণ সাহায্য পেয়েছি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার-কর্মীদের কাছে।

'বন্দে মাতরম্' এবং 'স্বদেশী আন্দোলনে'র ইতিহাস রচনায় পূর্ব-সুরিগণের রচনা আমাকে প্রবুদ্ধ ও প্রাণিত করেছে। 'উল্লেখপঞ্জী'তে তাঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছি।

জাতীয় সংগীত হিসাবে 'বন্দে মাতরম্' পূর্ণমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে কি না, এই জিজ্ঞাসার উত্তর ভাবী কালই দিতে পারে। কিন্তু আমার এই প্রয়াসের ফলে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের এই অনবদ্য সংগীতের প্রতি স্বদেশবাসীর মনে যদি নতুন কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় তাহলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।

১০ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলি-৬।
বঙ্কিম-জন্মদিবস, ১৩৮৫

জগদীশ ভট্টাচার্য

আমাদের বন্দে মাতরং মন্ত্র বাংলাদেশের বন্দনার মন্ত্র নয়—এ হচ্ছে বিশ্বমাতার বন্দনা—সেই বন্দনার গান আজ যদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবী যুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৯১৬]

When we sing that ode to motherland, 'Bande Mataram', we sing it to the whole of India

মহাত্মা গান্ধী [১৯২৭]

১

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' একাধারে স্বদেশমন্ত্র এবং স্বদেশসংগীত। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করেই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দীর প্রভাত-লগ্নে বঙ্কিমচন্দ্রের সপ্তকোটি দেশের মানুষ প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু করেছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ না হওয়া পর্যন্ত 'বন্দে মাতরম্'-ই ছিল অখণ্ড ভারতের সমবেত স্বদেশ-সংগীত।

মন্ত্র এবং সংগীত হিসাবে বন্দে মাতরম্-এর যুগল-মহাভাষ্যকার হলেন বিপিনচন্দ্র পাল ও ঋষি অরবিন্দ। বিপিনচন্দ্র পাল-প্রবর্তিত 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় ১৯০৭ সালে অরবিন্দ 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' নামে যে নিবন্ধ রচনা করেন তাতে তিনি বলেন :

Among the Rishis of the later age we have at last realised that we must include the name of the man who gave us the reviving Mantra which is creating a new India, the Mantra Bande Mataram.[১]

... ...

The religion of patriotism,—this is the master idea of Bankim's writings.[২]

... ...

Of the new spirit which is leading the nation to resurgence and independence, he is the inspirer and political Guru.[৩]

... ...

The third and supreme service of Bankim to his nation was that he gave us the vision of our Mother.[৪]

২

অরবিন্দ যাকে বলেছেন 'Vision of our Mother', তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে বন্দে মাতরম্ সংগীতে। দুঃখের বিষয়, এই অনবদ্য স্বদেশসংগীতটির

পাণ্ডুলিপি রক্ষিত হয় নি। সুতরাং তার আদিরূপ কী ছিল তা জানার আর কোনো উপায় নেই। সংগীতটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের অংগীভূত হয়ে। বঙ্গদর্শনের সপ্তম বর্ষে, ১২৮৭ সালের চৈত্রমাস থেকে আনন্দমঠ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১২৮৭ সালের চৈত্রেই ৫৫৫-৫৫৬ পৃষ্ঠায় বন্দে মাতরম্ মুদ্রিত হয়।[৫] তখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অবশ্য সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদক হলেও বঙ্কিমচন্দ্রই তখনো বঙ্গদর্শনের প্রাণপুরুষ।

‘বঙ্গদর্শন’-এ প্রকাশিত ‘বন্দে মাতরম্’-এর অবিকল বাণীরূপটি নিম্নে কলিত হল :

“বন্দে মাতরং
সুজলাং সুফলাং, মলয়জশীতলাং,
শস্যশ্যামলাং, মাতরং।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরং।

সপ্তকোটীকণ্ঠ-কলকলনিনাদ-করালে
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈধৃ্তখরকরবালে
কে বলে মা তুমি অবলে
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরং।”

তুমি বিদ্যা তুমি ধৰ্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মৰ্ম্ম
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং।

নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরং
বন্দে মাতরং
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরং।

পরবর্তীকালে আনন্দমঠে ধৃত এবং সংগীতরূপে পৃথগ্‌ভূত বন্দে মাতরম্‌-এর সঙ্গে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রূপের কিছু-কিছু পার্থক্য আছে। প্রথমেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হল, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত গানের প্রথম থেকে 'রিপুদলবারিণীং মাতরং' পর্যন্ত উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে মুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থাকারে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত দ্বিতীয় সংস্করণেও তা অব্যাহত ছিল বলে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তৃতীয় থেকে পঞ্চম সংস্করণের মধ্যে উদ্ধৃতিচিহ্ন স্থানান্তরিত হয়েছে। কেননা, পঞ্চম সংস্করণ-অনুসারী পরিষৎ-সংস্করণে, সমস্ত গানটিই উদ্ধৃতিচিহ্নে ধৃত। বঙ্গদর্শনে প্রকাশের সময় কেন মধ্যপথে উদ্ধৃতিচিহ্ন শেষ হল, এবং বাকি অংশ কেন উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে ধৃত হল না ; তার কারণ কী ;—তা নিতান্তই মুদ্রণ-প্রমাদ, না লেখকের অভিপ্রায়-জনিত, সে সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বোধ হয় আর সম্ভব নয়। কেউ কেউ অনুমান করেন, উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে ধৃত অংশই প্রথমে রচিত হয়েছিল ; বাকি অংশ উপন্যাস-রচনার সময় যুক্ত হয়। কিন্তু এই অনুমানের সমর্থনে গ্রহণযোগ্য কোনো যুক্তি উপস্থাপিত হয় নি।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশের সময় 'বন্দে মাতরং' থেকে যামিনীং শোভিনীং, ভাষিণীং, কমলাং, অতুলাং, সুফলাং, সরলাং, ভূষিতাং, ভরণীং এবং মাতরং —সর্বত্রই অনুস্বার ব্যবহৃত হয়েছে, গ্রন্থে এই সব স্থলে 'ম্' ব্যবহৃত। তার একটি কারণ অবশ্য, গ্রন্থে প্রকাশের সময় গানের চরণগুলি পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। যেমন, শেষ স্তবকটি বঙ্গদর্শনে ছিল :—

নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরং
বন্দে মাতরং

শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরং।

আনন্দমঠে স্তবকবিন্যাস নিম্নরূপ :

নমামি কমলাম্
অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাম্
মাতরম্।

বন্দে মাতরম্

শ্যামলাং সরলাম্
সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্
মাতরম্।"

বলাই বাহুল্য, এই পরিবর্তন সর্বত্রই নতুন স্তবকবিন্যাসের জন্য ঘটেছে, এমনও নয়। আসলে ব্যাকরণসিদ্ধ শুদ্ধরূপ 'বন্দে মাতরং' নয়, 'বন্দে মাতরম্'। তেমনি 'সুজলাম্', 'সুফলাম্' 'মলয়জশীতলাম্' ইত্যাদি। কলাপ-সূত্রানুসারে পরে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে 'ম্' 'ং'-এ পরিবর্তিত হয়। 'মোহনুস্বারং ব্যঞ্জনে'। এই সূত্রানুসারেই সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শুদ্ধ। কিন্তু কমলাং অমলাং অতুলাং শুদ্ধ নয়। হওয়া উচিত কমলাম্ অমলাম্ অতুলাম্। সন্ধি করলে হবে কমলামমলামতুলাম্। কিন্তু সন্ধি বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রেত ছিল না। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রথমে সর্বত্রই 'ং' দিয়েছিলেন তারও সমর্থন একটি অর্বাচীন বা উদ্ভট সূত্রে পাওয়া যায় : 'মোবিন্দুরবসানেহপি'। কিন্তু পরে, বঙ্কিমচন্দ্র কলাপ-সূত্রের অনুসরণই সর্বভাবে সমীচীন মনে করেছেন। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয় যে, সংস্কৃত ব্যাকরণে বঙ্কিমচন্দ্রের সুগভীর অনুপ্রবেশ ছিল। তিনি ভাটপাড়ার বিখ্যাত বৈয়াকরণ শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের কাছে ব্যাকরণ শিক্ষা করেছিলেন।[৬]

বঙ্গদর্শনে ছিল—'কে বলে মা তুমি অবলে'। পরিষৎ-সংস্করণে 'আনন্দমঠে'র পাঠভেদে বলা হয়েছে, গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত এই পাঠই ছিল। পরবর্তী সংস্করণ থেকে হয়েছে 'অবলা কেন মা এত বলে।' ব্যাকরণ ও ছন্দের দিক দিয়ে এই পরিবর্তন যে সার্থক হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। সুরের দিক দিয়েও এই পরিবর্তন অপরিহার্য ছিল কি না তাও ভেবে দেখার বিষয়।

'আনন্দমঠে'র চতুর্থ খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে যুদ্ধরত বৈষ্ণবী সেনা যখন

উচ্চকণ্ঠে গান শুরু করল তখন 'তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম' / তুমি হৃদি তুমি মর্ম' / ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে'—এই অংশের ঈষৎ পরিবর্তন ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'উচ্চৈঃস্বরে বৈষ্ণবী সেনা গায়িল,—

"তুমি বিদ্যা, তুমি ভক্তি,
তুমি মা বাহুতে শক্তি
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।"

এই পরিবর্তনও তাৎপর্যপূর্ণ। জননী জন্মভূমি সন্তানের শরীরে প্রাণময়ী হয়ে তার জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের কারয়িত্রী শক্তিরূপে ক্রিয়াশীলা হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, স্বদেশসংগীত হিসাবে কংগ্রেসের বারাণসী অধিবেশনে ১৯০৫ সালে গীত হওয়ার সময় সরলা দেবী 'সপ্তকোটীকণ্ঠ' এবং 'দ্বিসপ্তকোটীভুজ'-কে 'ত্রিংশকোটীকণ্ঠ' এবং 'দ্বিত্রিংশকোটীভুজে' পরিবর্তিত করেন। পরে ভারতমাতার ক্রমবর্ধমান সন্তান-সংখ্যার কথা চিন্তা করেই নির্দিষ্ট সংখ্যা পরিত্যাগ করে বলা হয়েছে 'কোটী কোটী কণ্ঠ' এবং 'কোটী কোটী ভুজ'।—

কোটী কোটী কণ্ঠ কলকলনিনাদকরালে,
কোটী কোটী ভুজৈর্ধৃতখর-করবালে…

বলাই বাহুল্য, এই পরিবর্তন সর্বার্থসাধক হয়েছে। ভাব ও ছন্দ রক্ষা করে এই পরিবর্তন প্রশংসার যোগ্য। কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এইভাবে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই। পরে দেখা যাবে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর গণপরিষৎ জাতীয় সংগীত নির্বাচনের সময় বলেছেন, প্রয়োজন হলে যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন করা যেতে পারবে।

৩

আমরা বলেছি, 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটি আনন্দমঠের অঙ্গীভূত হয়েছে। 'অঙ্গীভূত' বলার অর্থ ও তাৎপর্য হল, 'বন্দে মাতরম্' সংগীতরূপে একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। আনন্দমঠের সন্তানসম্প্রদায় স্বদেশপ্রেরণার উদ্দীপনসংগীত হিসাবে কখনো একক কখনো সমবেতভাবে গান করেছেন। আনন্দমঠে বন্দে মাতরম্-এর প্রথম গায়ক ভবানন্দ। ভবানন্দ 'মল্লার—কাওয়ালী তালে'ই গানটি গেয়েছিলেন।

আনন্দমঠে অঙ্গীভূত হওয়ার ফলে বন্দে মাতরম্ আনন্দমঠের প্রাণমন্ত্র হয়ে উঠেছে। তবু, একথা সর্বদাই স্মরণ রাখতে হবে, বন্দে মাতরম্

আনন্দমঠের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। তবে বন্দে মাতরম্ সংগীতে যে স্বদেশমন্ত্র উদ্‌গীত হয়েছে, অরবিন্দের ভাষায়—যে 'religion of patriotism' বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর মুখ্য উপজীব্য, তারই উদ্দীপক শিল্পরূপ 'আনন্দমঠ'। আর, একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের বহু উপন্যাসের কাহিনী অতীতাশ্রয়ী হলেও তাঁর ঋষিদৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে সম্প্রসারিত। বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশ-উদ্ধারের জন্য যে সন্তানসম্প্রদায় সৃষ্টি করলেন তা অতীতের সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের ঐতিহাসিক কাহিনীর উপরই নির্ভর করে পরিকল্পিত হয়েছে।[৭] কিন্তু 'আনন্দমঠে'ই তাঁর বক্তব্য শেষ হয় নি। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের কাহিনীনির্ভর তাঁর দ্বিতীয় সৃষ্টি 'দেবী চৌধুরাণী'। আনন্দমঠের প্রথম সংস্করণের পাঠভেদে দেখা যায়, গ্রন্থশেষে বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, "বিষ্ণুমণ্ডপ জনশূন্য হইল। তখন সহসা সেই বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল ; নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।"[৮]

প্রথম সংস্করণের পরে এই অংশ উপন্যাস থেকে বর্জিত হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, 'পারি ত সে কথা পরে বলিব'—বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রতিশ্রুতিই শিল্পরূপ পেয়েছে 'দেবী চৌধুরাণী'তে।[৯]

অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বন্দে মাতরম্' সংগীতে যে স্বদেশপ্রেমের ধ্যান করেছেন সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে তার যুগল শিল্পরূপ আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয়, বন্দে মাতরম্ আনন্দমঠের অঙ্গীভূত হলেও তা কবি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বদেশসংগীত। অরবিন্দের ভাষায়—'The vision of our Mother'.

৪

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, বঙ্কিমচন্দ্র কবে এই মহাসংগীত রচনা করেন। এ সম্পর্কে পরবর্তী আলোচকগণ সবাই একমত যে, ১২৮৭ সালে বঙ্গদর্শনে আনন্দমঠের অঙ্গীভূত হয়ে প্রকাশের চার-পাঁচ বৎসর পূর্বে গানটি লেখা হয় ; ১৮৭৫ কিংবা ৭৬ সালের কোনো এক সময়ে। বঙ্গদর্শন বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৭৯ সালের বৈশাখে। ১২৮২ সালের চৈত্র মাসে চতুর্থ বৎসরের দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর এক বৎসর এই মাসিক পত্রিকা বন্ধ থাকে। প্রথম চার বৎসর বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক।

বঙ্কিমানুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "বঙ্গদর্শনে মধ্যে মধ্যে দুই-এক পাত matter কম পড়িলে পণ্ডিত মহাশয় [কাঁঠালপাড়া-নিবাসী পণ্ডিত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] আসিয়া সম্পাদককে জানাইতেন। তিনি তাহা ঐ দিনেই লিখিয়া দিতেন। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে দুই একটি লোকরহস্যে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ প্রকাশিত হয় নাই। বন্দেমাতরম্ গীতিটি রচিত হইবার কিছু দিবস পরে পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া জানাইলেন, প্রায় এক পাতা matter কম পড়িয়াছে। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, 'আচ্ছা আজই পাবে।' একখানা কাগজ টেবিলে পড়িয়াছিল, পণ্ডিত মহাশয়ের উহার প্রতি নজর পড়িয়াছিল, বোধ হয় উহা পাঠও করিয়াছিলেন, কাগজখানিতে বন্দে মাতরম্ গীতিটি লেখা ছিল। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 'বিলম্ব কাজ বন্ধ থাকিবে, এই যে গীতিটি লেখা আছে—উহা মন্দ নয় ত—ঐটা দিন না কেন।' সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কাগজখানি টেবিলের দেরাজের ভিতর রাখিয়া বলিলেন, 'উহা ভাল কি মন্দ, এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না, কিছুকাল পরে উহা বুঝিবে—আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার।'"[১০]

এ সম্পর্কে অন্য কাহিনীও প্রচলিত আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ক্ষণভিন্ন-সৌহৃদ্' ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। তাঁর নামেই বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' উৎসর্গ করেন। দীনবন্ধুর পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সংকলিত 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ' গ্রন্থে 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে লিখেছেন :

'বন্দে মাতরম্' রচিত হইবার পরে বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে তদানীন্তন সুকণ্ঠ গায়ক ভাটপাড়ার স্বর্গীয় যদুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ইহাতে সুরতাল সংযুক্ত করিয়া প্রথম গাহিয়াছিলেন। সেইদিন বিখ্যাত 'বঙ্গদর্শন' পত্রের কার্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। কার্যানুরোধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কিসে 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠা সত্বর পূরিত হয়, সেই দিকেই লক্ষ্য ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, গান যাহাই হউক, বন্দেমাতরং দ্বারা 'বঙ্গদর্শনে'র পেট ভরিবে না। আপনি একখানি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করুন। তদুত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র কহিয়াছিলেন, 'এ গানের মর্ম তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না; যদি পঁচিশ বৎসর জীবিত থাক, তখন দেখিবে, এই গানে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিবে।'[১১]

আরেকটি কাহিনী বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিমজীবনী'তে। তিনি লিখছেন :

'বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর দুই চারি বৎসর পূর্বে, একদা আমার ভগিনী

(বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা) তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, "বাবা, তোমার বন্দে মাতরম্ গানটা লোকে তেমন পছন্দ করে না।"

'বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিও কি পছন্দ কর না?"

"ততটা করি না।"

'মহাপুরুষ গম্ভীর বদনে বলিলেন, "একদিন দেখিবে—বিশ ত্রিশ বৎসর পরে একদিন দেখিবে, এ গান লইয়া বাংগালা উন্মত্ত হইয়াছে—বাংগালী মাতিয়াছে।"

'বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুদিন পরে আমি এই গল্পটি আমার উক্ত ভগিনীর নিকট শুনিয়াছিলাম।'[১২]

পূর্ণচন্দ্র, ললিতচন্দ্র এবং শচীশচন্দ্রের এই কাহিনীত্রয়ের মধ্যে ললিতচন্দ্রের কাহিনীটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে আমাদের মনে হয়।

কিন্তু বন্দে মাতরম্ সংগীত কোন্ সালে লেখা হয়েছিল—১৮৭৬, ১৮৭৫, না, তারো আগে, এ সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুঃসাধ্য। পূর্বেই বলা হয়েছে, বঙ্গদর্শন একাদিক্রমে চার বৎসর প্রকাশিত হবার পর ১২৮২ সালের চৈত্রমাসে বন্ধ হয়ে যায়। ১২৮৩ সালে পত্রিকা বন্ধ ছিল। পঞ্চম বৎসর শুরু হয় ১২৮৪-র বৈশাখে।

পণ্ডিত রামচন্দ্র সংক্রান্ত পূর্ণচন্দ্র অথবা ললিতচন্দ্রের কাহিনী যদি সত্য হয় তাহলে বংগদর্শনের তৃতীয় বা চতুর্থ বৎসরের কোনো এক সংখ্যায় এক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হতে পারে এমন কোনো লেখার জন্য পণ্ডিত মহাশয় সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন। পত্রিকার চতুর্থ বৎসর শেষ হয় ১২৮২ সালের চৈত্রমাসে। অর্থাৎ ১৮৭৬ সালের এপ্রিলে। সাহিত্যসাধক চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমের 'কর্মজীবন'-এর কালানুক্রমিক যে তালিকা উপস্থাপিত করেছেন তাতে দেখা যায়, 'বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে বারাসত থেকে হুগলীতে বদলি হন ১৮৭৬-এর ২০শে মার্চ। হুগলীতে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ১৮৮০ সালের ৫ই নভেম্বর পর্যন্ত। অনেকে মনে করেন, হুগলীতে বদলি হবার পর, কিছুদিন নৈহাটি থেকে যাতায়াতের পর বংকিমচন্দ্র চুঁচুড়ায় জোড়াঘাটে বাড়ি ভাড়া করে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত সেখানেই বসবাস করেছেন। এই সময় ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর নিত্যসংগী। কিন্তু চুঁচুড়ায় বসবাস শুরু করার পূর্বেই বন্দে মাতরম্ রচিত হয়েছিল। কেননা হুগলীতে ১৮৭৬ সালের ২০শে মার্চ বদলি হবার মাস খানেকের

মধ্যেই বঙ্গদর্শনের প্রথম পর্ব চতুর্থ বৎসরের শেষে বন্ধ হয়ে যায়। অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন' গ্রন্থে বঙ্গদর্শনের যে কালানুক্রমিক সূচী সংকলন করেছেন, তাতে দেখা যায় চতুর্থ বৎসরে বঙ্গদর্শনের কোনো সংখ্যায় এক পৃষ্ঠার মত স্থান পূরণের জন্য কোনো লেখার প্রয়োজন হয় নি। ১২৮২ সালের পৌষ সংখ্যার (১৮৭৫ ডিসেম্বর-১৮৭৬ জানুয়ারি) শেষ লেখা পূর্ণচন্দ্রের উপন্যাস 'শৈশব সহচরী'। মাঘ সংখ্যার শেষ লেখা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ 'ভারত মহিলা'। ফাল্গুনের শেষ লেখা 'কালিদাসের উপমা' এবং চৈত্রের শেষ লেখা 'বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ'। সুতরাং ১৮৭৬-এর জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে বঙ্গদর্শনে এক পৃষ্ঠা লেখার জন্য পণ্ডিত মহাশয়ের তাগিদ দেওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। অতএব ধরে নিতে হয়, বন্দে মাতরম্ ১৮৭৬ সালের আগে, সম্ভবত ১৮৭৫ সালে, অথবা তারো কিছু আগে, রচিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র 'আমার দুর্গোৎসব' এবং 'একটি গীত' নিবন্ধ-দু'টির কথাও এসে পড়ে। 'আমার দুর্গোৎসব' প্রকাশিত হয় বঙ্গদর্শনের তৃতীয় বৎসরের সপ্তম সংখ্যায়, ১২৮১ সালের কার্তিক মাসে। বলাই বাহুল্য, কমলাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের ছদ্মনাম ; কমলাকান্ত তাঁর আত্মার দোসর, তাঁর অন্তরতর সারস্বত সত্তা। কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসবে'র সম্পূরক নিবন্ধ 'একটি গীত' প্রকাশিত হয় চার মাস পরে। ১২৮১-র ফাল্গুনে।

সেইসময়কার বঙ্কিমমানসের পরিচয় পেতে হলে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি লেখার দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। প্রথম বৎসরের বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ [পত্রসূচনার পরই] বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভারত কলঙ্ক'। পঞ্চম থেকে অষ্টম সংখ্যার ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'বঙ্গদেশের কৃষক।' দ্বাদশ সংখ্যায় 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনে' রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' গ্রন্থের আলোচনা। দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় [জ্যৈষ্ঠ ১২৮০] 'সাম্য', চতুর্থ সংখ্যায় 'জন স্টুয়ার্ট মিল', পঞ্চম সংখ্যা [ভাদ্র ১২৮০] থেকে প্রায় প্রতি সংখ্যায় 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র এক একটি রচনা, তৃতীয় বর্ষের সপ্তম সংখ্যায় [কার্তিক ১২৮১] কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব', একাদশ সংখ্যায় কমলাকান্তের 'একটি গীত', দ্বাদশ সংখ্যায় কমলাকান্তের 'বিড়াল'।

এই প্রবন্ধমালায় বঙ্কিমচন্দ্রের তৎকালীন ভাবনা-চিন্তার একটা দিগ্‌দর্শন পাওয়া যাবে। 'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধের প্রধান জিজ্ঞাসা, 'ভারতবর্ষ এতকাল পরাধীন কেন ?' এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দুটি প্রধান কারণের

কথা বলেছেন। এক, 'স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা', দুই, 'হিন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি-হিতৈষার অভাব'। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'ইতিহাসকীর্তিত কালমধ্যে কেবল দুইবার হিন্দুসমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল। একবার মহারাষ্ট্রে শিবজী এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহনাদে মহারাষ্ট্র জাগরিত হইয়াছিল।'…'দ্বিতীয়-বারের ঐন্দ্রজালিক রণজিৎ সিংহ, ইন্দ্রজাল খালসা।' প্রবন্ধশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের জিজ্ঞাসা, 'যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদায় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত ?' 'সমুদায় ভারত' 'একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ' কিভাবে হতে পারে তারই উত্তর দিয়ে প্রবন্ধের উপসংহাব রচিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'ইংরেজ ভারতবর্ষের পবমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে।' …'যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডাব হইতে লাভ করিতেছি', তার মধ্যে বঙ্কিমের মতে দুটি হল, 'স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা।'

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের জিজ্ঞাসা, লোকে বলে, 'ইংরাজের শাসনকৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে।' …'এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল ? হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটি অস্থিচর্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে ?' এই উদ্ধৃতির 'হাসিম শেখ' ও 'রামা কৈবর্ত' শব্দ দুটি প্রতীকাত্মক। মুসলমান ও হিন্দু—অগ্রে মুসলমান পরে হিন্দু—অর্থাৎ সমগ্র বাংলার জনগণের প্রতীক। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'জমীদার' শীর্ষক আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী।' তৃতীয় পরিচ্ছেদের বিষয় 'প্রাকৃতিক নিয়ম।' এই অধ্যায়ে শ্রমোপজীবীদের অবনতির কারণ বিশ্লেষণ করে তার তিনটি ফলের কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন। প্রথম ফল, 'শ্রমের বেতনের অল্পতা। ইহার নামান্তর দরিদ্রতা।' দ্বিতীয় ফল, বেতন অল্প হলে বেশি পরিশ্রম করতে হয়। সময়ের অভাব দেখা দেয়। 'অবকাশের অভাবে বিদ্যালোচনার অভাব। অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্খতা।' তৃতীয় ফল 'বুদ্ধ্যুপজীবীদিগেব প্রভুত্ব এবং অত্যাচার বৃদ্ধি। ইহার নামান্তর দাসত্ব।' অর্থাৎ 'দারিদ্র্য, মূর্খতা এবং দাসত্ব'ই বঙ্গদেশের কৃষকের নিয়তি। 'আইন' শীর্ষক চতুর্থ পরিচ্ছেদে

বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন কি কি কারণে আইনের সাহায্যেও এই নিয়তির হাত থেকে কৃষকদের কেন রক্ষা করা যায় না। প্রবন্ধের উপসংহারে তাঁর বক্তব্য হল, 'ধনের সাধারণতাই সমাজোন্নতির লক্ষণ।' 'পাঁচ সাত জন টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবে, আর ছয় কোটি লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে, ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কিছু কি সংসারে আছে? সেইজন্যই কর্নওয়ালিসের বন্দোবস্ত অতিশয় দূষ্য। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, এই দুই চারি জন অতিধনবান ব্যক্তির পরিবর্তে আমরা ছয় কোটি সুখী প্রজা দেখিতাম।'… 'এখন যে জন পাঁচ ছয় বাবুতে ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ঘরে বসিয়া মৃদু মৃদু কথা কহেন, তৎপরিবর্তে তখন এই ছয় কোটি প্রজার সমুদ্রগর্জন-গম্ভীর মহানিনাদ শুনা যাইত।'

এখানে বলা আবশ্যক, 'বঙ্গদেশের কৃষকে'র সঙ্গে একই সুরে বাঁধা তাঁর 'সাম্য' এবং কমলাকান্তের 'বিড়াল'।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে 'জাতিপ্রতিষ্ঠা' এবং 'সামাজিক ধন-বৈষম্য' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবের কিছুটা আভাস পাওয়া গেল। এবার 'ধর্মবোধ' সম্পর্কে তাঁর সে-সময়কার মনোভাবের উপর সামান্য আলোকপাত করা যেতে পারে। রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' প্রবন্ধের একস্থলে তিনি বলেছেন, 'বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রচারকালে কার্যাধ্যক্ষ সাধারণ সমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, এই পত্রে ধর্মসম্প্রদায়ের মতামতের সমালোচনা হইবে না। আমরা সেই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ।' এইজন্যই তিনি 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নি। তবে বলেছেন, রাজনারায়ণ বসুর মতো মননশীল পুরুষ যখন বলেন 'আমাদের দেশের ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম' তখন স্বভাবতই তিনি সুখী হয়েছেন, কিন্তু বসু মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর মতৈক্য আছে একথা তিনি স্বীকার করেন নি। কেননা রাজনারায়ণের মতে 'ব্রহ্মোপাসনাই হিন্দু ধর্ম।' অতএব ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করাই লেখকের উদ্দেশ্য। কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে 'পরব্রহ্মের উপাসনা—সকল ধর্মের অন্তর্গত—সকলেরই সার ভাগ।' অতএব বঙ্কিম বলেন, ব্রহ্মোপাসনাই হিন্দু ধর্ম এবং সেই জন্যই হিন্দু ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম—রাজনারায়ণ বসুর এই সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করতে অসমর্থ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধের উপসংহার-ভাগে বসু মহাশয়ের জাতীয়তাবোধের প্রশংসা করেছেন। বসু মহাশয় 'মিলে সবে ভারত সন্তান' শীর্ষপংক্তিক গানটি উদ্ধৃত করে তাঁর গ্রন্থের উপসংহার রচনা করেছেন।[১৩] বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন, 'রাজনারায়ণবাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক। এই মহাগীত

ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্মদা, গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। পূর্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক!'[১৪] 'ভারত কলঙ্ক'-এর মতো এখানেও দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র 'একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ' 'বিংশতি কোটি ভারতবাসী'র কথাই বলছেন।

বলাই বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের এই আবেগোচ্ছ্বাসে সমগ্র ভারতেরই জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে তৎকালীন বঙ্কিমের মনোভাবের কিছুটা আভাস এই প্রবন্ধে পাওয়া গেলেও এই সম্পর্কে সামগ্রিক পরিচয় এখনো উদ্ঘাটিত হয় নি। 'জন স্টুয়ার্ট মিলে'র মৃত্যুর পর তিনি যে নিবন্ধ রচনা করেন তাতে একটি উক্তি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। বঙ্কিমচন্দ্র মিলের সঙ্গে কোঁতের [বঙ্কিমচন্দ্র comte-কে 'কোম্‌ৎ' বলেছেন] মতবাদের তুলনা করে বলেছেন, 'মিল প্রথমাবস্থায় অনেক বিষয়ে কোম্‌তের সহিত একমত ছিলেন কিন্তু পরিণামে নানা মতভেদ উপস্থিত হয়।' বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু কোঁতেরই সমর্থক। তাই তিনি বলেন, 'মিল্‌, কোম্‌ৎ-দর্শন বিচার করিবার জন্য Auguste Comte and Positivism নামক যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে জনসমাজের কথঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়াছে।'[১৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মচেতনা প্রসঙ্গে কোঁৎ-প্রসঙ্গ উত্থাপনের অবশ্যই তাৎপর্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে 'অনুশীলন ধর্ম' রচনা করেছেন তা কোঁতের দ্বারাই অনুপ্রাণিত। তফাৎ এই যে, কোঁতের 'ধ্রুবদর্শন' নিরীশ্বর, আর বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন ধর্ম' 'অন্তিম স্তরে সেশ্বর। কিন্তু বৃত্তিনিচয়ের অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও সম্যক্‌ সামঞ্জস্য বিধানই মনুষ্যত্ব,—এই মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম—একথা কোঁৎ এবং বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েরই মূল প্রতিপাদ্য। কোঁৎ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের 'মনুষ্যে ভক্তি' শীর্ষক দশম অধ্যায়ে। সেখানে তিনি বলেছেন, 'যাঁহারা সমাজের শিক্ষক তাঁহারা ভক্তির পাত্র।...এই জন্য ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, গোতম সমস্ত ভারতবর্ষের পূজ্যপাদ পিতৃগণস্বরূপ। ইউরোপেও গলিলীও, নিউটন, কান্ত্‌, কোম্‌ৎ, দান্তে, সেক্ষপিয়র প্রভৃতি সেই স্থানে।'[১৬] লক্ষ্য করলে দেখা যাবে য়ুরোপে সমাজের শিক্ষক বলে বঙ্কিমচন্দ্রের মতে যাঁরা ভক্তির পাত্র তাঁদের মধ্যে আছেন দুজন বিজ্ঞানী, দুজন কবি এবং দুজন দার্শনিক। দার্শনিকদ্বয় হলেন কান্ত্‌ ও কোঁৎ।

বন্দে মাতরম্‌ সংগীত রচনার অনেক পরে, এমন কি 'আনন্দমঠ' রচনারও

পরে বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থ রচনা করেছেন। আনন্দমঠ বঙ্গদর্শনে ১২৮৭-৮৯ সালে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। ধর্মতত্ত্বের কিয়দংশ নবজীবনে ১২৯১-৯২ সালে প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৮৮ সালে। লক্ষ্য করার বিষয়, দেবী চৌধুরাণীও ধর্মতত্ত্ব রচনার আগে রচিত ও প্রকাশিত।

প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমমানসে কোঁতের ধ্রুবদর্শনের প্রভাব প্রথম থেকেই ক্রিয়াশীল ছিল। তার অন্যতম প্রমাণ বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'কোম্‌ৎদর্শন' প্রবন্ধ উক্ত সংখ্যার প্রথম রচনা হিসাবে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় বর্ষ নবম সংখ্যারও প্রথম প্রবন্ধ ছিল রাজকৃষ্ণের কোম্‌ৎদর্শন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্গদর্শন-গোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ লেখকগণের একজন ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক। তাঁর লেখা 'স্ত্রীলোকের রূপ' বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তরে' গ্রহণ করেছেন এবং 'সীতারাম' উপন্যাস তাঁর নামে উৎসর্গ করেছেন।

আরো লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বঙ্গদর্শনের পাঁচ সংখ্যায় [পৌষ-ফাল্গুন ১২৭৯ এবং বৈশাখ ও আষাঢ় ১২৮০] ভারতীয় ষড়্‌দর্শনের মধ্যে একমাত্র সাংখ্যদর্শন সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে : ১। 'যিনি হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিতে চাহেন, সাংখ্যদর্শন না বুঝিলে তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান জন্মিবে না ; কেন না হিন্দুসমাজের পূর্বকালীয় গতি অনেক দূর সাংখ্যপ্রদর্শিত পথে হইয়াছিল।...সংসার যে দুঃখময়, দুঃখ নিবারণমাত্র আমাদিগের পুরুষার্থ, এ কথা যেমন হিন্দুজাতির হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, এমন বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই। তার বীজ সাংখ্যদর্শনে।' ২। 'সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ লইয়া তন্ত্রের সৃষ্টি'। ৩। 'বৌদ্ধধর্মের আদি এই সাংখ্যদর্শনে'। ৪। 'আমরা "নিরীশ্বর সাংখ্যকেই" সাংখ্য বলিতেছি।'

বলাই বাহুল্য পরবর্তী জীবনে বঙ্কিমমানসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম সম্পর্কেও তাঁর মতের পরিবর্তন হয়েছে। ধর্ম সম্পর্কে তিনি তাঁর অন্তিম বক্তব্য তিনটি গ্রন্থে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। 'উক্ত তিনটি নিবন্ধের একটি অনুশীলন ধর্মবিষয়ক, দ্বিতীয়টি দেবতত্ত্ব বিষয়ক, তৃতীয়টি কৃষ্ণচরিত্র।'[১৭]

তবে পরিণত জীবনেও বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন মুখ্যত মানবতাবাদী। অনুশীলন ধর্মের কথা পরে পুনশ্চ আলোচনার সুযোগ রয়েছে। দেবতত্ত্ব সম্পর্কে ১২৮১ সালের অগ্রহায়ণে প্রকাশিত তাঁর প্রতিবাদ-প্রবন্ধ 'বঙ্গে দেবপূজা'র উল্লেখও এখানে অত্যাবশ্যক। ১২৮১ সালে কার্তিক মাসের 'ভ্রমরে'

জনৈক লেখক 'শ্রীঃ' স্বাক্ষরে 'বঙ্গে দেবপূজা' প্রবন্ধ লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রতিবাদে পরবর্তী মাসে বলেন : 'তিনি [প্রবন্ধকার] সাকার পূজার গুণ কতকগুলি দেখাইয়াছেন ; দোষ একটিও দেখান নাই। তাঁহার দুই একটি অশুভ ফলের উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় হইতেছে। উল্লেখমাত্র করিব। প্রথম সাকার ধর্ম বিজ্ঞানবিরোধী। যেখানে সাকার ধর্ম প্রচলিত, সেখানে জ্ঞানের উন্নতি হয় না। সেখানে সকল প্রশ্নেরই এক উত্তর—"দেবতায় করেন।" অন্য উত্তরের সন্ধান হয় না। অতএব সাকার পূজো জ্ঞানোন্নতির কণ্টক।'[১৮]

এই প্রতিবাদ-প্রবন্ধ [অগ্রহায়ণ ১২৮১] লেখার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স অবশ্য সাঁইত্রিশ বৎসর চলছে। সুতরাং এটি তাঁর পরিণত জীবনের রচনা বলা উচিত হবে না।

'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে, দ্বিতীয় সংস্করণ ছয় বৎসর পরে ১৮৯২ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যতদূর প্রভেদ এতদুভয়ে ততদূর প্রভেদ। মতপরিবর্তন বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার, এবং ভাবনার ফল। যাঁহার কখন মত পরিবর্তিত হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞানবিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন!'[১৯] কিন্তু মতপরিবর্তনের ফলে এই প্রভেদ সত্ত্বেও 'মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম'—এই তত্ত্বের আলোকেই তিনি কৃষ্ণের 'মানবচরিত্র' বিশ্লেষণ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব' লেখেন ১২৮১ সালের কার্তিকের বঙ্গদর্শনে। একই বৎসরে, অগ্রহায়ণের 'ভ্রমরে' লেখেন 'বঙ্গে দেবপূজা'র প্রতিবাদ। তাতে তাঁর বক্তব্য—'সাকার ধর্ম বিজ্ঞানবিরোধী।··· সাকার পূজো জ্ঞানোন্নতির কণ্টকস্বরূপ।' এই উক্তির সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করে দেখলে 'আমার দুর্গোৎসবে'র বক্তব্য পরিষ্কার হতে পারে।

সপ্তমী পূজার দিন আফিঙের মাত্রা চড়িয়ে কমলাকান্ত প্রতিমাদর্শনে গিয়েছিল। কিন্তু তার দিব্যদৃষ্টি তখন স্থান-কালকে অতিক্রম করে গেছে। তার মনে হল, সে অকস্মাৎ কালের স্রোতে ভেলায় চড়ে ভেসে চলেছে। নিতান্ত একা। মাতৃহীন। কমলাকান্ত বলছে,

'আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা, কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি? এ ঘোর কালসমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন

বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা ! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে ! এই কি মা ? হ্যাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরজনকেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত ! এ মূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু এক দিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রু-মর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা !

'কোথায় ফুল পাইলাম, বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম—ডাকিলাম, "সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে, শিবে, আমার সর্বার্থ-সাধিকে ! অসংখ্য-সন্তানকুলপালিকে ! ধর্ম, অর্থ, সুখ, দুঃখদায়িকে ! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এই ভক্তি প্রীতি বৃত্তি শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি এই অনন্তজলমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী [স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথের 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী'] মূর্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা ! নবরাগরঙ্গিণি নববল-ধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি !—এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্রে, এক কালে, দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব,—মা প্রসূতি অম্বিকে ! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে ! নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে ! শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে ! ডাকিব, সিন্ধু-সেবিতে, সিন্ধু-পূজিতে সিন্ধু-মথন-কারিণি ! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি ! অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়িনি ! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি ! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা ? ঐ ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এসো—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান—তাঁহার ভাবনা কি ?'

কমলাকান্তের এই অপূর্বসুন্দর মাতৃমূর্তির একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন আছে। সপ্তমীর দিন দুর্গাপ্রতিমাকে দেখতে গিয়ে কমলাকান্ত দিব্যদৃষ্টিতে

দেখলেন সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমাকে। মনে রাখতে হবে, বঙ্কিমমানসে তখনো ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তখনো তাঁর দৃষ্টিতে 'সাকার ধর্ম বিজ্ঞান-বিরোধী', সাকার পূজো 'জ্ঞানোন্নতির কণ্টক।' তখনো তিনি কপিলের নিরীশ্বর সাংখ্যধর্মের ব্যাখ্যাতা এবং নিরীশ্বর কোঁতের ধ্রুবদর্শনের সমর্থক। তাই, দেবী দুর্গা তাঁর দৃষ্টিতে 'কমলাকান্তপ্রসূতি বঙ্গভূমি'র প্রতীক।

কমলাকান্ত বলছেন, এই সর্বৈশ্বর্যময়ী জন্মভূমি 'এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা।' কিন্তু তাঁর আশা, এই মাতৃমূর্তি একদিন 'বিশ্ববিমোহিনী মূর্তিতে জগৎ সমীপে' প্রকাশিত হবেন। 'যাঁহার ছয় কোটি সন্তান—তাঁহার ভাবনা কি?' তাই তিনি জননী জন্মভূমির সন্তানদের আহ্বান করে বলেছেন, 'এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া, আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণ-প্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?'

'মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?'—এই হল কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসবে'র মর্মবাণী। ষড়ৈশ্বর্যময়ী জননী জন্মভূমি কালগর্ভে নিহিতা। তাঁকে উদ্ধার করে গৃহে গৃহে তাঁর পুনঃপ্রতিষ্ঠাই সন্তানের জীবনব্রত। আনন্দমঠের সন্ন্যাসী মহেন্দ্রকে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ—এই ত্রিকালের মাতৃমূর্তি বর্ণনায় বলেছেন, অতীতে মা ছিলেন সর্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী; বর্তমানে তিনি হয়েছেন হৃতসর্বস্বা নগ্নিকা কালিকা। সন্ন্যাসী বলছেন, 'আজি দেশে সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী।' এই মহাশ্মশান ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।[২০] কিন্তু এখানেই শেষ নয়, ভবিষ্যতে মা যা হবেন সেই মূর্তিও মহেন্দ্র দেখলেন—'দশভুজ দশ দিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত।...দিগ্‌ভুজা—নানা প্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দিনী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ; এসো, আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।...উভয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে, মহেন্দ্র গদগদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মার এ মূর্তি কবে দেখিতে পাইব?" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "যবে

মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।”

আনন্দমঠের এই দশভুজা মাতৃমূর্তির বর্ণনা আর কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসবে'র সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমার বর্ণনা হুবহু এক। কাজেই, একথা অবশ্যই বলা চলে যে, আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র জগদ্ধাত্রী, কালী এবং দশভুজা দুর্গার প্রতীক অবলম্বন করে জননী জন্মভূমিরই অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ— এই ত্রিকালীন রূপের বর্ণনা করেছেন।

বন্দে মাতরম্ সংগীতে জননী জন্মভূমির স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীরের বর্ণনা কবিকল্পনায় পরিশীলিত হয়ে আরো সত্য ও সার্থক হয়ে উঠেছে। 'আমার দুর্গোৎসব' এবং 'বন্দে মাতরম্'-এর মধ্যে আরেকটি পার্থক্য লক্ষ্য করার মতো। 'আমার দুর্গোৎসবে' 'ছয় কোটি' সন্তানের কথা আছে, 'বন্দে মাতরমে' আছে 'সপ্তকোটি'। কেন এই পার্থক্য? 'আমার দুর্গোৎসব' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় ১২৮১ সালের কার্তিক মাসে, অর্থাৎ ১৮৭৪ সালের অক্টোবরে। আর, 'বন্দে মাতরম্' লেখা হয় তার অল্পদিনের ব্যবধানে, সম্ভবত, ১৮৭৪ বা ১৮৭৫ সালের কোনো সময়ে। এই কালসীমার মধ্যে কী ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে ছয় কোটি সাত কোটি হয়েছে?

১৮৭১ ও ১৮৮১ সনের লোকগণনার হিসাবের পর্যালোচনা এ বিষয়ে সহায়ক হতে পারে কিনা তা বিচারযোগ্য। বঙ্গদর্শনের প্রথম বৎসরের দ্বাদশ সংখ্যায় [মার্চ-এপ্রিল ১৮৭২] 'বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তার কয়েকটি হল :

১। 'বঙ্গীয় লোকসংখ্যার এই প্রথম প্রকৃত গণনা। ইহাতে স্থির হইয়াছে যে বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের শাসনাধীনে যে প্রদেশ, তাহাতে ৬৬,৮৫,৮৬,৫৬ জন লোক বসতি করে। প্রায় সাত কোটি।'

২। 'ইহার মধ্যে বাঙ্গালী কত? বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের অধীনে পাঁচটি পৃথক দেশ আছে। এই পাঁচটি দেশ বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, আসাম। তার লোকসংখ্যা :—

বাঙ্গালা	৩৬,৭৬৯,৭৩৫
বেহার	১৯,৭৩৬,১০১
উড়িষ্যা	৪,৩১৭,৯৯৯
ছোটনাগপুর	৩,৮২৫,৫৭১
আসাম	২,২০৭,৪৫৩

"অতএব সর্বশুদ্ধ তিন কোটি সাত লক্ষ কি আট লক্ষ বাঙ্গালী ভারতবর্ষে

আছে।' ১৮৭১-এর লোকগণনা অনুসারে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের লোকসংখ্যা হল :

'উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	৩,১৩,৯৬,৪৫০
বোম্বাই	১,৩৯,৮৩,৯৯৮
মাদ্রাজ	৩,১১,৭৩,৫৭৭
মহীশূর কুর্গ	৫২,২০,৬৩৩'

অবশিষ্ট প্রদেশের লোকসংখ্যা তখনো জানা যায় নি। তবে 'গতবারের ফল ধরে' বঙ্গদর্শনে নিম্নলিখিত হিসাব দেওয়া হয়েছে :

'অযোধ্যা	২,১২,২০,২৩২
পঞ্জাব	১,৭৫,৯৩,৯৪৬
মধ্য ভারতবর্ষ	৯১,০৪,৫১১
বেরাড়	২২,৩১,৫৬৫
ব্রিটেনীয়-ব্রহ্ম	২৩,৩০,৪৫৩'

একত্রে ১২,৪২,৫৫,৩৯৫। এর সঙ্গে বঙ্গদেশেব লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের শাসনাধীনে যে প্রদেশ তার লোকসংখ্যা [৬,৬৮,৫৮,৬৫৬] ধরলে ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ১৯,১১,১২,২৫৪। বলা প্রয়োজন, এই সমগ্র লোকসংখ্যার তিন অংশের একাংশেরও বেশি বংগদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের অধীন।

৩। '১৮৭১ সালে বঙ্গদেশ নিয়ে গবর্নর জেনারেলের অধীনে ছিল দশটি খণ্ডরাজ্য। এক এক খণ্ড রাজ্য এক একজন গবর্নর বা লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর বা চীফ কমিশনার শাসন করতেন। বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধে বলা হয়েছে 'অন্যান্য নয় জন যত লোক শাসন করেন, একা বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর তার সমষ্টির অর্ধেক শাসন করেন।'

৪। ১৮৭১ সালে বঙ্গদেশে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,৮১,০৫,৪৩৮ এবং ১,৭৬,০৯,১৩৫।

১৮৭১ সালের লোকগণনার এই যে হিসাব বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ থেকে দেওয়া হল তার সঙ্গে ১৮৮১ সালের লোকগণনার হিসাবের একটা তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। তার আগে একটা কথা বলে নেওয়া অত্যাবশ্যক। ১৮৭৪ সালে সিলেট কাছাড় ও গোয়ালপাড়া—এই তিনটি বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। সেদিনকার এই বঙ্গচ্ছেদ দেশে বিশেষ কোনো আন্দোলন সৃষ্টি করে নি। কিন্তু তার ফলে বঙ্গদেশে বাংলাভাষাভাষীর সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। দশ বৎসরে যেখানে

আনুপাতিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা সেখানে বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর নিয়ে বঙ্গদেশের মোট জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৬,৬৬,৯১,৪৫৬।[২১] দশ বৎসর আগে, ১৮৭১ সালে ছিল ৬,৬৮,৫৮,৬৫৬। বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর বাদ দিয়ে কেবল বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা ছিল, ৩,৫৬,০৭, ৬২৮। অর্থাৎ দশ বৎসর আগের চেয়ে প্রায় বারো লক্ষ কম। আর সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া আসামে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে মূল বঙ্গদেশে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১,৭২,৫৪,১২০ এবং ১,৭৮,৬৩, ৪১১। অর্থাৎ শতকরা হিন্দু ৪৮·৪৫ ভাগ, আর মুসলমান ৫০·১৬ ভাগ।[২২] অর্থাৎ ১৮৭৪ সালের পূর্বে বঙ্গদেশে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া আসামের অন্তর্ভুক্ত করায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে ১৮৮১ সালে যত মুসলমান ছিলেন তার অর্ধেক বাস করতেন 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী' অর্থাৎ বৃহত্তর বঙ্গদেশে।[২৩]

এবার ১৮৭১ ও ১৮৮১ সালের লোকগণনার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্রপ্রদত্ত সংখ্যার বিচার করা যেতে পারে। ১২৭৯ সালের চৈত্রমাসে রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' গ্রন্থের আলোচনার উপসংহারে উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' গানের উল্লেখ করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন, 'এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।' বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির এই রচনাকাল ১৮৭৩ সালের মার্চ-এপ্রিল। ১৮৭১ সালের লোকগণনা অনুসারে ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ১৯ কোটি ১১ লক্ষের কিছু বেশি। সুতরাং বিংশতি কোটির কবিকল্পনা ও তার সমর্থনও অবাস্তব হয় নি।

দ্বিতীয়ত, 'আমার দুর্গোৎসবে' বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'যাঁহার ছয় কোটি সন্তান—তাঁহার ভাবনা কি?' 'আমার দুর্গোৎসব' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮১-র কার্তিকে, অর্থাৎ ১৮৭৪-এর অক্টোবরে। তার আগেই সিলেট কাছাড় ও গোয়ালপাড়া বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। অর্থাৎ সংখ্যা ৬ কোটি ৬৮ লক্ষ থেকে বেশ কয়েক লক্ষ কমে এসেছে। সুতরাং ছয় কোটি বলাই সংগত হয়েছে।

কিন্তু বন্দে মাতরম্-এ আছে সপ্তকোটিকণ্ঠের কথা। এখানে স্বভাবতই মনে দুটি প্রশ্ন উদিত হয়। প্রথম, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত ১৮৭১ সালের লোকগণনার যে পর্যালোচনা ১৮৭২ সালের মার্চ-এপ্রিলে [বঙ্গদর্শন, প্রথম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যায়] করা হয়েছিল তাতে বলা হয় 'বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের শাসনাধীনে যে প্রদেশ' তার লোকসংখ্যা 'প্রায় সাতকোটি'। তারপর

১৮৭৪ সালে সিলেট কাছাড় ও গোয়ালপাড়াকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করায় বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব' এই ভাগাভাগির পরে রচিত। এইজন্যই সাত কোটি না বলে ছয় কোটি বলা হয়েছে। তাহলে কি 'বন্দে মাতরম্' ১৮৭৪ সালের বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পূর্বে রচিত? অর্থাৎ 'আমার দুর্গোৎসবে'রও পূর্বে—১৮৭৪ সালের প্রথম দিকে? এ সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

এখানেই মনে দ্বিতীয় প্রশ্ন উদিত হয়। 'আমার দুর্গোৎসবে' এবং 'একটি গীতে' কালস্রোতে নিমজ্জিত দেশজননীর কথাই কমলাকান্ত বলেছেন। 'একটি গীতে' অবশ্য কালস্রোত গঙ্গাস্রোত হয়েছে। উক্ত নিবন্ধের শেষ বাক্যে আছে 'যদি গঙ্গার অতল-জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন?' 'আনন্দমঠে' ভবানন্দ মায়ের ত্রিকালীন মূর্তি মহেন্দ্রকে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে মায়ের আরেকটি মূর্তি আছে। সে মূর্তি তাঁর নিত্যকালীন মূর্তি। মহেন্দ্র বিষ্ণুমন্দিরে সেই নিত্যকালীন মূর্তিকেই প্রথম দেখেছিলেন। আনন্দমঠের তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত সেই মূর্তি 'বিষ্ণুর মাথার উপরে' উচ্চ মঞ্চে বহুল রত্নমণ্ডিত আসনে উপবিষ্টা ছিলেন। চতুর্থ সংস্করণ থেকে তিনি 'বিষ্ণুর অঙ্কোপরি' স্থাপিতা হয়েছেন। সেই 'মোহিনী মূর্তি—লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্যান্বিতা।' 'বন্দে মাতরম্' দেশজননীর এই নিত্যকালীন মূর্তিরই ধ্যান। তাই তিনি সপ্তকোটী সন্তানের জননী। অবশ্য সপ্তকোটী একদিকে ১৮৭৪ সালের বঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদও বটে, আবার অন্যদিকে তা সংখ্যাসূচক হয়েও প্রতীকাত্মক।

পূর্বে আলোচিত তিনটি রচনা প্রসঙ্গে [হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা, আমার দুর্গোৎসব এবং বন্দে মাতরম্] বঙ্কিমমানসের বিচারে প্রবৃত্ত হলে তিনটি সত্যে উপনীত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না। ১। বঙ্কিমচন্দ্র 'মিলে সবে ভারত সন্তান' গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে 'বিংশতি কোটি ভারতবাসী'র-ই জয়ধ্বনি উচ্চারণ করেছেন। ২। তিনি যে 'আমার দুর্গোৎসবে' ছয় কোটি এবং 'বন্দে মাতরম্'-এ 'সপ্তকোটী' সন্তানের কথা বলেছেন তারা শুধু বঙ্গভাষাভাষী বাঙালীই নয়, তাদের মধ্যে আছে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ছোটনাগপুর, বিহার এবং উড়িষ্যারও সন্তান। এবং, ৩। তাঁর ছয় কোটি বা সপ্ত কোটির মধ্যে হিন্দু যেমন আছে, মুসলমানও তেমনি আছে।

এই সূত্রত্রয় থেকে যে সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে তা হল এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রাদেশিকও ছিলেন না, সাম্প্রদায়িকও ছিলেন না।

একটি প্রশ্ন তবু থেকে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বন্দে মাতরম্-এ বিংশতি কোটির কথা না বলে সপ্ত কোটির কথা বললেন কেন? তার প্রধান কারণ, ১৮৮১ সালে ভারতের ২৫ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের মধ্যে দেশীয় রাজ্যের ৫ কোটি ৬০ লক্ষ লোককে বাদ দিয়ে ২০ কোটি লোক বাস করতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে। এই সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রথমে ছিল তিনটি প্রেসিডেন্সি—বেঙ্গল, মাদ্রাজ ও বম্বে। তার সঙ্গে পরে যুক্ত হয়েছিল উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, অযোধ্যা, পঞ্জাব, মধ্যভারত, আসাম ও ব্রহ্মদেশ। তিনটি প্রেসিডেন্সির মধ্যে বেঙ্গলই ছিল বৃহত্তম। আয়তন দেড় লক্ষাধিক বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় সাত কোটি। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি শুধু আয়তন ও জনসংখ্যায়ই বৃহত্তম ছিল না, এখানেই ব্রিটিশ প্রভুত্বের সূত্রপাত। তখনো কলিকাতাই ছিল ব্রিটিশ শাসনের প্রাণকেন্দ্র। ব্রিটিশ শাসনের সুফল এবং কুফল—দুটিই বঙ্গদেশে সবার আগে সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়েছে। একটি মধ্যযুগীয় জাতি যে একটি আধুনিক জাতিতে রূপান্তরিত হল তাও প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে বঙ্গদেশেই। তার প্রমাণ রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র। স্বভাবতই জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রেও বাঙালীরাই ছিল অগ্রণী পথিকৃৎ। এই প্রসঙ্গে অরবিন্দের একটি উক্তি মনে পড়ছে। বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের অব্যবহিত পরে, বম্বের 'ইন্দুপ্রকাশে' ১৮৯৪ সালে তিনি সাত কিস্তিতে ইংরেজিতে যে প্রবন্ধ লেখেন তাতে বলেছেন,

What Bengal thinks tomorrow, India will be thinking tomorrow week.[২৪]

অর্থাৎ পূর্বদিগন্ত থেকেই জাতীয় জাগরণের বাণী ভারতের 'দশদিগন্ত' প্রকম্পিত করেছে। 'বন্দে মাতরম্' যে কোনো প্রদেশবিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের সংগীত নয়, তা যে সারা ভারতেরই জাতীয় সংগীত, এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর বক্তব্যই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ১৯২৭ সালে গান্ধীজি বলেন,

When we sing that ode to motherland, 'Bande Mataram', we sing it to the whole of India[২৫]

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ শেষ করে ইংলণ্ড হয়ে গান্ধীজি ভারতের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯১৫ সালের ৯ জানুয়ারি। ২৭ এপ্রিল মাদ্রাজে শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে ওয়াই এম সি এ-র এক সভায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি যে ভাষণ দেন তাতে জাতীয় সংগীত হিসাবে 'বন্দে মাতরম্'-এর যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন তা অতুলনীয়। গান্ধীজি বলেন :

And so it is that you have sung that beautiful song, on

hearing of which all of us sprang to our feet. The poet has lavished all the adjectives, that he possibly could, to describe Mother India. He describes Mother India as sweet-smiling, sweet-speaking, fragrant, all-powerful, all good, truthful ; land flowing with milk and honey, land having ripe fields, fruits and grains, land inhabited by a race of men of whom we have only a picture in the great Golden Age. He pictures to us a land which shall embrace in its possesion the whole of the world, the whole of humanity by the might or right, not of physical power but of soul power.···The poet, no doubt, gave us a picture for our realisation, the words of which simply remain prophetic, and it is for you, the hope of India, to realize every word that the poet has said in describing this motherland of ours.[২৬]

'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে মুসলীম লীগের প্রতিবাদ যখন চরমে ওঠে তখন, ১৯৩৯ সালের ১লা জুলাই 'হরিজন' পত্রে জাতীয় পতাকা ও বন্দে মাতরম্ সম্পর্কে গান্ধীজি তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেন। বন্দে মাতরম্ সম্পর্কে তিনি লেখেন,

What I have said about the flag applies *mutatis mutandis* to the singing of 'Bande Mataram'. No matter what its source was and how and when it was composed, it had become a powerful battle cry among the Hindus and Muslims of Bengal during the partition days. It was an anti-imperialist cry. As a lad, when I knew nothing of *Ananda Math* or of Bankim, its immortal author, 'Bande Mataram' had gripped me, and when I first heard it sung, it had enthralled me. It never occurred to me that it was a Hindu song or it was meant only for Hindus. * * * It is enthroned in the hearts of millions. The flag and the song will live, as long as the nation lives.[২৭]

৫.

আমাদের আলোচনা মুখ্যত কেন্দ্রীভূত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সংগীতে।

স্বভাবতই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা ও ক্রমবিস্তারের সুদীর্ঘ ইতিহাস এই আলোচনায় অপেক্ষাকৃত গৌণ। আলোচনার প্রথমেই বলা হয়েছে, 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বন্দে মাতরমের ঋষি সম্পর্কে তিনটি উক্তি করেছেন। প্রথম, বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত রচনাবলীর শ্রেষ্ঠ ভাব হল স্বদেশধর্ম—'religion of patriotism'। দ্বিতীয়, যে-নতুন প্রেরণায় প্রবুদ্ধ হয়ে আমরা নবজাগরণ ও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হচ্ছি তার প্রেরণাদাতা ও রাষ্ট্রগুরু হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তৃতীয়, তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট দান হল জননী জন্মভূমির মাতৃরূপ দর্শন।

১৮৯৪ সালে ইন্দুপ্রকাশে শ্রীঅরবিন্দ যে বঙ্কিমজীবনী রচনা করেছিলেন তার শেষ অনুচ্ছেদে তিনি বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র জগৎকে তিনটি মহৎ বস্তু দান করে গেছেন। বাংলা সাহিত্য, বাংলা ভাষা এবং বাঙালী জাতি। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের নামের সঙ্গে আরেকটি নাম যুক্ত করেছেন—সে নাম মাইকেল মধুসূদন দত্তের। অরবিন্দ বলছেন,

Bankim and Madhusudan have given the world three noble things. They have given it Bengali Literature, a literature whose princelier creations bear comparison with the proudest classics of modern Europe. They have given it the Bengali Language. The dialect of Bengal is no longer a dialect, but has become the speech of Gods, a language unfading and indestructible which cannot die except with the Bengali nation and not even then. And they have given it the Bengali nation; a people spirited, bold, ingenious and imaginative, high among the most intellectual races of the world.[২৮]

এই প্রবন্ধে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার যে তুলনামূলক আলোচনা বাইশ বৎসরের তরুণ অরবিন্দ করেছেন তা, এক কথায় বিস্ময়কর। কিন্তু মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র জগৎকে যে তিনটি মহৎ বস্তু দান করে গেছেন, আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আপাতত নিবদ্ধ হবে তার তৃতীয়টির প্রতি। দত্তকুলোদ্ভব কবি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মতো মাতৃভক্ত সন্তান খুব কমই পাওয়া যাবে। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র একটি রচনায় তিনি বলেছেন,

মার কোল সম, মা গো, এ তিন ভুবনে
আছে কি আশ্রম আর ?

এ 'মা' অবশ্য কবিজননী বাগ্‌দেবী। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কবি মা-র কোলকে সন্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ 'আশ্রয়' না বলে বলেছেন 'আশ্রম'। জননী জন্মভূমি সম্পর্কেও তাঁর অনুরূপ দৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

মধুসূদন ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের কবিপুরুষ। তাঁর মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্যে' তিনি জন্মভূমির এক আদর্শ সন্তান সৃষ্টি করেছেন। সে সন্তান বাসববিজয়ী বীর মেঘনাদ। স্বজাতিদ্রোহী পিতৃব্য বিভীষণের প্রতি ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদের ধিক্কারবাণী এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। লঙ্কাপ্রতিরোধকারী বিজাতীয় বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামে সেনাপতিপদে বৃত হবার পর নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে মেঘনাদ অগ্নি-উপাসনায় যখন ধ্যানস্থ, তখন বিভীষণ নিরস্ত্র বীরকে হত্যার জন্য লক্ষ্মণকে পথ দেখিয়ে চোরের মতো যজ্ঞাগারে প্রবেশ করলেন। বিশ্বাসঘাতী পিতৃব্যের এই হীন আচরণে লজ্জিত, বিক্ষুব্ধ মেঘনাদ চরম ঘৃণায় বলছে,

> কোন্ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
> জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
> জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
> পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
> নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা।

এখানে 'জ্ঞাতিত্ব-ভ্রাতৃত্ব-জাতি-ত্যাগী' বিভীষণ লঙ্কার বীরপুত্রের কাছে সমুচিত ভর্ৎসনাই লাভ করেছেন। বলাই বাহুল্য, মধুসূদন জাতিত্বের কথা কখনোই ভোলেন নি, এবং তাঁর দৃষ্টিতেও বঙ্গভূমিই মাতৃভূমি।

মধুসূদন পিতৃবিয়োগের পর ৩২ বৎসর বয়সে মাদ্রাজ-প্রবাস ছেড়ে কলিকাতায় ফিরে আসেন ১৮৫৬ সালে। ১৮৫৮ থেকে ১৮৬২—এই বৎসর চারেকের মধ্যে ঝড়ের বেগে নাটক, প্রহসন, আখ্যানকাব্য, পত্রকাব্য, প্রশস্তি-কাব্য, এবং সর্বোপরি এক অবিনশ্বর মহাকাব্য রচনা করে তিনি আধুনিক বাংলা কাব্যের ও উদাত্ত কবিভাষার জন্ম দিয়ে ব্যারিস্টার হওয়ার উচ্চাভিলাষে বিলাত যাত্রা করেন ১৮৬২ সালে। মাতৃভূমি ত্যাগ করার পূর্বে তিনি দুটি অবিস্মরণীয় গীতিকবিতা রচনা করে যান—'আত্ম-বিলাপ' এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি'। 'আত্ম-বিলাপ' কবির অন্তরঙ্গ আত্মকথা। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটি কবির স্বদেশপ্রীতির উজ্জ্বলতম নিদর্শন। প্রবাসযাত্রার পূর্বে, নিজের অনির্দিষ্ট ভবিতব্যের কথা ভেবে, কবি তাঁর জননী জন্মভূমির কাছে কাতর প্রার্থনা জানিয়ে বলছেন,

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাদ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।

* * *

কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ গো, শ্যামা জন্মদে।

মহাকবির 'সুবরদা' 'শ্যামা জন্মদা'ই আধুনিক বাংলা কাব্যে বঙ্গভূমির প্রথম মাতৃরূপ।[২৯]

য়ুরোপ প্রবাসকালে ফ্রান্সের ভার্সেই শহরে বসে মধুসূদন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করেন। ১৮৬৫ সালে এই কাব্যগ্রন্থ শেষ করে 'সমাপ্তে' শীর্ষক অন্তিম সনেটে তিনি বাগ্‌দেবীর কাছে প্রার্থনা করছেন :

এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ ভারত-রতনে !

এখানে বাগ্‌দেবীই 'বরদা'। আর বঙ্গভূমি ভারত-রত্ন-স্বরূপিণী। কিন্তু এহো বাহ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো, বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বেই, মধুসূদন জন্মভূমির মাতৃরূপ দর্শন করেছেন তাঁর 'দেবদৃষ্টি' কবিতায়। মধুসূদনের মৃত্যু হয় ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন। 'দেবদৃষ্টি' কবে রচিত হয়েছিল জানা যায় না। কবিতাটি আবিষ্কারের কৃতিত্ব 'মধুস্মৃতি'-রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ সোমের প্রাপ্য। ১৮৭২ সালের সংস্করণে ৫২৮-২৯ পৃষ্ঠায় কবিতাটি উৎকলিত হয়েছে।

কবিতাটির বিষয়বস্তু হল শচী ও শচীপতির বিশ্বদর্শন। শচীকে নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্ণমেঘাসনে বিশ্বদর্শনে বেরিয়েছেন। অবশেষে তাঁরা এ স পেঁছিলেন বঙ্গদেশে। এদেশ সম্পর্কে শচীর প্রশ্নের উত্তরে ইন্দ্র বলছেন—

বঙ্গ এ দেশের নাম বিখ্যাত জগতে।
ভারতের প্রিয় মেয়ে
মা নাই ইহার চেয়ে
নিত্য অলংকৃত হীরা মুক্তা মরকতে।
সস্নেহে জাহ্নবী তারে
মেখলেন চারি ধারে
বরুণ ধোয়েন পা দুখানি।

নিত্য রক্ষকের বেশে
হিমাদ্রি উত্তর দেশে
পরেশনাথ আপনি
শিরে তার শিরোমণি
সেই এই বঙ্গভূমি শুন লো ইন্দ্রানি।

উদ্ধৃতাংশের দুটি অংশ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মতো। মাতৃভূমিকে মধুসূদন বলছেন 'মা নাই ইহার চেয়ে'। আর, তাঁর পা দুখানি ধুইয়ে দিচ্ছেন জলদেবতা বরুণ: 'বরুণ ধোয়েন পা দুখানি।'

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, সেদিনকার বাঙালীর দৃষ্টিতে জন্মভূমি বলতে কখনো বঙ্গভূমি, কখনো ভারতভূমির রূপ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের 'দেবদৃষ্টি'র সমসাময়িক কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' রূপক-নাট্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর ইংরেজি আত্মজীবনীতে ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে আমাদের জাতীয়তাবোধের ইতিহাস বর্ণনায় বলেছেন,

It was the Stage that first proclaimed the gospel of the religion of motherland in an opera, now completely forgotten, called "Bharat-Mata" or "Mother India."

অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ, তাঁর 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন, কিরণচন্দ্র তাঁর দুখানি নাটিকা 'ভারতমাতা' ও 'ভারতে যবন'কে বলেছেন 'মাস্ক' বা রূপক-নাটিকা। কিরণচন্দ্রের মতে 'বঙ্গভাষায় ভারতমাতা প্রথম মাস্ক [রূপক]।'[৩০]

প্রসঙ্গক্রমে সেইসময়কার জাতীয় সংগীতের কথাও একটু বলে নেওয়া প্রয়োজন। কেননা 'সংগীতে মানবের চিত্তবৃত্তিনিচয় একতান হয় ও অসীম শক্তি লাভ করে'।[৩১] 'বন্দে মাতরম্'-নামা সংগীত সংকলনের পরিবর্ধিত সংস্করণের [২রা আষাঢ়, ১৩৫৫] ভূমিকায় প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'সর্বপ্রথম জাতীয় সংগীতের সংগ্রহপুস্তক বাহির করেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। পর বৎসর ঐ সংগীতগুলির ইংরেজি তর্জমা লাহোর হইতে প্রকাশ করেন শ্রীশচন্দ্র বসু ও উহার হিন্দি তর্জমা বাহির করেন শ্রীশবাবুর বন্ধু লোধারাম নন্দ।'

'বন্দে মাতরম্' প্রথম কোন্ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে গীত হয়েছিল তার আলোচনা যথাস্থানে করা হবে, কিন্তু ১৮৮৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে দ্বিতীয় অধিবেশন হয় তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের সমবয়সী কবিবর হেমচন্দ্র[৩২]

তাঁর 'রাখিবন্ধন' কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্'-এর কিয়দংশ গ্রথিত করেন। হেমচন্দ্রের রাখিবন্ধনের প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধারযোগ্য :

কি আনন্দ আজি ভারত-ভুবনে—
ভারতজননী জাগিল।

* * *

প্রেম-আলিঙ্গনে করে রাখি কর,
খুলে গেছে হৃদি—হৃদি পরস্পর,
একপ্রাণ সবে এক কণ্ঠস্বর
মুখে জয়ধ্বনি ধরিল।
প্রণয়-বিহ্বলে ধরে গলে গলে
গাহিল সকলে মধুর কাকলে
গাহিল—"বন্দে মাতরং।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরং
শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীং
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরং,
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরং।"
উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে
ভারত-জগৎ মাতিল।

হেমচন্দ্রের কবিকল্পনায় ভারত-ভুবনে, ভারত-জননীর জাগরণে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্'-ই সারা ভারতের মহামিলনের রাখিবন্ধন-সংগীত হয়ে উঠেছে।

৬

১৮৯৪ সালে অরবিন্দ তাঁর বঙ্কিমজীবনীতে বঙ্কিমচন্দ্র এবং মধুসূদনের নাম করেছেন। কিন্তু, আমাদের মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে জন্মভূমির সর্ববরেণ্য রূপশিল্পী হলেন মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়। দুর্ভাগ্যবশত আজো তিনি

তাঁর ন্যায্য পাওনা উত্তরসূরিদের কাছে পান নি। 'ভূদেব রচনাসম্ভারে'র সম্পাদক প্রমথনাথ বিশী এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, 'পুষ্পাঞ্জলি ও আনন্দমঠ পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলে সন্দেহমাত্র থাকে না যে, ১৮৭৬ সালের পুষ্পাঞ্জলি ১৮৮২ সালের আনন্দমঠে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ...পুষ্পাঞ্জলির অষ্টম অধ্যায় এবং আনন্দমঠের ১ম ভাগ ১১শ পরিচ্ছেদ পাশাপাশি পড়িলেই বাকি সন্দেহটুকু লোপ পাইবে। দুই স্থলেই দেবীমূর্তির ব্যাখ্যাচ্ছলে মাতৃমূর্তির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এ মাতার আধিভৌতিক রূপ ভারতবর্ষ। তবে প্রভেদের মধ্যে পুষ্পাঞ্জলিতে হিন্দু ধর্মের উপরে জোর দেওয়া হইয়াছে, আনন্দমঠে জোর দেওয়া হইয়াছে হিন্দু জাতীয়তার উপরে।'[৩৩]

এই উদ্ধৃতিতে লেখক 'পুষ্পাঞ্জলি' ও 'আনন্দমঠে'র যে প্রকাশকালের নির্দেশ দিয়েছেন তা গ্রন্থাকারে প্রকাশের তারিখ। রচনাকালের তারিখও এক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক। তাছাড়া 'পুষ্পাঞ্জলিতে হিন্দু ধর্মের উপরে জোর দেওয়া হইয়াছে, আনন্দমঠে জোর দেওয়া হইয়াছে হিন্দু জাতীয়তার উপরে'—ভূমিকাকারের এই মন্তব্যও সতর্ক বিচারসাপেক্ষ।

'ভূদেবের স্বদেশচেতনা' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন অধ্যাপিকা ড° শিপ্রা লাহিড়ী তাঁর 'ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য' নামক গবেষণাগ্রন্থে।[৩৪] গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ের নাম 'ভূদেব ও বাংলা সাহিত্য'। তাতে 'ভূদেব ও বঙ্কিমচন্দ্র' এবং 'ভূদেব ও রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপর ভূদেবের স্বদেশচিন্তার প্রভাবের বিষয় আলোচিত হয়েছে।[৩৫]

'ভূদেবের স্বদেশচেতনা' অধ্যায়ে শ্রীমতী লাহিড়ী 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' এবং 'পুষ্পাঞ্জলি'র আলোচনা করেছেন। প্রাবন্ধিক ভূদেবের সর্বোত্তম গ্রন্থ 'সামাজিক প্রবন্ধ'। এই গ্রন্থ সম্পর্কে শ্রীমতী লাহিড়ী তাঁর গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাই 'ভূদেবের স্বদেশচেতনা'য় তার পুনরালোচনা করা হয় নি। কিন্তু ভূদেবের স্বদেশচেতনার তিনটি প্রধান স্তম্ভ হল 'পুষ্পাঞ্জলি', 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' এবং 'সামাজিক প্রবন্ধ'। 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে' ভূদেবকল্পিত স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন বাণীরূপ লাভ করেছে। এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিন্দু মুসলমানের মিলিত ভারতবর্ষের কল্পনা। গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে,

"আমাদিগের এই জন্মভূমি চিরকাল অন্তর্বিবাদানলে দগ্ধ হইয়া

আসিতেছিল, আজি সেই বিবাদানল নির্বাপিত হইবে। আজি ভারতভূমির মাতৃভক্তিপরায়ণ পুত্রেরা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে শান্তিজলে অভিষিক্ত করিবেন।"

"ভারতভূমি যদিও হিন্দু জাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর ইঁহার পর নহেন, ইনি উহাদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইঁহার পালিত সন্তান।"

"এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্যপালিত দুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয়, সকলের শাস্ত্রমতেই হয়। অতএব ভারতবর্ষ-নিবাসী হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ জন্মিয়াছে।"[৩৬]

ভারতের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে ভূদেবের দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনায় গ্রন্থকর্ত্রীর মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'মুসলমান সম্পর্কে ভূদেবের দৃষ্টিভঙ্গি শুধু উদার বললেই যথেষ্ট হয় না, উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে তাঁর চিন্তাই ছিল সবচেয়ে প্রাগ্রসর'।[৩৭]

ভূদেব প্রসঙ্গে মনে রখা প্রয়োজন, তাঁর জন্ম ১৮২৫ সালে। বয়সে তিনি মধুসূদনের বৎসর খানেকের ছোট, কিন্তু 'হিন্দু কলেজে' তাঁরা ছিলেন সতীর্থ। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর ইংরেজি আত্মজীবনীতে বলেছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রবর্তিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক-সঙ্ঘে বিদ্যাসাগর এবং ভূদেব দুজনেই ছিলেন।[৩৮] ব্যক্তিগত জীবন-চর্যায় ভূদেব ব্রাহ্মণ্য আচার-আচরণকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন এবং তাঁর 'পারিবারিক প্রবন্ধ', ও 'আচার প্রবন্ধ' প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে তাঁকে রক্ষণশীল বলেই মনে হয়। কিন্তু পরিচ্ছন্ন মননশীলতায় 'সামাজিক প্রবন্ধে'র লেখক ছিলেন সে যুগের পথিকৃৎ চিন্তানায়ক।

প্রবন্ধগ্রন্থ হিসাবে যেমন 'সামাজিক প্রবন্ধ', সৃষ্টিশীল রচনা হিসাবে তেমনি 'পুষ্পাঞ্জলি' ভূদেবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। 'পুষ্পাঞ্জলি' রচনার ইতিহাস প্রসঙ্গে 'ভূদেব-চরিত' প্রথম ভাগে বলা হয়েছে—

"১২৭৬ সনের ১লা বৈশাখ (১৮৬৯) উনবিংশ পুরাণ (স্বয়ম্বরা-ভাসপর্ব) নামে একখানি পুস্তক বুধোদয় যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। ভূদেববাবুর কোনো প্রিয় শিষ্য তাঁহার নিকট শুনিয়া এবং তাঁহারই নিকটে

বসিয়া ঐ পুস্তকখানি রচনা করেন। কাটকুট করিতে করিতে রচনা একরূপ ভূদেববাবুরই দাঁড়াইয়া যায় [ভূদেবের পুষ্পাঞ্জলি পুস্তকখানি ঐ ঊনবিংশ পুরাণেরই তীর্থদর্শন-পর্ব স্বরূপে প্রথম লেখা হইয়াছিল।] শেষ অধ্যায়টি সম্পূর্ণই ভূদেববাবুর লেখা। উহাতে ভূদেববাবুর কবিত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক দৃষ্টি এবং যোগীজনসুলভ ভবিষ্যৎদৃষ্টি সুপ্রকাশিত। প্রাকৃতিক শক্তিতে যাহা ঘটে, মহাত্মারা তাহা পূর্ব হইতে দেখিতে পান এবং সেইদিকে লোকের মন ফিরাইয়া রাখেন। ভূদেববাবুকে বৈধ স্বদেশীয়ুগের প্রবর্তক বলিয়া বিশেষজ্ঞরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।”[৩৯]

শ্রীমতী লাহিড়ী যুক্তিপ্রমাণের সাহায্যে বলেছেন, ‘ঊনবিংশ পুরাণ’ ভূদেবের রচনা। তিনি ঊনবিংশ পুরাণের নামকরণ করেছেন ‘স্বদেশপুরাণ’। ‘ভূদেব-চরিত’ থেকে উদ্ধৃত অংশে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে লেখা হয়েছে, ‘ভূদেবের পুষ্পাঞ্জলি পুস্তকখানি ঐ ঊনবিংশ পুরাণেরই তীর্থদর্শন-পর্ব স্বরূপে প্রথম লেখা হইয়াছিল।’ এই উক্তির উপর নির্ভর করে বলা যায় ‘পুষ্পাঞ্জলি’ রচনা ‘ঊনবিংশ পুরাণ’ গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে [অর্থাৎ ১৮৬৯ সালের পূর্বে] কিংবা তার কিছু সময় পরে সম্পূর্ণ হয়েছিল।

‘পুষ্পাঞ্জলি’ প্রকৃতপক্ষে ভারততীর্থপরিক্রমা। এর মধ্যে আছে তিনটি চরিত্র। বেদব্যাস, মার্কণ্ডেয় এবং দেবী। গ্রন্থকার বলেছেন, ‘বেদব্যাস স্বজাতি-অনুরাগের, মার্কণ্ডেয় জ্ঞানরাশির এবং দেবী মাতৃভূমির প্রতিরূপ-স্বরূপ’ বর্ণিত হয়েছেন। ঊনবিংশ পুরাণের তৃতীয়অধ্যায়ের নাম ‘অধি-ভারতীর ভাবান্তর’। সুতরাং পুষ্পাঞ্জলির মাতৃভূমির প্রতিরূপস্বরূপ দেবী, ভূদেবের ভাষায়, ‘অধিভারতী’। জন্মভূমির নৈসর্গিক রূপই স্বদেশ-ভক্তের ধ্যানদৃষ্টিতে দেবীরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাঁর রূপবর্ণনায় বেদব্যাস মার্কণ্ডেয়কে বলছেন,

“আমি ধ্যানে কি অপূর্ব মূর্তি দর্শন করিলাম! ঐ মূর্তি চিরকালের নিমিত্ত আমার হৃদয়কন্দরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। পাদপদ্মের কি অনুপম সৌন্দর্য—অঙ্গের কি জাজ্জ্বল্যমান প্রভা, মুখচন্দ্রের কি রুচির কান্তি! ইনি পর্বতরাজপুত্রী পার্বতীর ন্যায় সিংহবাহনে আরূঢ়া নহেন—ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবীর যাবতীয় শোভা ইঁহার অঙ্গের একদেশেই বিদ্যমান—ইঁহাকে মাধব-প্রিয়া বলিয়াও ভ্রম হয় না; রমা রক্তাম্বরা, ইনি হরিদ্বসনা—ব্রহ্মনন্দিনীর ন্যায় ইঁহার সুস্নিগ্ধ সৌম্যভাব বটে, কিন্তু ইনি বীণাপাণি নহেন—আর অন্য সকল দেবদেবী হইতে ইঁহার বৈচিত্র্য এই যে, ইনি নিরন্তর অপত্যবর্গ লইয়া সকলকে মাতৃভাবে অন্ন পান প্রদান করিতেছেন।”[৪০]

অর্থাৎ ভূদেবের জননী জন্মভূমি ধ্যানদৃষ্টিতে দেবীস্বরূপা হয়েও দুর্গা, গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কেউই নন—তিনি এক অনন্যপরতন্ত্রা দেবী। ভূদেবের ভাষায় তাঁর নাম 'অধিভারতী'। এই 'অধিভারতী'র ধ্যান ও প্রণামমন্ত্রও ভূদেব রচনা করেছিলেন। এখানে তা অবশ্য-উদ্ধারযোগ্য :

ধ্যান

হেমাভা হরিদম্বরা পদতলে নীলাম্বুলীলাঞ্চিতা
স্নিগ্ধা স্নিগ্ধতরঙ্গিণী সুরধুনী পীযূষনিষ্যন্দিনী।
সূর্যেন্দুপ্রতিবিম্বিতাম্বরলসৎ প্রালেয়মৌলিজ্বলা
সৌম্যা স্যাদধিভারতী ভয়হরা নিত্যান্নদা শান্তয়ে ॥

প্রণাম

মাতর্নমামি ভবতীং সতীদেহরূপাং
মাতর্নমামি বসুধাতলপুণ্যতীর্থং।
মাতর্নমামি পদযুগ্মধৃতা-সমুদ্রাং
মাতর্নমামি হিমগৌরকিরীটভূষাং ॥

বলাই বাহুল্য, ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলেই ভূদেবের ভারতমাতার নাম 'অধিভারতী'। এই অধিভারতীর ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র সংস্কৃত কবিভাষায় স্বদেশভক্ত ভূদেবের অনবদ্য মাতৃবন্দনা।

ভূদেবের ধ্যানে জননী জন্মভূমি স্বর্ণকান্তি, হরিদ্বসনা। তাঁর পদতল নীলাম্বুরাশি-পরিপূজিত। [অঞ্চিতা অর্থ পূজিতা, ভূষিতা]। তিনি স্নিগ্ধতরঙ্গিণী সুরধুনীর মতো স্নিগ্ধা, পীযূষবর্ষিণী। সূর্যচন্দ্র-প্রতিবিম্বিত অম্বর তাঁর তুষারকিরীটে বিলসিত। সৌম্যা শান্তিপ্রদা দেবী অধিভারতী ভয়হরা, নিত্যান্নদা।

প্রণামমন্ত্রে ভূদেব চারটি বিশেষণে বিভূষিত করে বলছেন, মাতা সতীদেহরূপা, বসুধাতলপুণ্যতীর্থ, পদযুগ্মধৃতসমুদ্রা এবং হিমগৌরকিরীট-ভূষা।

পুষ্পাঞ্জলি'তে 'স্বজাতি-অনুরাগে'র প্রতিভূ বেদব্যাস বলছেন, 'অন্য সকল দেবদেবী হইতে ইঁহার বৈচিত্র্য এই যে, ইনি নিরন্তর অপত্যবর্গ লইয়া সকলকে মাতৃভাবে অন্ন পান প্রদান করিতেছেন।' কমলাকান্তের সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমাও অসংখ্যসন্তানকুলপালিকা, ধনধান্যদায়িকা। 'আমার দুর্গোৎসবে'র শেষে কমলাকান্ত আর্যস্তোত্রের অনুসরণে যে মাতৃস্তব রচনা করেছেন তাতেও তিনি 'বঙ্গজগদ্ধাত্রী'কে বলেছেন, সুখদা, অন্নদা, বরদা, শর্মদা। ভূদেবের প্রণামমন্ত্রে অধিভারতীর প্রথম বিশেষণ—তিনি সতীদেহরূপা। কমলাকান্তের

'বঙ্গজগদ্ধাত্রী'ও 'শৈলপুত্রী বসুন্ধরা।' তাঁর মাতৃপ্রণামের অন্তিম ফলশ্রুতি হল বন্ধনমোচন : 'নমামি শিরসা দেবীং বন্ধনোহস্তু বিমোচিতঃ।'

পূর্বে কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসবে'র 'বিশ্ববিমোহিনী মূর্তি'প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' সংগীতের ইঙ্গিত করেছিলাম। এই গানটি কবির 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থে 'ভারতলক্ষ্মী' নামে প্রকাশিত হয়েছে। গানটি রচিত হয় ১৮৯৬ সালে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলছেন, 'কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাটিতে কংগ্রেসের অভ্যাগতগণ আমন্ত্রিত হন ১৮৯৬ ডিসেম্বরে। অভ্যাগতগণের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যারিস্টার মিঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে তাঁহার নবরচিত গান 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গাহিয়াছিলেন। দ্র. সরলাদেবীর 'জীবনের ঝরাপাতা' পৃ. ১৬৮।'[৮১]

রবীন্দ্রনাথের এই গানে ভূদেবের 'অধিভারতী'র ধ্যানমন্ত্রের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভূদেব লিখেছেন, 'সূর্যেন্দুপ্রতিবিম্বিতাম্বরলসৎ প্রালেয়মৌলি-জ্বলা', রবীন্দ্রনাথের গানে আছে 'নির্মলসূর্য-করোজ্জ্বল ধরণী' এবং 'অম্বরচুম্বিতভালহিমাচল শুভ্রতুষারকিরীটিনী।' ভূদেব লিখেছেন, 'পদতলে নীলাম্বুলীলাঞ্চিতা', রবীন্দ্রনাথের গানে আছে 'নীলসিন্ধুজলধৌত-চরণতল।' ভূদেব লিখেছেন, 'সৌম্যা স্যাদধিভারতী ভয়হরা নিত্যান্নদা শান্তয়ে', রবীন্দ্রনাথের গানে আছে 'চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন।' ভূদেব লিখেছেন, 'স্নিগ্ধা স্নিগ্ধতরঙ্গিণী সুরধুনী পীযূষনিষ্যন্দিনী', রবীন্দ্রনাথের গানের অন্তিম চরণ হল 'জাহ্নবী-যমুনা বিগলিত করুণা পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী'। ভূদেব ও রবীন্দ্রনাথের এই আশ্চর্য ভাবসাদৃশ্যে দেখে বিস্মিত হবার কিছু নেই। আমাদের প্রাচীনেরা বলেছেন, স্বোন্মেষণশীল শক্তিতে প্রতিভাবান কবি 'সকলোপজীবী' হয়েও 'ভুবনোপজীব্য'। রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশসংগীতটি সুরসংগীতে অতুলনীয়।

৭

'বন্দে মাতরম্' রচনা সম্পর্কে পূর্ণচন্দ্রাদির উদ্ধৃতি পূর্বে উৎকলিত হয়েছে। বঙ্গদর্শনের পাদপূরণের জন্য পণ্ডিত মহাশয়ের মনে হয়েছিল এই গীতটি নেহাত মন্দ হবে না। তখন "সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কাগজখানি টেবিলের দেরাজের ভিতর রাখিয়া বলিলেন, 'উহা ভাল কি মন্দ, এখন তুমি

বুঝিতে পারিবে না, কিছুকাল পরে বুঝিবে—আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার'।"

ঋষি বঙ্কিমের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হল এই মহাসংগীত রচনার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে ব্রিটিশ শাসকের হৃৎকেন্দ্রে মর্মান্তিক আঘাত হানলো বঙ্কিমের সপ্তকোটি দেশের মানুষ। সেই উদ্দাম উত্তাল জনকল্লোলে ব্রিটিশ-সিংহ ভীত চকিত হয়ে উঠলো। অর্ধযুগ সংগ্রামের পর, ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রোধ হল। 'Bengal Partition is a settled fact'—ব্রিটিশ শাসকের এই দম্ভোক্তি সুপ্তোত্থিত বাঙালীর বজ্রনির্ঘোষে ব্যর্থ আস্ফালনে পর্যবসিত হল। Settled fact unsettled হল। বাঙালী প্রমাণ করলো সেদিনকার সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অধীশ্বরকেও উদ্বেল জনসমুদ্রের কাছে মস্তক অবনত করতে হয়। আনন্দমঠের সন্তান-সম্প্রদায়ের ভাষায় 'এ যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে? হরে মুরারে! হরে মুরারে!'

'বন্দে মাতরম্' সংগীত রচনার তিন দশক পরে বঙ্কিমচন্দ্রের এই 'স্বদেশমন্ত্র' জাতীয় জীবনে কিভাবে মহাপ্রেরণারূপে পুনরুজ্জীবিত হল তার ইতিহাস পর্যালোচনা একান্ত আবশ্যক। ১৯০৭ সালে 'বন্দে মাতরম্' পত্রে অরবিন্দ বলেছিলেন,

It was thirty-two years ago that Bankim wrote his great song and few listened; but in a sudden moment of awakening from long delusions the people of Bengal looked round for the truth and in a fated moment somebody sang Bande Mataram. The Mantra had been given and in a single day a whole people had been converted to the religion of patriotism.[৪২]

এই নিয়তিকৃত মুহূর্তটি হল মদমত্ত লর্ড কার্জনের বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের ক্রান্তিকাল।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৮৭৪ সালে বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলাকে বাংলা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা হয়। একথাও বলা হয়েছে পূর্বদিগন্তেই ভারতসত্তার প্রথম জাগরণ অনুভূত হয়েছিল। ১৮৯৪ সালে অরবিন্দ বলেছিলেন, বাংলাদেশ কাল যা চিন্তা করবে সারা ভারত তা চিন্তা করবে তার এক সপ্তাহ পরে। বাঙালীর এই অগ্রগণ্য ভূমিকাকে সমূলে

ধ্বংস করার জন্য ১৮৯৮ সালে ভারতে পদার্পণ করলেন বড়লাট লর্ড কার্জন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ১৮৯৯ সালে ভারত-সভার পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি লাটপ্রাসাদে গিয়েছিলেন। কিন্তু দেশি জুতো পায়ে দিয়ে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা সাক্ষাতের অনুমতি পান নি। কার্জন সাহেব কংগ্রেসের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। ১৯০০ সালের ১৮ নভেম্বর ভারতসচিবকে এক পত্রে লেখেন, 'আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, কংগ্রেসের পতন সন্নিকট এবং আমার একটা প্রধান আকাঙ্ক্ষা হল ভারতে অবস্থিতিকালেই একে শান্তিতে মরণের পথে এগিয়ে দেওয়া'।[৪৩]

কার্জনের আরেকটি কুকীর্তি হল ১৯০৪ সালে 'ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন' বিধিবন্ধ করা। উচ্চশিক্ষার মূলে আঘাত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ১৯০২ সালে সিমলায় য়ুরোপীয় শিক্ষাবিদদের নিয়ে তিনি গোপনে একটি সভা করেন। তার পরেই 'বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' স্থাপিত হয়। চাপে পড়ে বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে কমিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তাঁর স্বতন্ত্র মন্তব্য কমিশনের রিপোর্টে নথিভুক্ত হল বটে, কিন্তু কার্যকালে তা ধর্তব্যের মধ্যে এল না।[৪৪] কার্জন স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানের অধিকারও খর্ব করতে লাগলেন। এই সব প্রতিক্রিয়াশীল নীতির জন্য ব্রিটিশ আমলে কার্জনের কাল [১৮৯৮-১৯০৫] কুখ্যাত হয়ে থাকবে। কিন্তু কার্জনের সবচেয়ে জঘন্য কুকীর্তি হল বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের দ্বারা নবজাগ্রত বাঙালীর জাতীয়তাবোধকে বিনষ্ট করার প্রয়াস।

লর্ড কার্জন ১৯০৩ সালের শেষভাগে প্রস্তাব করেন যে, চট্টগ্রাম বিভাগ, এবং ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলা আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। তাতে বাংলা যাদের মাতৃভাষা তারা দুটি পৃথক প্রদেশের অধিবাসী হবে। বলাই বাহুল্য, বাংলার হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে, ধনী ও নির্ধন, জমিদার ও প্রজা সবাই এই অশুভ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। মাস দুয়েকের মধ্যে কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গে পাঁচ শতাধিক সভায় এই প্রস্তাবের নিন্দা করা হয়। এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক ড° রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন,

'বাঙ্গালীর এই ঐক্যবন্ধ আন্দোলনে তাহাদের জাতীয় সংহতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া লর্ড কার্জনের মনে আশংকা হইল যে, ইহা ভবিষ্যতে ইংরেজ-শাসনের একটি গুরুতর বিপদের কারণ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা। সুতরাং তিনি অংকুরেই এই বিপদের মূল উচ্ছেদ করিবার জন্য আরও ব্যাপক একটি পন্থা উদ্ভাবন করিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, সমগ্র উত্তর ও পূর্ববঙ্গ আসামের সহিত যুক্ত করিয়া একটি, এবং পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া

আর একটি—মোট দুইটি ছোটলাট-শাসিত প্রদেশ গঠিত করিবেন। ইহার ফলে জাতীয়তাবাদী এবং শিক্ষা-দীক্ষায় অধিকতর উন্নত হিন্দু বাঙ্গালীরা এই উভয় প্রদেশেই সংখ্যালঘু হইবে। ওদিকে মুসলমানরা পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় তাহাদের ক্ষমতা বাড়িবে, এই সম্ভাবনা দেখাইয়া তিনি মুসলমানদিগকে এই প্রস্তাবের পক্ষপাতী করিয়া তুলিলেন। এ বিষয়ে ঢাকার নবাবকে অল্প সুদে বহু টাকা কর্জ দিয়া এবং নূতন প্রদেশে তাঁহার গৌরব ও ক্ষমতাবৃদ্ধির লোভ দেখাইয়া তাঁহাকে প্রস্তাবিত বঙ্গ-বিভাগের প্রধান সমর্থনকারীরূপে খাড়া করিলেন। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রভেদের এই যে নীতি কার্জন প্রথম প্রবর্তিত করিলেন, ক্রমে ক্রমে তাহাই ইংরেজ রাজনীতির একটি প্রধান ও চিরন্তন অঙ্গস্বরূপ হইল…।[৪৫]

ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে লর্ড কার্জন যতগুলি অপকর্ম করে গিয়েছেন তার একটি হল 'অফিশিয়াল সিক্রেটস' আইন ব্যবস্থা-পরিষদে পাস করিয়ে নেওয়া। এই আইনের সুযোগে তিনি সরকারী নীতি ও কার্যগুলির অধিকাংশকেই গোপনীয় ছাপ দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এসব বিষয় প্রকাশ বে-আইনী ও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হল।[৪৬]

লর্ড কার্জন নিঃশব্দে তাঁর বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা পাকাপোক্ত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। ১৯০৩ ও ১৯০৪ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে এই কার্জনী চক্রান্তের প্রতিবাদ-প্রস্তাব গৃহীত হবার পর গবর্নমেণ্ট ঘোষণা করলেন যে, এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি। কিন্তু গোপনে গোপনে বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থা চলতে লাগলো। ফলে ১৯০৫ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার প্রায় তিন শো প্রতিনিধি একটি সম্মেলনে সমবেত হলেন। এই সম্মেলনের সভাপতি হলেন কংগ্রেসের বিগত অধিবেশনের সভাপতি, অবসরপ্রাপ্ত আসামের চীফ কমিশনার, ভারতপ্রেমী স্যার হেনরি কটন। তিনি তাঁর ভাষণে বললেন, যদি সত্যসত্যই শাসন-সৌকর্যের জন্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন বিবেচিত হয়ে থাকে তাহলে বিহার ও ছোটনাগপুরকে বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং সিলেট ও কাছাড়—এই দুই বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল বঙ্গদেশের সঙ্গে যুক্ত করে একটি নতুন গবর্নর-শাসিত প্রদেশ গঠন করা হোক্।

সম্মেলনে সর্বসম্মত প্রস্তাবে বলা হল যে, বঙ্গদেশ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে তা সর্বসাধারণের গোচরে আনা হোক্, যাতে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে গবর্নমেণ্ট জনসাধারণের মতামত জানার সুযোগ পান।

কিন্তু ১৯০৫ সালের মে মাসে লণ্ডনের 'স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত হল যে, বিলাতের কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিলাতে টেলিগ্রাম করা হল যে, এ বিষয়ে একটি স্মারকলিপিতে বাঙালীদের যে মতামত ব্যক্ত হয়েছে তা বিবেচনা না করে যেন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হয়। ষাট হাজার লোকের স্বাক্ষরিত এই স্মারকপত্রের উপরও কোনো গুরুত্ব দেওয়া হল না। জুলাই মাসের ৪ তারিখে এক প্রশ্নের উত্তরে ভারতবিষয়ক মন্ত্রী বললেন, ১৮ ফেব্রুয়ারি তিনি এ বিষয়ে ভারত সরকারের প্রস্তাব পেয়েছেন, এবং তা অনুমোদন করে ভারত সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিন দিন পর, ১৯০৫ সালের ৭ই জুলাই সিমলা থেকে ভারত সরকার তা ঘোষণা করলেন এবং ১৯ জুলাই গবর্নমেণ্ট এই প্রস্তাবকে একটি সরকারী সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করলেন। পরদিন তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল। এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে স্থির হল যে, আসাম ও বাংলাদেশের অন্তর্গত ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগ নিয়ে ছোটলাট-শাসিত একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হবে। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্সী বিভাগ এবং বিহার ও উড়িষ্যা আরেকটি প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৪৭]

এই স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে অভূতপূর্ব আন্দোলন শুরু হল তারই নাম 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন'। এই প্রতিরোধ-আন্দোলনের প্রধান নেতৃপুরুষ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সম্পাদিত 'বেঙ্গলি' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি দৃপ্ত ভাষায় ঘোষণা করলেন, এই বঙ্গভঙ্গ আমরা কিছুতেই মেনে নেব না। যতদিন তা রহিত না হয় ততদিন আইনসঙ্গত উপায়ে আমরা যে আন্দোলন চালাব ব্যাপকতা ও তীব্রতায় তার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কোনো আন্দোলন এর পূর্বে আর কখনো হয় নি। সুরেন্দ্রনাথই ঘোষণা করেছিলেন, যদিও সরকার মনে করেন বঙ্গভঙ্গ একটি 'অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত' (Settled Fact), কিন্তু আমরা তার পরিবর্তন ঘটাবই।

বস্তুত, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাংলার যুব ও ছাত্রসমাজ, বাংলার নেতৃবৃন্দ, বাংলার সংবাদপত্র এবং সভাসমিতিগুলি ঐক্যবদ্ধ সঙ্ঘশক্তিতে সেদিন যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন তা শুধু বাঙালীর জীবনে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

বাংলার সর্বত্র—শহরে ও মফঃস্বলে, পূর্বে ও পশ্চিমে, বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে, কবিতায় ও গানে যে বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছিল তাকে

কেউ কেউ বিপ্লব আখ্যা দিয়েছেন। ড° রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবরের মধ্যে অন্তত তিন হাজার প্রকাশ্য সভায় বাংলার জনগণ কার্জনী চক্রান্তের প্রতিবাদ জানায়। হিন্দু মুসলমান উভয়েই এইসব সভায় যোগদান করেন এবং সংখ্যার দিক দিয়ে সভাগুলিতে পাঁচশো থেকে পঞ্চাশ হাজারের মতো শ্রোতা উপস্থিত হতেন।[৪৮]

লর্ড কার্জনের দুরভিসন্ধি ছিল বঙ্গভঙ্গ দ্বারা বাঙালীর সংহতিবন্ধ শক্তি ও জাগরণের মূলে কুঠারাঘাত করা। ১৯০৪ সালের ১৭ জানুয়ারি তিনি ভারতসচিবকে এক পত্রে লেখেন, 'বাঙালীরা মনে করে তারা একটি জাতি এবং স্বপ্ন দেখে যে ইংরেজদের তাড়িয়ে একজন বাঙালী বাবুই বড়লাট হয়ে কলিকাতার রাজভবনে বসবাস করবেন। বঙ্গভঙ্গ হলে তাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য নষ্ট হবে এবং এই স্বপ্ন ভেঙে যাবে—এই জন্যই এর বিরুদ্ধে এত প্রবল আন্দোলন চলছে। আজ যদি আমরা তাদের চিৎকারে বঙ্গভঙ্গ রহিত করি, তবে আর কোনোদিন বাঙালীর শক্তি খর্ব করা যাবে না।'[৪৯]

এই পত্রে কার্জনের দুরভিসন্ধি স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। এই দুরভিসন্ধির দুটি দিক আছে। একটি, বাঙলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা ; পূর্ববঙ্গকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে তিনি মুসলমানদের দলে টানার চেষ্টা করলেন এই বলে যে, সেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হবে। দ্বিতীয়টি হল পশ্চিমবঙ্গকে বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে যুক্ত করে সেই প্রদেশে বাঙালীকে সংখ্যালঘু করে তোলা।

বাংলার নেতৃবৃন্দের কাছে কার্জনের এই অসদভিপ্রায় দিনের আলোর মতোই স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল বলে সারা বাংলাদেশে বিদ্রোহ প্রজ্বলিত হয়েছিল।

এই বিদ্রোহের প্রধান নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ অগ্নিবর্ষী নেতৃবৃন্দ। বঙ্গভঙ্গের প্রবন্ধকারগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ চিন্তানায়কগণ, সংগীতে সারা দেশকে মাতিয়ে তুলেছিলেন রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রমুখ গীতিকারগণ।[৫০]

কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন, 'ঢাকার আনন্দচন্দ্র রায়, ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদার, মৈমনসিংহের অনাথবন্ধু গুহ, বরিশালের

অশ্বিনীকুমার দত্ত, চট্টগ্রামের যাত্রামোহন সেন, কুমিল্লার উপেন্দ্রমোহন মিত্র, নোয়াখালির যশোদা ঘোষ, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, রাজসাহীর কিশোরীমোহন চৌধুরী, রংপুরের উমেশচন্দ্র দত্ত, দিনাজপুরের যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেন, কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কৃষ্ণনগরের প্রসন্নকুমার রায়, যশোহরের রায়বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার, খুলনার রায়বাহাদুর অমৃতলাল রাহা, আলিপুরের বিজয়চন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের উপেন্দ্রনাথ মাইতি, এবং বগুড়া, মালদহ, বাঁকুড়া ও বীরভূমের নেতৃবৃন্দ বাঙালীকে স্বদেশপ্রেমিক করিয়া তুলিবার জন্য আত্মসমর্পণ করিলেন, তাছাড়া ভারতসভা, বেঙ্গলী কার্যালয় ও মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর সার্কুলার রোডের বাড়ি আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনের নায়ক ছিলেন। [আত্মচরিত, প্রথম সং, পৃ ২৩৭-২৩৮]

এই নামাবলীর মধ্যে আমরা ইচ্ছা করেই রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করিনি। কারণ, একা রবীন্দ্রনাথ সেদিন গানে-প্রবন্ধে-ভাষণে সারা দেশ জুড়ে যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিলেন তার তুলনা নেই।

প্রথমে তাঁর প্রবন্ধমালার কথাই বলা যাক্। ১৩১১ ও ১২ সালের মধ্যে তিনি যে-সব প্রবন্ধ ও ভাষণ রচনা করেন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল :

জ্যৈষ্ঠ ১৩১১	বঙ্গবিভাগ
আষাঢ় ,,	য়ুনিভার্সিটি বিল
শ্রাবণ ,,	দেশের কথা
ভাদ্র ,,	স্বদেশী সমাজ
আশ্বিন ,,	স্বদেশী সমাজের পরিশিষ্ট
চৈত্র ,,	সফলতার সদুপায়
বৈশাখ ১৩১২	ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ
শ্রাবণ ,,	দেশীয় রাজ্য
ভদ্র ,,	ব্রতধারণ
আশ্বিন ,,	অবস্থা ও ব্যবস্থা
কার্তিক ,,	বিজয়া সম্মিলন

এই কালসীমার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন নবপর্যায়ের সম্পাদক ছিলেন। [১৩০৮-১৩১২]। ১৩১২ সালে 'ভাণ্ডার' পত্রিকার সম্পাদন-ভারও তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। উপরে লিখিত প্রবন্ধগুলি ছাড়া এই দুই বৎসরে দেশ ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর 'পথ ও পাথেয়', 'রাজভক্তি', 'ইম্পীরিয়লিজম', 'বহু-

রাজকতা' প্রভৃতি প্রবন্ধও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। কিন্তু শুধু প্রতিবাদ ও প্রতিরোধই নয়, এই যুগে রবীন্দ্রনাথ সমাজ সংগঠনের পথেও জাতিকে নতুনভাবে প্রবুদ্ধ হতে আহ্বান করেন তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে সমাজভিত্তিক যে জাতিগঠনের পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে তা অচিন্তিতপূর্ব। এই জন্য নিন্দা ও বন্দনা উভয়ই তিনি প্রভূতভাবে পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ স্বভাবধর্মে কবি। কোনোদিনই প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান করা তাঁর স্বধর্ম ছিল না। আন্দোলনের প্রমত্ততার দিনে তাঁর কবিমানস ও কর্মিমানসের অন্তর্গূঢ় দ্বন্দ্বের আভাসও নানা সূত্রে পাওয়া গেছে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে তাঁর দান কারো অপেক্ষা নগণ্য নয়। ১৩১১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শনে তিনিই প্রথম দৃপ্তকণ্ঠে কার্জনী চক্রান্তের বিরুদ্ধে লেখেন 'বঙ্গবিভাগ' প্রবন্ধ। তাতে তাঁর বক্তব্য ছিল :

'বর্তমান আন্দোলনে আমরা এই কথা বলিয়া আরম্ভ করিয়াছি যে, য়ুনিভার্সিটি বিলের দ্বারা তোমরা এ-দেশের উচ্চশিক্ষা, স্বাধীন শিক্ষার মূলোচ্ছেদ করিতে চাও এবং বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তোমরা বাঙালি জাতিকে দুর্বল করিতে ইচ্ছা কর।'...

'বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে একথা আমরা কোনো মতেই স্বীকার করিব না। বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে। পূর্বে জড়ভাবে আমরা একত্র ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব। বাহিরের শক্তি যদি প্রতিকূল হয়, তবেই প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রতিকার-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। সেই চেষ্টাই আমাদের যথার্থ লাভ। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখনই আন্তরিক ঐক্য উদ্বেল হইয়া উঠিবে—তখনই আমরা যথার্থভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্বপশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন, এই পূর্বপশ্চিম হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায় একই সনাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে।'...

'আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। আমাদের নিদ্রার সহায়তা করিয়ো না, আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না—তোমাদের রুদ্রমূর্তিই আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার

একই মাত্র উপায় আছে,—আঘাত, অপমান ও একান্ত অভাব। সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষ নহে।'[৫১]

এই প্রবন্ধমালায় রবীন্দ্রনাথের বহ্নিবাণী সম্প্রবুদ্ধ বাঙালী জাতিকে অনুক্ষণ অনুপ্রাণিত করেছে। এ সম্পর্কে পরে আরো আলোচনার আছে। কিন্তু সেদিন বাংলার তরুণসমাজ কিভাবে কবির প্রেরণায় প্রাণিত ও প্রবুদ্ধ হয়েছিল তার কথা নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় :

It was only the consummate leadership of Tagore which enabled the young men to keep their eyes fixed on their goal and ideal. Tagore used to meet them, almost every evening, in the rooms of the then Metropolitan Institution, and gave expression to the newborn spirit of freedom inspiring the youth of Bengal by the composition of what are called his national songs, which rank very high in both the poetry and and music of Tagore. Every evening would he come to the meeting with songs composed for the occasion and either sing them himself or have them sung for purposes of instruction by one of his prominent disciples, the late Ajit Kumar Chakravarti. Very shortly he came out into the open to deliver a series of powerful polemics and threw himself heart and soul into political pamphleteering just as Milton did under similar circumstances, leaving aside his lyre.[৫২]

৮

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান তাঁর স্বদেশী-সংগীতমালা। তার কিছু বেরিয়েছিল ১৩১২ সালের ভাদ্র-আশ্বিনের 'ভাণ্ডারে', কিছু 'বঙ্গদর্শনে'র আশ্বিনে। দু-একটি অন্যত্র। সাময়িকপত্রে বেরোয়নি এমন গানও আছে।[৫৩] এর মধ্যে কুড়িটি গান 'বাউল' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল।[৫৪] প্রভাতকুমার বলেছেন, 'বাঙালির কাছে সেদিন দেশ সত্যই মাতৃরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং রবীন্দ্রনাথ…সেই মহাযজ্ঞে শক্তি-মন্ত্রোচ্চারণদ্বারা দেশমাতৃকার বন্দনা করিয়াছিলেন'।[৫৫] প্রভাতকুমার আরও

বলেছেন, এই গানগুলির 'কয়েকটি হইতেছে বঙ্গমাতার সৌন্দর্য বর্ণনা', 'কয়েকটি দেশবন্দনা', 'কিন্তু অধিকাংশই হইতেছে তেজোদৃপ্ত সংগীত, যাতে জীবনের নানা সংগ্রামে ব্যবহৃত হইতে পারে'।[৫৬]

গীতবিতানের 'স্বদেশ' পর্যায়ে ছেচল্লিশটি গান কলিত হয়েছে।[৫৭] তার অর্ধেকেরও বেশি গান ১৩১২ সালের ভাদ্র-আশ্বিনে লেখা। তখন রবীন্দ্রনাথের শরীর খুব সুস্থ ছিল না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দিনগুলিতে তিনি শান্তিনিকেতন গিরিডি ও কলিকাতায় যাতায়াত করেছেন। শান্তিনিকেতন ছিল তাঁর শিক্ষাসত্রের কেন্দ্রপীঠ, গিরিডি স্বাস্থ্যনিবাস এবং কলিকাতা আন্দোলনের যজ্ঞস্থলী। প্রভাতকুমার তাঁর 'গীতবিতান / কালানুক্রমিক সূচী'র প্রথম খণ্ডে [সং পঁচিশে বৈশাখ ১৩৭৬] লিখেছেন, 'গিরিডি বাসকালে ১৩১২ সালের ২৬শে ভাদ্র হইতে ১৩১২ সালের ২২শে আশ্বিনের মধ্যে 'বাউল' গীতগ্রন্থের গানগুলি রচিত। গ্রন্থখানির প্রকাশকাল ১৩১২, আশ্বিন ১৪'।[৫৮] প্রভাতকুমারের এই উক্তিতে ঈষৎ ত্রুটি রয়ে গেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, এসময়ের মধ্যে রচিত সব গানই 'বাউল' গ্রন্থে সংকলিত হয় নি। মাত্র কুড়িটি নির্বাচিত গান নিয়ে 'বাউল' প্রকাশিত হয়েছিল।

অর্থাৎ মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সাতাশটি স্বদেশসংগীত রচনা করেছেন। এই গীতিসপ্তবিংশতি স্বদেশী যুগে বাংলাদেশজোড়া জাতীয় সংগ্রামে কবির সর্বশ্রেষ্ঠ দান। আমরা প্রভাতকুমারের 'কালানুক্রমিক সূচী'র অনুসরণে এই স্বদেশ-গীতাঞ্জলির তালিকা নিম্নে প্রদান করলাম :

১. 'বান'—'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে'। ২. 'একা'—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে'। ৩. 'মাতৃমূর্তি',—'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি'। ৪. 'মাতৃগৃহ'—'মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে।' ৫. 'প্রয়াস'—'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে'। ৬. 'বিলাপী' —'ছি ছি, চোখের জলে ভেজাসনে আর মাটি'। ৭. 'বাউল' (১)—'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা!' ৮. 'বাউল' (২)—'যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস নে কিছু'। ৯. 'বাউল' (৩) 'ওরে তোরা নেই বা কথা বললি'। ১০. 'বাউল' (৪)—'যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না'। ১১. 'বাউল' (৫) 'আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে'। ১২. 'বাউল' (৬)—'ও জোনাকি, কি সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ'। ১৩. 'রাখী-সংগীত'—'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল'। ১৪. রাখী-সংগীত'—'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান'। ১৫. 'আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো

কর্ণধার' [গানটি সঞ্জীবনী পত্রিকায় কবির স্বাক্ষরে ১৯০৫ সালের ১২ অক্টোবর প্রকাশিত।] ১৬. 'রাখী-সংগীত'—'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে'। ১৭. 'আজ সবাই জুটে আসুক ছুটে যে যেখানে থাকে'। ১৮. 'ওরে ভাই, মিথ্যা ভেবো না'। ১৯. 'সার্থক জনম'—'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'। ২০. 'পথের গান'—'আমরা পথে পথে যাব সারে সারে'। ২১. 'আমার সোনার বাংলা'—'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'। [গানটি ১৩১২ সালের ২২শে ভাদ্র প্রথম 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রকাশিত।][৫৯] ২২. 'দেশের মাটি'—'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা'। ২৩. 'ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিসনে'। ২৪. 'গভীর রাতে ভক্তিভরে কে জাগে আজ'। ২৫. 'হবেই হবে'—'নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন, হবেই হবে'। ২৬. 'দ্বিধা'—'বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি'। ২৭. 'অভয়'—'আমি ভয় করব না ভয় করব না'।[৬০]

এই গীতিসপ্তবিংশতির মধ্যে দ্বাদশ এবং দ্বাবিংশতি সংগীত-দুটি গীতবিতানের 'স্বদেশ' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। প্রথম গানটি গেছে 'বিচিত্র' পর্যায়ে, অখণ্ড গীতবিতানের ৫৮২ পৃষ্ঠায়, সংখ্যা ৮৭। দ্বিতীয় গানটি গেছে 'পূজা ও প্রার্থনা'য়, অখণ্ড গীতবিতানের ৮৫৩ পৃষ্ঠায়, সংখ্যা ৭১। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ গান-দুটিও গেছে 'জাতীয় সংগীত' পর্যায়ে।[৬১]

অথচ 'বিচিত্রা' এবং 'পূজা ও প্রার্থনা'র দুটি গানই ১৩১২ সালে রচিত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসংগীত। প্রথম গানটি 'জোনাকি' সম্বোধনে কবির স্বগতোক্তি। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের তুলনায় কবি নিজেকে সূর্য-চন্দ্রের মধ্যে জোনাকিবৎ কল্পনা করে বলছেন :

তুমি নও তো সূর্য, নও তো চন্দ্র,
তোমার তাই বলে কি কম আনন্দ।
তুমি আপন জীবন পূর্ণ করে
আপন আলো জেবলেছ।

এই 'আপন জীবন পূর্ণ করে / আপন আলো জেবলেছ' বাক্যটি 'মানসী'র যুগে লেখা 'গুরু গোবিন্দ' কবিতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়—

চারিদিক হতে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে।

দ্বিতীয় কবিতাটিতে কোজাগরী পূর্ণিমার রূপকল্প আশ্রয় করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' সংগীতে স্বদেশলক্ষ্মীর লক্ষ্মীপ্রতিমার ধ্যান করে বলেছেন, 'নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্'। ১৩১২ সালে লেখা স্বদেশ-সংগীতগুলি রচনার পূর্বে [১৮৯৬ সালে] কবি 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গান রচনা করেছেন। 'কল্পনা' গ্রন্থে প্রকাশের সময় গানটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ভারতলক্ষ্মী'। 'গভীর রাতে ভক্তিভরে কে জাগে আজ, কে জাগে' গানটিতে 'সপ্ত ভুবন আলো করে' যে লক্ষ্মীর আবির্ভাব, কবিকল্পনায় তিনিই বঙ্গলক্ষ্মী। তাই কবি বলছেন,

ষোলো কলায় পূর্ণ শশী, নিশার আঁধার গেছে খসি'—
একলা ঘরের দুয়ার 'পরে কে জাগে আজ, কে জাগে।

* * *

আজ যদি রোস্ ঘুমে মগন চলে যাবে শুভলগন,
লক্ষ্মী এসে যাবেন স'রে—কে জাগে আজ, কে জাগে।

বলাই বাহুল্য, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আরো কয়েকটি গানের মতো এটিও জাগরণ-সংগীত। সুতরাং ১৩১২ সালে লেখা 'ও জোনাকি, কী সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ' এবং 'গভীর রাতে ভক্তিভরে কে জাগে'—এই দুটি গানও স্বদেশসংগীতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া একান্ত সমীচীন।

এই প্রসঙ্গে পুনশ্চ বলা প্রয়োজন যে, 'অখণ্ড গীতবিতানে' রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমাত্মক গানগুলি দু-পর্যায়ে বিভক্ত। 'প্রথম পর্যায়ে ২৪৩ থেকে ২৬৭ পৃষ্ঠায় 'স্বদেশ' পর্যায়ে আছে ৪৬টি গান। আবার ৮১৩ থেকে ৮২৩ পৃষ্ঠায় 'জাতীয় সংগীত' পর্যায়ে আছে আরো ১০টি গান। 'স্বরবিতানে'র ৪৬ ও ৪৭ খণ্ডে আছে যথাক্রমে ২৪টি ও ২৬টি গান। অখণ্ড গীতবিতানের স্বরলিপিপঞ্জীতে বলা হয়েছে 'স্বরবিতান ৪৬-অঙ্কিত খণ্ডে বঙ্গভঙ্গজনিত জাতীয় আন্দোলন-কালে রচিত ২৪টি রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি ছাড়া 'বন্দে মাতরম্' গানের রবীন্দ্র-সুর সংকলন করা হইয়াছে। স্বরবিতান ৪৭-অঙ্কিত খণ্ডে রাষ্ট্রীয় সংগীত ও রবীন্দ্রনাথের দেশভক্তি-সূচক অন্যান্য (মোট ২৬টি) গানের স্বরলিপি আছে'।[৩২] এখানে উল্লেখ্য যে, 'এখন আর দেরি নয়, ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর্ গো'—এই গানটি প্রভাতকুমারের কালানু-ক্রমিক সূচীতে ১৩১২ সালের গানের তালিকায় নেই, কিন্তু অখণ্ড গীতবিতানের 'স্বদেশ' পর্যায়ে ওটি ৩৭-সংখ্যক গান। স্বরবিতানের ৪৬ খণ্ডে ওটি 'বঙ্গভঙ্গ-জনিত জাতীয় আন্দোলন-কালে রচিত' বলেই ধৃত

হয়েছে। ভুল প্রভাতকুমারেরই হয়েছে, কারণ 'এখন আর দেরি নয়' গানটি ১৩১২ সালের ফাল্গুনের 'ভাণ্ডারে' প্রকাশিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসংগীতের ইতিহাসে তাঁর ১৬ থেকে ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে লেখা গানগুলিরও উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমরা প্রভাতকুমারের 'কালানুক্রমিক সূচী'তে কিশোর রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি 'জাতীয় সংগীতে'র উল্লেখ পাচ্ছি। ১. 'তোমারি তরে, মা, সঁপিনু এ দেহ' [কবির বয়স তখন ষোলো]। ২. 'অয়ি বিষাদিনী বীণা' [বয়স ১৭]। ৩. 'ভারত রে, তোর কলংকিত পরমাণুরাশি [বয়স ১৭]। ৪. 'ঢাকো রে মুখ-চন্দ্রমা, জলদে' [বয়স ১৭]। এবং ৫. 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' [বয়স ১৮]।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' রচনার কাল যদি ১৮৭৪ বা ১৮৭৫ সাল ধরা হয় তাহলে রবীন্দ্রনাথের 'তোমারি তরে, মা, সঁপিনু এ দেহ / তোমারি তরে, মা, সঁপিনু প্রাণ' গানটি তার প্রায় দু বৎসর পরে, ১৮৭৭ সালে লেখা। 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' প্রথমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে [১৮৭৯] ওই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৩১২ সালের 'সংগীত-প্রকাশিকা'য় ওই গানের যে স্বরলিপি প্রস্তুত করা হয় তাতে গানের ধ্রুবপদ হিসাবে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র যুক্ত হয়ে তার যে রূপ দাঁড়ায় তা নিম্নে প্রকাশিত হল :

> এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
> এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন—
> বন্দে মাতরম্।
> আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
> আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়—
> বন্দে মাতরম্।
> আমরা ডরাইব না ঝটিকা-ঝঞ্ঝায়,
> অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।
> টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,
> তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন—
> বন্দে মাতরম্।[৬৩]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাণমন্ত্র 'বন্দে মাতরম্' ধ্রুবপদরূপে যুক্ত হওয়ায় গানটি যেন নবজন্ম লাভ করেছে।

৯

১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসংগীত বাঙালীর জীবনে যে অভূতপূর্ব প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল তার ইঙ্গিত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। এবার এই গীতিসপ্তবিংশতির দু-একটি গানের বিশেষ উল্লেখ করা কর্তব্য।

ভারত সরকার যখন বাঙালীর সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে বঙ্গচ্ছেদের সংকল্পে অবিচল রইলেন তখন বাঙালীও সর্বভাবে, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে, তা প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত হল। পূর্বেই বলা হয়েছে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমস্ত কর্মপন্থার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সবসময় একমত হতে পারেন নি। কিন্তু বাঙালীর চরম শক্তিপরীক্ষা ও অপূর্ব জাগরণের দিনে কবি দূরেও সরে থাকতে পারেন নি। তাঁর সেদিনকার মানসিক অবস্থা রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন। দেশের এই আহবানে কবিকণ্ঠে সংগীত অজস্র ধারায় উৎসারিত হতে লাগল। সে সংগীতের বৈশিষ্ট্য বাংলা ও বাঙালীর প্রাণমাতানো দেশী সুর। কীর্তন, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালি ও সারিগানের সুরে গান বেঁধে কবি বাঙালীকে মাতিয়ে তুললেন। এই পর্যায়ের প্রথম গান হল 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 'জয় মা' বলে ভাসা তরী'। তৃতীয় গানে কবিদৃষ্টিতে স্বদেশের মাতৃরূপ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মায়ের সেই অপরূপ রূপ দেখে কবিভক্ত বলছেন :

> ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
> দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরন।
> ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে!
> তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জে মেঘে লুকায় অশনি,
> তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী!

যাঁর ডান হাতে খড়্গ, যাঁর বাঁ হাতে বরাভয়, যাঁর ললাটনেত্র অগ্নিবর্ণ, যাঁর মুক্ত কেশের পুঞ্জ-মেঘে অশনি লুকিয়ে আছে,—মায়ের সেই রৌদ্রবসনী দেবীমূর্তি কি বঙ্কিম-কমলাকান্তের মাতৃমূর্তি থেকে স্বরূপত স্বতন্ত্র? যাঁর চরণের দীপ্তিরাশি আলোর রূপে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে, কবিদৃষ্টি কি তাঁকে অলৌকিক দিব্যরূপে ধ্যান করে নি?

বলা বাহুল্য, এই মা-ই হয়েছেন কবির 'সোনার বাংলা'। এই যুগের অন্যতম স্মরণীয় গান হল 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৫ সালের ৭ অগস্ট কলকাতার টাউন হলে যে বিশাল জনসভার আয়োজন হয় সেই সভা উপলক্ষে বাউল সুরে গাওয়া কবির এই গানটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। আর, একথা স্বীকার করতেই হবে,

কমলাকান্তের 'সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমাই কবি-বাউলের ভাষায় হয়েছেন 'সোনার বাংলা'। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে 'বাংলাদেশ' রবীন্দ্রনাথের এই গানের প্রথম দশ পংক্তি তাঁদের জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

সেদিন রবীন্দ্রনাথ এই বাংলার মাটিতেই তাঁর প্রাণের প্রণাম নিবেদন করে বলেছিলেন :

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ওই শ্যামলবরন কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা।

রবীন্দ্রনাথের এই মাতৃপ্রণাম বন্দেমাতরম্-এর 'তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম / তুমি হৃদি তুমি মর্ম / ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে'—এই স্তবকাংশকে কি স্মরণ করিয়ে দেয় না? এই গানেই রবীন্দ্রনাথ জননী জন্মভূমির মধ্যে 'বিশ্বময়ী' 'বিশ্বমাতা'কে মানস-প্রত্যক্ষ করে বলেছেন, 'তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা'। এই চরণের 'মাতার মাতা' কথাটির বাগ্‌ভঙ্গি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের 'দেবদৃষ্টি' কবিতার 'মা নাই ইহার চেয়ে' উক্তিটি অনিবার্যভাবেই মনে পড়ে। এই সোনার বাংলায় জন্ম-গ্রহণ করে কবি নিজেকে ধন্য মনে করেছেন :

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে॥

১০

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি অবিস্মরণীয় সংগীত হল 'বাংলার মাটি বাংলার জল'। ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট কলিকাতার টাউন হলের যে মহতী সভার কথা বলা হয়েছে তা মহানগরীকে কেন্দ্র করে সারা বাংলাদেশে উত্তাল সমুদ্রতরঙ্গের মতো ভেঙে পড়েছিল। 'বাংলা দেশের ইতিহাস'-এ ড° মজুমদার বলেছেন, ৭ই আগস্ট কলকাতায় যে শোভাযাত্রা হয়েছিল 'এরূপ বিশাল ও শ্রেণীবদ্ধ শোভাযাত্রা কলিকাতায় পূর্বে কেহ কখনও দেখে নাই।'[৬৪] কিন্তু শুধু সভা-সমিতিতে প্রতিবাদ-প্রস্তাব গ্রহণ এবং সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ গঠন করলেই যে ফলোদয় হবে না, সে কথা সেদিনকার নেতৃবৃন্দ বুঝেছিলেন।

তাই 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র বিলাতী পণ্য বর্জনের প্রস্তাব করলেন। কৃষ্ণকুমার 'আত্মচরিতে' লিখেছেন, "সঞ্জীবনী ইংলণ্ড হইতে যে সকল দ্রব্য ভারতে আমদানী হয় এবং তন্মধ্যে যাহা ভারতবর্ষে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার বিবরণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। 'সঞ্জীবনী' ইহা প্রদর্শন করিলেন (যে) যে-সকল দ্রব্য ভারতে উৎপন্ন হয় তাহা ব্যবহার করিলে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কত ক্ষতি হইবে। ইংরেজ বণিকদের যদি ব্যবসা বন্ধ করা যায় তবে ইংরেজ জাতি বাঙ্গালার অঙ্গচ্ছেদ নিবারণের জন্য সচেষ্ট হইবে। 'সঞ্জীবনী' জনসাধারণকে দৃঢ়সংকল্প করাইবার জন্য এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী তাঁতী ও জোলার মোটা কাপড় পরিবে এবং বেশী মূল্য হইলেও বোম্বাই, আমেদাবাদ ও নাগপুরের কলের কাপড় পরিবে। বিলাতী লবণ পরিত্যাগ করিয়া দেশী কালো করকচ লবণ ব্যবহার করিবে। ...'সঞ্জীবনী' বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। বিলাতী বর্জন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ইংরেজ জাতির চৈতন্য হইবে এবং লর্ড কার্জনের দম্ভ চূর্ণ হইবে বাঙ্গালী ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল।'[৬৫]

১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট টাউনহলে অনুষ্ঠিত বঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদসভায় বিলাতী বর্জন বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। কৃষ্ণকুমার লিখছেন, 'টাউনহলের সভার পর বিলাতী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন দ্রুতবেগে দেশময় বিস্তৃত হইয়াছিল। বিলাতী কাপড়, চিনি, লবণ, জুতা, দিয়াশলাই ও স্টীল ট্রাঙ্ক, সিগারেট, সাবান প্রভৃতি দ্রব্য বাঙ্গালীর গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইল।'[৬৬]

বিশেষ করে তরুণ-সমাজের মধ্যে এই 'বয়কট' আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করল। স্কুল-কলেজের স্বেচ্ছাব্রতী ছাত্ররাই হল বিলাতী-বর্জন আন্দোলনের পুরোগামী সৈনিক। বিলাতী-বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে এল স্বদেশী-গ্রহণ ব্রত।

কিন্তু বাংলাদেশের এসব প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে ব্রিটিশ সরকার ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর [৩০শে আশ্বিন, ১৩১২ সাল] বঙ্গব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা আইন অনুসারে কার্যে পরিণত করলেন। এই সরকারী অবিমৃষ্যকারিতার প্রতিবাদে ত্রিশে আশ্বিন কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ যে সক্রিয় সংগ্রাম শুরু করলেন তা ভারতের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করলেন 'রাখীবন্ধনে'র; তা হবে দ্বিখণ্ডিত বঙ্গের মিলনের প্রতীক। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করলেন 'অখণ্ড বঙ্গভবন' নির্মাণের। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রস্তাব করলেন 'অরন্ধন' পালনের। বাঙালীর জীবনে এই রাহুগ্রস্ত দিনটিতে বাঙালীর কোনো গৃহে

উনুনে আগুন জ্বলবে না। শিশু ও রোগী ছাড়া সারা দেশে অনশন পালিত হবে। বাংলার নারীসমাজকে এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান করে তিনি লিখলেন 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'।

'বন্দে মাতরম্' দিয়ে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'র শুরু, 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করেই তার শেষ। এই অভিনব ব্রতকথায় রামেন্দ্রসুন্দর লিখলেন :

'বাঙলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ-কাশী পার হ'য়ে মা পূর্ববাহিনী হ'য়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে মা সেখানে শতমুখী হলেন। শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলাদেশ জুড়ে বসলেন।

* * *

'লক্ষ্মী চঞ্চলা। চঞ্চল হয়ে বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা ছেড়ে চল্‌লেন। আঁধার রাতে কালপেঁচা ডেকে উঠ্‌ল। তখন সাত কোটি বাঙালী কেঁদে উঠ্‌ল। রাজার দোষে লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে চল্‌লেন ব'লে রাজার দোষ দিয়ে সকলে কেঁদে উঠল। ইংরেজ রাজা সেই কাঁদন শুনে বিরক্ত হ'লেন। ইংরেজ রাজার তখন একটা ছোকরা নায়েব ছিল; সে আপন দেশে ছিল কেরানী, হয়ে এসেছিল নায়েব। নায়েবী পেয়ে সে ধরাকে সরা জ্ঞান কর্‌ত। আলমগির বাদশার তক্তে ব'সে সে আপনাকে আলমগিরের নাতি ঠাওরা'ত। সে বল্‌লে, এরা বড় ঘ্যান্‌ঘ্যান্ কর্‌ছে; থাক্, এদের দু'দল ক'রে দিচ্ছি; এক দিকে থাক্ মোছলমান, এক দিকে থাক্ হিঁদু। এরা ভাই-ভাই একঠাঁই থেকে বড় বিরক্ত করছে; এদের ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই ক'রে দাও, এদের জোট ভেঙে দাও। এই ব'লে তিনি বাঙালীকে দু'দল ক'রে দিলেন,—একদিকে গেল হিঁদু, একদিকে গেল মোছলমান। পুবে-উত্তরে গেল মোছলমান, পশ্চিম-দক্ষিণে থাক্‌ল হিঁদু।

'লক্ষ্মী দেখলেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী; আর আমার নিতান্তই বাঙলায় থাকা চলল্ না। আমার হিঁদু যেমন মোছলমান তেম্‌নি। হিঁদু-মোছলমান যখন ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হ'ল, তখন আর আমার বাঙলায় থাকা চল্‌ল না।

'১৩১২ সাল, আশ্বিন মাসের তিরিশে, সোমবার কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, সে দিন বড় দুর্দিন. সেই দিন রাজার হুকুমে বাঙলা দু-ভাগ হবে; দু-ভাগ দেখে বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা ছেড়ে যাবেন। পাঁচ কোটি বাঙালী আছাড়

খেয়ে ভূমে গড়াগড়ি দিয়ে ডাক্‌তে লাগল—মা, তুমি বাঙলার লক্ষ্মী, তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়ো না, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর ; বিদেশী রাজা আমাদের সুখ দুখ বোঝেন না ; তাই ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই করতে চাইলে ; আমরা ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হব না ; মা, তুমি কৃপা কর ; আমরা এখন থেকে মানুষের মত হব ; আর পুতুলখেলা কর্‌ব না, কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ কিনব না ; পরের দুয়ারে ভিক্ষা করব না ; মা, তুমি আমাদের ঘরে থাক। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙালীকে দয়া কর্‌লেন। কালীঘাটের মা-কালীতে তিনি আবির্ভাব করলেন। মা-কালী নববেশে মন্দিরে দেখা দিলেন। সে দিন আশ্বিনের অমাবস্যা, ঘোর দুর্যোগ। ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি, হুহু করে হাওয়া। পঞ্চাশ হাজার বাঙালী মা-কালীর কাছে ধন্না দিয়ে পড়্‌ল। বল্‌লে, মা, আমাদের রক্ষা কর। বাঙলার লক্ষ্মী যেন বাঙলা ছেড়ে না যান। আমরা আর অবোধের মত ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেল্‌বে না। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। ঘরের জিনিষ থাক্‌তে পরের জিনিষ নেবো না। মায়ের মন্দির হ'তে মা ব'লে উঠলেন—জয় হউক, জয় হউক ; ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাক্‌বেন ; বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাক্‌বেন ; তোমরা প্রতিজ্ঞা ভুলো না ; ঘরের থাকতে পরের নিয়ো না ; পরের দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ো না ; ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ো না ; তোমাদের "এক দেশ এক ভগবান্, এক জাতি এক মনপ্রাণ" হোক্ ; লক্ষ্মী তোমাদের অচলা হবেন।

'তিরিশে আশ্বিন, কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া। পূর্ণিমার পুজো নিয়ে বাঙলার লক্ষ্মী ঐ দিন বাঙলা ছাড়্‌ছিলেন। ঐ দিন বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় অচলা হ'লেন! বাঙলার হাট-মাঠ-ঘাট জুড়ে বস্‌লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগ্‌লেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠ্‌ল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগ্‌লে। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গালভরা হাসি হ'ল।

'বাঙলার মেয়েরা ঐ দিন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত নিলে। ঘরে ঘরে সে দিন উনুন জ্বল্‌লে না। হিঁদু মোছলমান ভাই ভাই কোলাকুলি করলে। হাতে হাতে হল্‌দে সুতোর রাখী বাঁধ্‌লে। ঘট পেতে বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুন্‌লে। যে এই বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শোনে, তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হন।

'বচ্ছর-বচ্ছর ঐ দিনে বাঙালীর মেয়েরা এই ব্রত নেবে। বাঙালীর ঘরে ঐ দিন উনুন জ্বল্‌বে না। হাতে হাতে হল্‌দে সুতোর রাখী বাঁধবে। বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনে শাঁখ বাজিয়ে ঘটে প্রণাম ক'রে বাতাসা-পাটালি প্রসাদ

পাবে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী অচলা হবেন। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকবেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাকবেন।

'সবাই বল—

আমরা ভাই ভাই একঠাঁই।
ভেদ নাই ভেদ নাই ॥
ভাই ভাই একঠাঁই।
ভেদ নাই ভেদ নাই ॥
ভাই ভাই একঠাঁই।
ভেদ নাই ভেদ নাই ॥'[৬৭]

ত্রিশে আশ্বিন কলিকাতায় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কার্যসূচী রচিত হল তাও অভূতপূর্ব। সেদিন ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ থাকবে, দোকান-পাট খুলবে না। ভোরবেলা 'বন্দে মাতরম্' সংগীত করতে করতে সবাই মিলিত হবেন গঙ্গাতীরে। সেখানে স্নান করে শোভাযাত্রা পৌঁছবে বীডন স্কোয়ার ও কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের মধ্যবর্তী সেণ্ট্রাল কলেজে। শুরু হবে 'রাখীবন্ধন' অনুষ্ঠান। তার মূলমন্ত্র হবে 'ভাই ভাই একঠাঁই'। এই মন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে পরস্পর পরস্পরের হাতে হলদে রঙের সুতো বেঁধে দেবেন। রবীন্দ্রনাথই 'রাখীবন্ধনে'র কল্পনাকার। তিনি এই উপলক্ষে রচনা করলেন তাঁর বিখ্যাত রাখীসংগীত :

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান ॥
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক , পূর্ণ হউক হে ভগবান ॥
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান ॥
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

১১

কবি হিসাবে শুধু প্রেরণাসঞ্চারী সংগীত রচনা করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৃত্য শেষ হয়েছে মনে করলেন না, তিনি উদ্দীপ্ত উৎসাহে সক্রিয় আন্দোলনের সামিল হলেন। ভোরবেলা 'বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়ে'র শোভাযাত্রার পুরো-

ভাগে স্থান গ্রহণ করলেন তিনি। 'বন্দে মাতরম্' ও 'রাখী সংগীত' গাইতে গাইতে তিনি আপামর সাধারণের হাতে রাখী বেঁধে দিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সেই ভাবোন্মত্ত রূপটি শিল্পীর কলমে অক্ষয় করে এঁকে রেখেছেন। অবনীন্দ্রনাথ লিখছেন :

'রবিকাকা একদিন বললেন, রাখী-বন্ধন-উৎসব করতে হবে আমাদের। সবার হাতে রাখী পরাতে হবে।···ঠিক হোলো সকালবেলা সবাই গঙ্গাস্নান ক'রে সবার হাতে রাখী পরাব। এই সামনেই জগন্নাথ ঘাট, সেখানে যাব—রবিকাকা বললেন, সবাই হেঁটে যাব, গাড়িঘোড়া নয়।···রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দু-ধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাত অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে—মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁখ বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম—যেন একটা শোভাযাত্রা। দিনুও সঙ্গে ছিল, গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল—

বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।

···ঘাটে সকাল থেকে লোকে লোকারণ্য, রবিকাকাকে দেখার জন্য আমাদের চার দিকে ভিড় জমে গেল। স্নান সারা হোলো—সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল এক গাদা রাখী। সবাই এ ওর হাতে রাখী পরালুম। অন্যরা যারা কাছাকাছি ছিল তাদেরও রাখী পরানো হোলো।···পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে সহিস ঘোড়া মলছে, হঠাৎ রবিকাকা ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখী পরিয়ে দিলেন।···রাখী পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব কাণ্ড দেখে।···হঠাৎ রবিকাকার খেয়াল গেল চীৎপুরের বড়ো মসজিদে গিয়ে সবাইকে রাখী পরাবেন। হুকুম হোলো, চলো সব।···সোজা এগিয়েই চললেন মসজিদের দিকে, সঙ্গে ছিল দিনু, সুরেন আরো সব ডাকাবুকো লোক।'[৬৮]

সেদিন বিকেলে আপার সার্কুলার রোডে সুরেন্দ্রনাথ-প্রস্তাবিত মহাজাতি সদন বা ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন আনন্দমোহন বসু।

সন্ধ্যায় সভা হল পশুপতি বসু-র গৃহপ্রাঙ্গণে। আপার সার্কুলার রোডের বিপুল জনতা সহস্রকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের অভীক্ সংগীত গাইতে গাইতে সেখানে উপস্থিত হল।—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।

সেদিন কবির সংগীতসম্ভার অজস্র। তাই এক গান শেষ হবার পর আরেক গানের শুরু—

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান—
তুমি কি এমনি শক্তিমান!

পশুপতি বসুর গৃহ-প্রাঙ্গণে সন্ধ্যায় যে সভা হল তাতে প্রায় এক লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল। এই সভাতেই স্বদেশী কাপড় তৈরির জন্য একটি ভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সংগে সংগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দশদিক থেকে মুদ্রাবৃষ্টি হতে লাগলো। সভাস্থলেই পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগৃহীত হল। পরে আরো কুড়ি হাজার।

তিন সপ্তাহ পরে পশুপতি বসুর গৃহে বিজয়া দশমীর পরদিন (২১শে কার্তিক) 'বিজয়া সম্মিলনী' অনুষ্ঠিত হল। মৈমনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ বাংলার সম্ভ্রান্ত জমিদারগণও এ সভায় যোগ দিয়েছিলেন। এই সভায় মাতৃমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের ওজস্বিনী ভাষায় যে উদার আমন্ত্রণ রচিত হল তাতে, হিন্দু-সমাজের একটি ধর্মীয় মিলনোৎসব ধর্মনিরপেক্ষ বাংলা ও বাঙালী জাতির স্বদেশপ্রেমাত্মক জাতীয় মিলনোৎসবে পরিণত হল। 'বিজয়া-সম্মিলন' ভাষণে কবি বললেন,

'আজ হইতে বাংলাদেশে ঘরের মিলন এবং দেশের মিলন যেন এক উৎসবের মধ্যে আসিয়া সংগত হয়। আজ হইতে প্রতি বৎসরে এই দিনকে কেবল বান্ধব-সম্মিলন নহে আমাদের জাতীয় সম্মিলনের এক মহাদিন বলিয়া গণ্য করিব।'...'বঙ্গব্যবচ্ছেদ একটা উপলক্ষ্যস্বরূপ হইয়া সমস্ত বাঙালির হৃদয়ে এক আঘাত সঞ্চার করিতেই অমনি আমাদের যেন একটা তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, অমনি আমরা মুহূর্তের মধ্যেই চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইলাম বহু কোটি বাঙালির সম্মিলিত হৃদয়ের মাঝখানে আমাদের মাতৃভূমির মূর্তি বিরাজ করিতেছে। বাংলাদেশে চিরদিন বাস করিয়াও বাংলাদেশের এমন অখণ্ড স্বরূপ আমরা আর কখনো দেখি নাই। সেই জন্যই আমাদের সদ্যোজাগ্রত চক্ষুর উপরে জননীর দৃষ্টিপাত হইবামাত্রই এমন অনায়াসেই বাঙালি বাঙালির এত কাছে আসিয়া পড়িল—আমাদের সুখ-দুঃখ বিপদ-সম্পদ মান-অপমান যে আমাদের সেই এক মাতার চিত্তেই আঘাত করিতেছে: এ-কথা বুঝিতে আমাদের আর কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।'

ভাষণের উপসংহারে কবি তাঁর সেদিনকার দেশাত্মবোধের মর্মবাণী উচ্চারণ করে বললেন, 'হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া-সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ করো। উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্যন্ত, নদীজালজড়িত পূর্ব-সীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত করো। যে-চাষি চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো—যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো,...অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো। আজ সায়াহ্নে, গঙ্গার শাখা প্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূল-উপকূল দিয়া একবার বাংলাদেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও, আজ বাংলাদেশের সমস্ত ছায়াতরু-নিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে সেই নিস্তব্ধ শুচি রুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের বন্দে মাতরম্ গীতিধ্বনি একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক...'[৬৯]

কলিকাতার এই মহাপ্রেরণা বাংলার বিভিন্ন জেলার শহরে ও গ্রামে—বিশেষত পূর্ববঙ্গে...অরুণবহ্নির মত ছড়িয়ে পড়ল। সেই প্রেরণার মূলমন্ত্র হল 'বন্দে মাতরম্'।

শুধু বাংলাদেশেই নয়, বাংলার সেই অপূর্ব জাগরণ সমগ্র ভারতবাসীর চিত্তকে নবপ্রেরণায় প্রবুদ্ধ করল। ১৯০৫ সাল ভারতের জাতীয় জীবনে একটি অবিস্মরণীয় বৎসর। ঐতিহাসিক উইল ডুরান্ট যথার্থই বলেছেন, ১৯০৫ সাল থেকেই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূত্রপাত গণনা করতে হবে।[৭০]

৯২

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পুরোভাগে যে-সব নেতৃবৃন্দ ছিলেন তাঁদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই আন্দোলনের ধারক ও বাহক ছিল বাংলার ছাত্রসমাজ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যৌবনই বিশ্বের ধর্ম।...যৌবন জরাসন্ধের দুর্গ ভেঙে ফেলে জীবনের জয়ধ্বজা উড়ায়।' ছাত্রসমাজ হল প্রবুদ্ধ যৌবনের প্রতীক। বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করে বাংলার বুক জুড়ে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে সূত্রপাত হল তার প্রথম সারির সৈনিক ছিল ছাত্রসমাজ। স্বভাবতই মদমত্ত

বিদেশী শাসকের নির্যাতন ও অমানুষিক অত্যাচার ছাত্রসমাজই বুক পেতে গ্রহণ করেছে। শাসকবর্গ ভেবেছিল পৈশাচিক দমননীতির দ্বারা ছাত্রসমাজকে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু সরকারী দমননীতি যত বাড়তে লাগল ছাত্রসমাজও ততই মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে দীক্ষিত হতে লাগল।

সেদিন ছাত্রসমাজের উপর যে অমানুষিক নির্যাতন চলেছিল তার ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। ১৯০৫ সালেব ১০ই অক্টোবর চীফ সেক্রেটারী আর ডব্লু কার্লাইল প্রত্যেক জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কাছে একটি গোপন সার্কুলার জারি করলেন। তার সারমর্ম হল: 'সম্প্রতি স্কুল কলেজের ছাত্রগণ যেভাবে রাজনীতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছে তা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নিয়ম ও শৃঙ্খলার বিরোধী এবং ছাত্রদের পক্ষে অনিষ্টকর। যে-সকল প্রতিষ্ঠান সরকার থেকে কোনোরূপ সাহায্য পায় তাদের ছাত্রদের এই শ্রেণীর আচরণ কিছুতেই সহ্য করা হবে না। অতএব আপনার জেলার কোনো ছাত্র যদি তথাকথিত স্বদেশী আন্দোলনে পিকেটিং বা অন্য কোনো রকমে অংশ গ্রহণ করে তা হলে এই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষদের জানাতে হবে যে, যদি তাঁরা ছাত্রদের এই সব কুকার্য বন্ধ করতে না পারেন তাহলে সরকার এই সব প্রতিষ্ঠানে অর্থসাহায্য বন্ধ করে দেবেন। এ-সব প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ভবিষ্যতে বৃত্তি পাবে না, এবং এখন যারা পাচ্ছে তাও বন্ধ করে দেওয়া হবে। আর এ সব স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা যাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা দানের অধিকারে বঞ্চিত হয় তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে লেখা হবে। অবশ্য যদি স্কুল কলেজের কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ছাত্রদের স্বদেশী আন্দোলন থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে না পারেন তাহলে যে-সব ছাত্র তাঁদের আদেশ অমান্য করবে তাদের নামের তালিকা শাসন-কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে হবে এবং তাঁরাই (ম্যাজিস্ট্রেট বা কালেক্টররা) তাদের উপযুক্ত দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করবেন। স্কুল কলেজের শিক্ষকদের একথাও জানাতে হবে যে, শান্তিরক্ষায় প্রয়োজন হলে তাঁদের 'স্পেশাল কনস্টেবল' নিযুক্ত করা হবে। ছাত্রদের দ্বারা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকলে বিনা দ্বিধায় তা করা হবে। কারণ ছাত্ররা শিক্ষকদের ভক্তি করে এবং তাঁরা দুষ্কৃতকারী ও অবাধ্য ছাত্রদের নামধাম দিতে পারবেন।'

কার্লাইলের এই কুখ্যাত সার্কুলার জারির সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় আগুন জ্বলে উঠল। এই আগুন নিয়ে খেলার কী প্রলয়ংকর পরিণাম হতে পারে তা সেদিন মদান্ধ শাসকদের বোধগম্য হয় নি।

এই সার্কুলার জারির এগারো দিন পরে, ২১শে অক্টোবর ১৯০৫, শিক্ষা

বিভাগের ডিরেক্টর পেডলার সাহেব কলকাতায় কয়েকজন অধ্যক্ষের নিকট এক পত্র লেখেন। ৩রা অক্টোবর হ্যারিসন রোডে যে-সব ছাত্র পিকেটিং করেছিল তাদের কেন কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হবে না অধ্যক্ষগণকে তার কারণ দেখাতে হবে।

কার্লাইল সার্কুলার এবং পেডলারের চিঠিতে সরকারের যে জঙ্গী মনোভাব প্রকাশিত হয় তার প্রতিবাদে বাংলার সংবাদপত্র এবং নেতৃবৃন্দ সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ২৪ অক্টোবর ব্যারিস্টার আব্দুল রসুলের নেতৃত্বে এক জনসভায় বিপিনচন্দ্র পাল কার্লাইল সার্কুলারের শুধু নিন্দা করেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি প্রস্তাব করলেন সরকারী প্রভাববর্জিত স্বাধীনভাবে পরিচালিত জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হোক্। 'বাংলা দেশের ইতিহাস'কার লিখেছেন, ঐ দিনই গোলদিঘিতে আরেকটি জনসভা হয়। প্রায় দু'হাজার মুসলমান এই সভায় স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।'[১১]

এর তিন দিন পরে পটলডাঙায় চারুচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে একটি বিরাট জনসভা আহূত হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ। ভূপেন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সতীশ মুখার্জি, বিপিনচন্দ্র পাল, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কলকাতার বিভিন্ন কলেজের সহস্রাধিক ছাত্র এই সভায় যোগদান করে প্রতিজ্ঞা করল যে, তারা 'কার্লাইল সার্কুলার' মানবে না। সভাপতি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ এই কুখ্যাত সার্কুলারের তীব্র নিন্দা করলেন।

কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র, নেতৃবৃন্দ এবং কলিকাতার ছাত্রসমাজের এই নির্ভীক প্রতিবাদে শাসকবর্গ ক্ষিপ্ত হলেন এবং স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের বিরুদ্ধে তাঁদের নির্যাতন চরমে উঠল।

১৬ অক্টোবর নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসামের চীফ সেক্রেটারি পি. সি. লায়ন [P. C. Lyon] কার্লাইল সার্কুলারের অনুরূপ একটি সার্কুলার জারি করলেন। তাতে আরো বলা হল, যে-সব ছাত্র বিলিতি পণ্য বর্জনের সমর্থনে পিকেটিং করবে তারা সরকারী চাকরি পাবে না।

রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট টি. এমার্সন [T. Emerson]-এর নির্দেশমতে রংপুরের জেলা স্কুলের হেডমাস্টার ৩১ অক্টোবর, ১৯০৫ এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেন যে, স্বদেশী আন্দোলনে পিকেটিং প্রভৃতি সক্রিয় কোনো অংশ গ্রহণ করলে ছাত্রদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। ছাত্ররা সেদিনই এক স্বদেশী সভায় যোগ দিল, স্বদেশী গান গাইল এবং 'বন্দে মাতরম্' জয়ধ্বনিতে সারা

পথ মুখরিত করে গৃহে ফিরল। পরদিন রংপুর জেলা-স্কুল ও টেক্‌নিক্যাল স্কুলের ছাত্ররা বৃহত্তর জনসভায় মিলিত হয়ে ঘোষণা করল, 'যে উপায়েই হোক্, বঙ্গভঙ্গ রোধ করবই।'

বিদেশী আমলাতন্ত্রীরা বিচলিত হলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রতি ছাত্রের পাঁচ টাকা জরিমানা করলেন এবং আদেশ দিলেন জরিমানা না দেওয়া পর্যন্ত তারা স্কুলে যোগ দিতে পারবে না। পুনরায় এ ধরনের অপরাধ অনুষ্ঠিত হলে স্কুলটি তুলে দেওয়া হবে। এই আদেশের অনুলিপি অভিভাবকগণকে পাঠানো হল। তাঁরা বললেন, ছেলেরা কোনো অপরাধ করেনি, সুতরাং তারা জরিমানা দেবে না। ৭ নভেম্বর রংপুর শহরের নাগরিকগণ এক সভায় মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত করলেন, তাঁরা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করবেন। পরদিনই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। কার্লাইল সার্কুলার অমান্য করার জন্য সার্কুলার-বিরোধী সমিতি [Anti-Circular Society] নামে একটি সমিতি গঠিত হল। শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু নামে একজন স্নাতক-পর্যায়ের ছাত্র হলেন এই সমিতির সম্পাদক ও প্রাণপুরুষ।

ফরিদপুর জেলার মহকুমা-শহর মাদারিপুরে স্কুলের একটি ছাত্র ছাতা মাথায় দিয়ে যাচ্ছিল। তাতে পাটের ব্যবসায়ী জনৈক শ্বেতাঙ্গের মর্যাদাহানি হয়। শ্বেতাঙ্গ-প্রবর ছাত্রের হাত থেকে ছাতাটি কেড়ে নিতে চাইলেন। সে সমস্ত শক্তি দিয়ে ছাতাটি ধরে থাকল। শ্বেতাঙ্গটি তখন তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে সঙ্গের তিনটি চাপরাশীকে আদেশ দিলেন ছাত্রটিকে প্রহার করতে। তারা ছাত্রটিকে বেদম প্রহার করল। শ্বেতাঙ্গ বণিকটি তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে স্কুলের প্রধানশিক্ষককে জানালেন ছাত্রটিকে যেন গুরুতর দণ্ড দেওয়া হয়। প্রধানশিক্ষক বণিকের এই স্পর্ধাকে গ্রাহ্য করলেন না। ইতিমধ্যে ওই চাপরাশীদের একজন প্রহৃত হল। 'বণিকপ্রবর তখন সরকারের শরণাপন্ন হলেন। বিভাগীয় স্কুল-ইনস্‌পেক্টর স্টেপলটন [Stepleton] সরেজমিনে তদন্তের জন্য মাদারিপুর এলেন। ব্যাপারটি নিশ্চয়ই বয়স্ক ছাত্রদের কীর্তি। অতএব উপরের ক্লাসের ছাত্রদের কাছ থেকে দু'শ টাকা জরিমানা আদায় করে চাপরাশীকে দেওয়ার আদেশ জারি করলেন। কিন্তু তাতে কোনো ফলোদয় না হওয়ায় পূর্ববঙ্গের ছোটলাট ফুলার হুকুম দিলেন, স্কুলের প্রথম তিনটি উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের দেড়শ' টাকা জরিমানা দিতে হবে, এবং মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে প্রধানশিক্ষক ছাত্রদের বেত্রাঘাত করবেন। প্রধানশিক্ষক এই উদ্ধত নির্দেশ পালনে অস্বীকার করলেন। ফলে অবিলম্বে তাঁর পদত্যাগের আদেশ জারি হয়ে গেল। তার প্রতিবাদে মাদারিপুরের

এগারোটি স্কুলের প্রতিনিধিরা প্রধানশিক্ষক কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সমর্থনে একটি স্থায়ী সমিতি গঠন করলেন। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর আদেশ জারি করলেন যে, সমিতির সদস্য-শিক্ষকগণকে বরখাস্ত করতে হবে। কিন্তু তাতে কেউ কর্ণপাত করল না।

৮ নভেম্বর (১৯০৫) পূর্ববঙ্গের চীফ সেক্রেটারি লায়ন ঢাকা বিভাগের কমিশনারের কাছে দুটি সার্কুলার পাঠালেন। তাতে রাস্তায় বা প্রকাশ্য স্থানে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেওয়া, প্রকাশ্য স্থানে রাজনীতিমূলক আলোচনার জন্য সভা-সমিতি করা, দলবদ্ধ 'বন্দে মাতরম্' সংগীত গান করা নিষিদ্ধ হল। বলাই বাহুল্য, বাংলার নির্ভীক ছাত্রসমাজ সিংহবিক্রম লায়নের এই নিষেধাজ্ঞাগুলিও পদদলিত করে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলল।

পূর্ববঙ্গে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের দমননীতি প্রচণ্ডতম রূপ গ্রহণ করল বরিশালে। সেদিন বরিশালের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন ঋষিপ্রতিম শিক্ষাগুরু অশ্বিনীকুমার দত্ত। তাঁর নেতৃত্বে বরিশাল স্বদেশী আন্দোলনের দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়েছিল। বিদেশী পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী গ্রহণকে অশ্বিনীকুমার অবশ্যপালনীয় জীবনব্রত হিসাবে বরণ করেছিলেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনকে সার্বজনিক জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করার জন্য জীবন উৎসর্গ করলেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অবিচলিত প্রয়াসে বরিশালে স্বদেশীব্রত পালন সর্বসাধারণের জীবনচর্যায় পরিণত হয়েছিল। 'স্টেটস্ম্যান' পত্রিকায় লেখা হয় 'সারা অক্টোবর মাসে (১৯০৫), বিশেষত পূজার সময়, সমগ্র বরিশাল জেলায় 'বিলিতি বর্জন' আন্দোলন অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে, বিলিতি দ্রব্যের বিক্রেতারা দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছে। তাদের মনে শান্তি নেই। বরিশাল শহর এবং জেলার সর্বত্র সভাসমিতির অধিবেশন হচ্ছে এবং 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কোন কোন স্থানে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।'

১৯০৫ সালের ৭ই নভেম্বর অশ্বিনীকুমার এবং আরো কয়েকজন নেতা সারা জেলায় এক আবেদনপত্র প্রচার করলেন। আবেদনপত্রে দেশবাসীকে সরল ভাষায় জানানো হল কিভাবে এদেশের সুতো বিলেতে নিয়ে গিয়ে সেখানকার কাপড়ের কলে কাপড় তৈরি করে পুনরায় এদেশে পাঠিয়ে চড়া দরে বিক্রি করে বিলিতি শ্রমিক ও কলওলারা লাভবান হচ্ছে। দেশে কাপড় তৈরি হলে কাপড়ের দাম কম পড়বে, শ্রমিকের অর্থোপার্জন হবে এবং লাভের টাকা দেশেই থাকবে।

আবেদনপত্রে আরো বলা হল, বিদেশী দ্রব্যের বদলে স্বদেশী দ্রব্য সবাই ক্রয় করব—এই প্রতিজ্ঞা করতে হবে। কিন্তু যদি কেউ তা করতে না চায় তাহলে তার উপর জোর জুলুম করলে আইন ভঙ্গ করা হবে। আইন ভঙ্গ করা হলে শাসকশ্রেণীর হাতেই আন্দোলন দমনের অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে। সুতরাং বিদেশী দ্রব্য ক্রয়কারীদের অনুরোধ উপরোধ করেই প্রতিনিবৃত্ত করতে হবে। তাতেও যদি কেউ বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করে তাহলে তার সম্পর্কে সামাজিক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তাকে 'একঘরে' করা হবে। এই বিদেশী বর্জন-নীতি সফল করার জন্য প্রতিমাসে একটি জনসমিতি গঠন করতে হবে।

ছোটলাট ফুলার এই আবেদনপত্রের সংবাদ পেয়ে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তাঁর মতে একমাত্র দেশশাসক বা তাঁর প্রতিনিধিরাই এই ধরনের ঘোষণাপত্র প্রচারের অধিকারী। সুতরাং এই আবেদনপত্র 'বিদ্রোহব্যঞ্জক', এবং গ্রাম্যসমিতি গঠনের প্রস্তাব অন্যায়, অসংগত ও স্পর্ধার পরিচায়ক। তিনি নির্দেশ দিলেন, এই আবেদনপত্র অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। বরিশালের নাগরিকগণ ফুলারের সংগে আলোচনা করে আবেদনপত্রের কিছু কিছু অংশ তাঁর পক্ষে আপত্তিকর বলে বর্জন করার কথা চিঠি লিখে জানালেন। উৎফুল্ল জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট এই সুযোগে ঘোষণা করলেন, 'অশ্বিনীকুমার দত্ত ও তাঁর সহযোগীরা আবেদনপত্রখানি প্রত্যাহার করেছেন।' তাঁর এই মিথ্যা ঘোষণা-পত্রের প্রতিবাদ করে অশ্বিনীকুমার তাঁকে লিখলেন, 'লাটসাহেবের সম্মানরক্ষার জন্য আমরা আবেদনপত্র থেকে কয়েকটি শব্দ বাদ দিয়েছি, কিন্তু তা প্রত্যাহার করি নি। অতএব আপনার বিজ্ঞপ্তিতে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তা সংশোধন করুন।' জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট তার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন না। অশ্বিনীকুমার তাঁর বিরুদ্ধে মানহানি মামলা দায়ের করলেন। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারে হেরে গেলেন এবং তাঁর ১২০ টাকা জরিমানা হল।

এই পরাজয়ে শাসকশ্রেণীর ক্রোধে ঘৃতাহুতি পড়ল। বরিশালের অবস্থা ক্রমশ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠতে লাগল। পুলিশ রিপোর্ট করল হিন্দুরা বলপূর্বক মুসলমানদের বিলিতি পণ্য কিনতে বাধা দিচ্ছে এবং শ্বেতাঙ্গদের প্রতি অসদ্‌ব্যবহার করছে। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট বাণারিপাড়া গ্রামে গেলে গোলমাল হয়। তারি শাস্তি হিসাবে তিনি স্কুলের তিনজন ছাত্র এবং দু'জন শিক্ষককে স্কুল থেকে বিতাড়িত করার আদেশ দেন। এই দণ্ডাদেশের পুনর্বিচারের জন্য ছাত্রসমাজ তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করতে যায়। কিন্তু

তাদের আবেদনে তিনি কর্ণপাত না করায় তরুণেরা উত্তেজিত হয়ে তাঁর দিকে মাটির ঢেলা ছুঁড়ে মারে।

বরিশালে গুর্খা ও পুলিশ দিনের পর দিন যে অকথ্য অত্যাচার করেছিল 'বাংলা দেশের ইতিহাস'কার তার কয়েকটি উদাহরণ তাঁর গ্রন্থে তুলে দিয়েছেন—

১. একটি বাড়ির গায়ে 'বন্দে মাতরম্' লেখা ছিল বলে বাড়িটি ভেঙে ধূলিসাৎ করা হয়।

২. বাড়ির রান্নাঘরে বসে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করার অপরাধে একটি ১০/১১ বছরের বালককে টেনে-হিঁচড়ে কাছারিতে নিয়ে গিয়ে ত্রিভুজাকৃতি কাঠের ফ্রেমে তার হাত-পা বেঁধে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করা হয়।

৩. গুর্খারা দোকান থেকে মূল্য না দিয়েই ইচ্ছামত জিনিসপত্র জোর করে নিয়ে যেতে লাগল।

৪. দুটি মিষ্টির দোকানে স্বদেশী দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ছিল। দোকানদার তা সরাতে রাজী না হওয়ায় তাকে নির্মম প্রহারে আহত করা হল।

বরিশাল শহরে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে গুর্খাদের অত্যাচার বহুগুণিত হল। তার ফলে বরিশালবাসীরা যে সন্ত্রাস ও বিভীষিকার মধ্যে বাস করতেন তা অবর্ণনীয়। লণ্ডনের 'ডেলি নিউজ' পত্রিকার বিশেষ-সংবাদদাতা নেভিনসন সেই সময় বাংলার নানা স্থানে ঘুরে যে-সব সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। 'বাংলা দেশের ইতিহাস'-কার সেই গ্রন্থ থেকে যেসব অংশ উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে জানা যায়, বরিশালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগদান করার অপরাধে বহুসংখ্যক পদস্থ ব্যক্তিকে পনেরো দিনের মধ্যে বরিশাল শহর থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়। গুর্খা সৈন্যদল শহরের সর্বত্র ঘাঁটি গেড়ে সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে যে অত্যাচার করেছে অন্য কোনো স্থানে তা ঘটলে গুরুতর 'রায়ট' শুরু হয়ে যেত।

শুধু বরিশালেই নয়, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ফুলার যে প্রতিহিংসা গ্রহণ করেছিলেন নেভিনসন তাঁর গ্রন্থে তাও লিপিবদ্ধ করেছেন। একজন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে এত উত্তেজিত হয়েছিলেন যে বহু গণ্যমান্য বৃদ্ধ ভদ্রলোককে অপমান করার জন্য 'স্পেশাল কনস্টেবল' নিযুক্ত করেন। বিলাতি পণ্য বর্জন প্রচারের জন্য অনেকের নামে আদালতে অভিযোগ করা হয়। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেবার অপরাধে ও অজুহাতে

বহু সরকারী কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়। নিরস্ত্র লোকের উপর পুলিশের লাঠির আঘাত তো নিত্যকার ঘটনা হয়ে ওঠে।

পূর্ববঙ্গের ছোটলাট 'ফুলারে'র শাসন সম্পর্কে নেভিনসন যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন, 'বাংলা দেশের ইতিহাস'কার বলেছেন, নিরপেক্ষ তদন্ত হিসাবে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নেভিনসন লিখেছেন, 'হুকুমের পর হুকুম জারি করে ফুলার সাহেব প্রকাশ্য স্থানে সভা-সমিতি বন্ধ করেছেন, কোনো ছাত্র বা অন্য কেউ রাস্তায় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করলেই পুলিশ তাকে ফৌজদারী কয়েদীর মত গ্রেপ্তার করেছে। রংপুরের যে-সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ফুলারের অভিনন্দনে যোগদান করেন নি তাঁদের 'স্পেশাল কনস্টেবল' নিযুক্ত করা হয়। কোমরে কোমরবন্ধ পরে হাতে 'ব্যাটন' নিয়ে তাঁদের সাধারণ কনস্টেবলদের মত ড্রিল করতে বাধ্য করানো হ'ত, এবং শহরে সরকারের বিরুদ্ধে কে কি ষড়যন্ত্র করছে রোজ তার রিপোর্ট লিখতে হ'ত। আইনের কোনো ধারায়ই অপমানসূচক এই আচরণের সমর্থন নেই।'[৭২]

১৩

কিন্তু বরিশালের সংকল্পবদ্ধ জাগ্রত চেতনাকে পৈশাচিক অত্যাচার ও বর্বরোচিত স্বৈরশাসনের দ্বারা দমন করে রাখা কিছুতেই সম্ভব হল না। একটি সভায় লর্ড কার্জনের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হল এবং শেষকৃত্যও সম্পাদিত হল। সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হল 'বন্দে মাতরম্'।

বরিশালের ইতিহাস চরমে পৌঁছল কংগ্রেসের বার্ষিক প্রাদেশিক সম্মেলনে। সেদিন বাংলায় 'প্রাদেশিক সম্মেলন' আহ্বান করার যোগ্যতর স্থান আর কোথাও হতে পারত না। এই 'প্রাদেশিক সম্মেলনে'র বিবরণ রক্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন সেদিনকার নেতৃপুরুষ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নেশন ইন মেকিং' নামক আত্মজীবনীমূলক ইংরেজি গ্রন্থে। মূলত তাঁরই অনুসরণে বরিশালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনের বিবরণ সংকলিত হল।[৭৩]

প্রাদেশিক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন আহূত হয় ১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল। ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল এই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সম্মেলনের বিরাট প্রস্তুতিপর্ব দেখে শাসকবর্গ ক্রোধে কাণ্ডজ্ঞান হারালেন। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন সভা ও শোভাযাত্রায় 'বন্দে মাতরম্'

গান করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন, এমন কি 'বন্দে মাতরম্‌' ধ্বনি দেওয়াও নিষিদ্ধ ঘোষিত হল।

এদিকে সারা বাংলার সব জেলা থেকে প্রতিনিধিবর্গ সম্মেলনে যোগদানের জন্য বরিশাল শহরে উপনীত হতে লাগলেন। বাংলার নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে বরিশাল বহ্নিমান হয়ে উঠলো। কলিকাতা ও ঢাকা থেকে প্রতিনিধিবর্গের দুটি বিরাট দল সম্মেলনের পূর্বদিন সন্ধ্যায় স্টিমারে বরিশাল পৌঁছেই শুনলেন, কর্তৃপক্ষ 'বন্দে মাতরম্‌' গান এবং ধ্বনি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তাঁরা ঢাকা থেকে স্টিমারে করে বরিশাল পৌঁছে দেখলেন কলিকাতা থেকে আগত প্রতিনিধিগণ পূর্বেই পৌঁছে গেছেন, কিন্তু স্টিমার থেকে নামেন নি। যুক্তিসঙ্গত কারণেই একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ঢাকার প্রতিনিধিগণের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। তাঁরা পৌঁছলে নেতৃবৃন্দ মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত করলেন যে, 'বন্দে মাতরম্‌' সম্পর্কে শাসকবর্গের নিষেধ-ঘোষণা বে-আইনী এবং এ সম্পর্কে তাঁরা বিশেষজ্ঞ ব্যবহারজীবীদের পরামর্শও গ্রহণ করলেন। প্রশ্ন দেখা দিল, প্রতিনিধিবর্গ কি স্বৈরতান্ত্রিক মূঢ়তার কাছে নতি স্বীকার করবেন? স্বভাবতই তাঁদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। কিন্তু বরিশালের নেতৃবৃন্দ পূর্বেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, সমাগত নেতৃবৃন্দের সংবর্ধনায় প্রকাশ্য স্থানে 'বন্দে মাতরম্‌' ধ্বনি দিতে বিরত থাকবেন। প্রতিনিধিবর্গের কাছে এ প্রশ্নও দেখা দিল যে, তাঁরা কি এই প্রতিশ্রুতি মেনে চলবেন? তরুণেরা বললেন, তাঁরা এই প্রতিশ্রুতি মানবেন না। অবশেষে একটি সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। বরিশালের নেতৃবৃন্দ কেবল সমাগত প্রতিনিধিবর্গকে সংবর্ধনা জানাবার সময় 'বন্দে মাতরম্‌' ধ্বনি দেবেন না, এই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন, তার বেশি নয়। বরিশালের নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলা হবে, কিন্তু সম্মেলন চলা কালে বন্দে মাতরম্‌ ধ্বনি দেওয়া হবে। কেননা এই সম্বন্ধে আইনানুগ কোন নির্দেশ সরকার দেন নি। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর প্রতিনিধিবর্গ স্টিমার থেকে শহরে অবতরণ করলেন।

১৪ এপ্রিল কার্যসূচী অনুযায়ী সম্মেলনের কাজ শুরু হল। প্রথমেই ছিল শোভাযাত্রা। সিদ্ধান্ত হল যে 'হাভেলি'র 'রাজা সাহেবের বাংলো' থেকে 'বন্দে মাতরম্‌' ধ্বনি দিতে দিতে সম্মেলনসত্রে শোভাযাত্রা পৌঁছুবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেলা দেড়টায় নেতৃবৃন্দ শোভাযাত্রা শুরু করলেন। সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি ব্যারিস্টার রসুল ও তাঁর ইংরেজ পত্নী গাড়িতে করে

শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকলেন। সুরেন্দ্রনাথ, অমৃতবাজার-সম্পাদক মতিলাল ঘোষ এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পদব্রজে সঙ্গে সঙ্গে চললেন। তাঁদের পেছনে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি। তখন পর্যন্ত পুলিশবাহিনী নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে 'বন্দে মাতরম্' ব্যাজ ধারণ করে 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র স্বেচ্ছাসেবক দল শোভাযাত্রায় যোগ দিল, সেই মুহূর্তেই ছ'ফুট লম্বা মোটা লাঠি নিয়ে পুলিশবাহিনী তাদের গুরুতর প্রহার করতে লাগল এবং 'বন্দে মাতরম্' ব্যাজ ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হল। পুলিশের এই উদ্দেশ্যমূলক প্ররোচনায় স্বেচ্ছাসেবকগণ দেশ ও জাতির সম্মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে মুহুর্মুহু 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিতে লাগল। লাঠির প্রতিটি প্রহারের প্রত্যুত্তরে তারা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চাবণ করতে লাগল। তাদের মাথা ফেটে রক্তস্রোত বয়ে যেতে লাগল। প্রহারেব ফলে মাটিতে পড়ে গেলে তাদের উপর চলল পুলিশের হিংস্র অত্যাচার। ভারি বুট দিয়ে তারা ভূপতিত স্বেচ্ছাসেবকদের লাথি মারতে লগল। সেদিনের বিশিষ্ট স্বদেশী-নেতা মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জনকে পুলিশ পুকুরের জলে ফেলে লাঠিপেটা করতে লাগল। যতবার লাঠির আঘাত মাথায় পড়েছে ততবারই প্রত্যুত্তরে চিত্তরঞ্জন 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ করেছে। যদি সেদিন নির্ভীক স্বেচ্ছাসেবকরা চিত্তরঞ্জনকে হিংসা-মদমত্ত পুলিশের আক্রমণ থেকে উদ্ধার না করত তাহলে এই নির্ভীক স্বদেশসেবকের ভাগ্যে ছিল অনিবার্য সলিলসমাধি। সেদিন থেকেই মাতৃ-ভূমির জয়ধ্বনি 'বন্দে মাতরম্' হল স্বৈরাচারী বিদেশী শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী তরুণদের যুদ্ধ-ধ্বনি। চিত্তরঞ্জন যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করল, তারই অনুসরণে পরবর্তী কালে 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান' সেইসব বীর শহীদেরাও 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনি দিয়েই ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেছে।

পুলিশ সেদিন শুধু তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর অত্যাচার চালিয়েই নিরস্ত থাকে নি, সম্মানিত প্রবীণ নেতাদেরও তারা ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসায় লাঞ্ছনার একশেষ করেছে। এই অতর্কিত আক্রমণ প্রত্যক্ষ করে এবং চিত্তরঞ্জনের সংবাদ শুনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট কেম্প সাহেবকে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমরা আমাদের যুবকদের এভাবে বেপরোয়া প্রহার করছ কেন, যদি কোন দোষ হয়ে থাকে, আমি এঁদের নেতা, সুতরাং সবকিছুর দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি, আমাকে তোমরা গ্রেপ্তার কর'।

এই কথা শুনে 'বাংলার মুকুটহীন রাজা' সুরেন্দ্রনাথকে পুলিশ শোভাযাত্রার পুরোভাগ থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করার পর মতিলাল ঘোষ পুলিশ-সুপারিন্-টেণ্ডেন্টকে বললেন, 'আমাকেও গ্রেপ্তার কর।' সাহেব বললেন, 'কেবল সুরেন্দ্রনাথকে আটক করারই হুকুম আছে, আর কাউকে গ্রেপ্তার করব না।' সুরেন্দ্রনাথ তখন পার্শ্ববর্তী ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে বললেন, 'আপনারা এগিয়ে গিয়ে যথারীতি সম্মেলনের কাজ আরম্ভ করুন।' সুরেন্দ্রনাথের নির্দেশ পালিত হল এবং যথারীতি সভার কাজ চলতে লাগল।

সেদিন আদালত বন্ধ ছিল। কাজেই পুলিশ সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে গেল জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সনের বাংলোয়। তাঁর সংগে সংগে দুই নেতাও বাংলোয় গিয়েছিলেন। তাঁরা দুটি চেয়ারে বসলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ যেই চেয়ারে বসতে গেলেন অমনই ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'তুমি কয়েদি, তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।' তারপর ম্যাজিস্ট্রেট সরাসরি বিচার করে বিনা লাইসেন্সে শোভাযাত্রা করা এবং নিষিদ্ধ 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেবার অপরাধে সুরেন্দ্রনাথকে দুশো টাকা জরিমানা করলেন। বরিশাল কোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল দীনবন্ধু সেন তৎক্ষণাৎ সে টাকা দিয়ে সুরেন্দ্রনাথকে মুক্ত করে সভাস্থলে নিয়ে গেলেন। সম্মেলনসত্রে সুরেন্দ্রনাথ প্রবেশ করা মাত্র সবাই দাঁড়িয়ে উঠে সমবেতকণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানাল।

হর্ষধ্বনি থামলে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা গুরুতর আহত, মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা, পুত্র চিত্তরঞ্জনকে নিয়ে সভামঞ্চে উঠে পুলিশের বর্বর অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করতে লাগলেন। 'বাংলা দেশের ইতিহাস'-কার লিখেছেন, 'এই হৃদয়বিদারক দৃশ্যের একখানি চিত্র কিছুকাল পরেই কলিকাতা প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছিল এবং বড়লাট লর্ড মিন্টো ইহার উদ্বোধন করেছিলেন'।[৭৪]

সন্ধ্যায় প্রথম দিনের সম্মেলন শেষ হবার পর প্রতিনিধিবর্গ উচ্চকণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হলেন, কিন্তু পুলিশ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দর্শক হয়েই দাঁড়িয়ে রইল। সম্ভবত তারা নতুন নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল। পরদিন সভা পুনরায় আরম্ভ হবার পর পুলিশসাহেব সভায় প্রবেশ করে সভাপতিকে বললেন, সভাভঙ্গের পর ফেরার পথে কেউ 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিতে পারবে না, এই প্রতিশ্রুতি যদি তিনি না পান তাহলে সভা বন্ধ করে দেবেন। সভাপতি নেতৃবৃন্দের সংগে

পরামর্শ করে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করলেন। তখন পুলিশ-সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশপত্র পাঠ করে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা অনুযায়ী 'এই সম্মেলনের অধিবেশন বন্ধ করা হল' বলে আদেশ জারি করলেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ এই অন্যায় আদেশে বিশেষ ক্ষুব্ধ হলেন এবং অনেকেই, বিশেষ করে তরুণেরা, আদেশ লঙ্ঘন করেই সম্মেলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু বর্ষীয়ান নেতৃবৃন্দ সরকারি হুকুম সরাসরি অমান্য করার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেখিয়ে বিদ্রোহী তরুণদের নিরস্ত করলেন। সবাই সভাসত্র ত্যাগ করে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হলেন। কেবলমাত্র কৃষ্ণকুমার মিত্র বহুক্ষণ সভায় বসে রইলেন, অবশেষে অনেকের অনুরোধে তিনিও অনিচ্ছাসত্ত্বেই সভা থেকে বেরিয়ে এলেন।[৭৫]

বরিশালে এই প্রাদেশিক সম্মেলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছে। 'বন্দে মাতরম্'কে কেন্দ্র করে ক্ষমতা-মদমত্ত বিদেশী শাসকদের অবিমৃষ্যকারিতা চরমে উঠল। 'বন্দে মাতরম্'কে নিয়ে এই উন্মত্ততা যে কি অনুচিত হয়েছে তা পরবর্তীকালে শাসকবর্গ বুঝতে পেরেছিল। বড়লাট লর্ড মিণ্টো স্বীকার করেছেন :

'It would have been better if the peaceful procession and meeting were left alone. Surendranath Banerji deliberately wooed arrest, and he was helped succeed by the police.···Since the action of the local authorities had not been entirely legal, it caused additional concern to the Governor General. ·· As for the arrest of Surendranath Banerji, and interference with the procession, its legality was not clear. Further more, declaring the slogan of Bande Mataram illegal was a misconstruction of law.[৭৬]

বরিশাল সম্মেলন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জয়তিলক। তার পরিচয় পাওয়া গেল নেতৃবৃন্দের প্রত্যাবর্তনের পথে। প্রতি স্টেশনে স্টিমার থামার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট জনতা সুরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য নেতাকে যে সম্মান জানালো তা যুদ্ধবিজয়ী মহাধিনায়কের যোগ্য। সবাই বাংলার মুকুটহীন রাজার পদধূলি গ্রহণের জন্য কাড়াকাড়ি করতে লাগল। ১৮ এপ্রিল ভোরবেলা কলিকাতায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে শেয়ালদা স্টেশনে প্রায় দশ হাজার লোক তাঁকে সংবর্ধনা জানালো। শুধু তাই নয়, তাঁকে ঘোড়ার গাড়িতে তুলে শোভাযাত্রার

ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রোৎসাহী তরুণেরা গাড়ির ঘোড়াকে মুক্তি দিয়ে নিজেরা গাড়ি টেনে গোলদিঘিতে পৌঁছল। সেখানে সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শোনার জন্যে ভোর থেকেই হাজার হাজার লোক সমবেত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর কম্বুকণ্ঠে মহাসংগ্রামের শঙ্খধ্বনি করলেন।

১৪

প্রকৃতপক্ষে যেদিন থেকে বাঙালী লর্ড কার্জনের কুমতলবের আভাস পেয়েছিল সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল সংগ্রাম ও সংগঠনের প্রস্তুতি। সে প্রস্তুতি এই শতাব্দীর সমবয়সী। ১৯০১ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হল কলিকাতায়। সঙ্গে একটি শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হল। বস্তুত কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের পালাবদল কলিকাতা কংগ্রেস থেকেই শুরু হয়। অধিবেশনে একটি গঠনমূলক প্রস্তাব গৃহীত হল। এ প্রস্তাবের নতুনত্ব হল, শাসকবর্গের কাছে আবেদন না জানিয়ে একেবারে দেশবাসীর কাছেই আবেদন জানাতে হবে। প্রস্তাবটির প্রথমাংশের মর্মার্থ হল এই যে, দেশের তৎকালীন আর্থিক দুর্দশার একটি প্রধান কারণ—উৎপন্ন দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় নীতিতে জনগণের অজ্ঞতা। সুতরাং এ বিষয়ে তাদের সচেতন করতে স্বদেশহিতৈষী শিক্ষিত ব্যক্তিরা যেন তৎপর হন। প্রস্তাবটির দ্বিতীয় অংশে বলা হয় যে, ভারতের আর্থিক সমস্যা দূর করতে হলে গ্রামে শহরে সর্বত্র ভারতবাসীদের মূলধন সরবরাহ ও ঋণদান ব্যবস্থার প্রবর্তন অত্যাবশ্যক। কংগ্রেস এই উদ্দেশ্যে স্বদেশবাসীর মধ্য থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে সকলকে আহ্বান করেন।[১১]

কলিকাতা কংগ্রেস প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। এই অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতা কংগ্রেসেই আত্মনির্ভরতা, সংগঠন ও স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তারই ফলে কলিকাতা ও মফস্বলে অনেকগুলি গঠনমূলক ও স্বদেশপ্রেমাত্মক সমিতি গড়ে ওঠে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য হল ১৯০২ সালের মার্চে গঠিত 'অনুশীলন সমিতি', জুলাই-এ 'ডন সোসাইটি', এবং অক্টোবরে সরলা দেবীর 'বীরাষ্টমী অনুষ্ঠান সমিতি'। তাছাড়া আছে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'ব্রতী সমিতি', সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়', ভবানীপুর-কালিঘাট অঞ্চলের 'সন্তান সম্প্রদায়', এবং চিত্তরঞ্জন দাশের ভবনে 'স্বদেশী মণ্ডলী'। মফস্বলের সমিতিগুলির মধ্যে বরিশালের 'স্বদেশবান্ধব সমিতি' [তার শাখা ছিল ১৫৯টি] এবং

মৈমনসিংহের 'সুহৃৎ সমিতি'ও স্বদেশী প্রচারে ব্রতী হন। জাতির বীর্যবত্তা জাগরণের জন্য সরলা দেবী 'বীরাষ্টমী' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং সখারাম গণেশ দেউস্করের উদ্যোগে শুরু হয় 'শিবাজী উৎসব'।

এই সব সংগঠন ও জাতীয় শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ডন সোসাইটি'। এর প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ ও লক্ষ্য সম্মুখে রেখে যাতে বাংলার যুবসমাজ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে পারে তাই ছিল সতীশচন্দ্রের আদর্শ। বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে ধর্ম ও নীতিশিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের চরিত্রগঠনে বিশেষ যত্ন নেওয়া হ'ত। তাছাড়া 'ডন সোসাইটি'র আরো দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও দেশপ্রেমের উদ্বোধন এখানকার সকল শিক্ষা-দীক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল। দেশের জন্য সর্বসমর্পণই ছিল দীক্ষার মূলমন্ত্র। দ্বিতীয়ত, হাতে-কলমে কারিগরি শিক্ষা ও স্বদেশী শিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনও সোসাইটির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। ১৯০৩ সালে শুধু ছাত্রদের তত্ত্বাবধানে একটি 'স্বদেশী ভাণ্ডার' পরিচালিত হ'ত। ছাত্রগণ নানা স্থান থেকে নানাপ্রকার কুটির-শিল্প-জাত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে আনত এবং প্রতিদিন বিকেলে তা বিক্রয় করত। এক বৎসরে প্রায় দশ হাজার টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি এই 'স্বদেশী ভাণ্ডার' থেকে বিক্রয় করা হয়েছিল।[৭৮]

পূর্বেই বলা হয়েছে, কার্জনের আক্রোশমূলক দমননীতি ছাত্রসমাজের ওপরই প্রমত্ত তাণ্ডব শুরু করে। 'কার্লাইল সার্কুলারে'র প্রতিবাদে কলিকাতায় 'সার্কুলার-বিরোধী সমিতি' গঠিত হয়। রংপুর জেলায় শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটের ছাত্রনির্যাতন যখন চরমে উঠল, তখন শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু নামে কলেজের একজন স্নাতকশ্রেণীর ছাত্র 'সার্কুলার-বিরোধী সমিতি'র সম্পাদক হলেন। তিনি ছিলেন একাধারে বাগ্মী ও সংগঠনদক্ষ কর্মী। প্রথম দিকে কলিকাতার রাস্তায় স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক গান গেয়ে প্রতিদিন শোভাযাত্রা এবং বিলাতি পণ্যদ্রব্যের দোকানে পিকেটিং করাই ছিল এই সমিতির প্রধান কৃত্য। কিন্তু ধীরে ধীরে সমিতির কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হতে লাগল। তার মধ্যে পাঁচটি প্রধান কর্ম হল :

১. যে-সব ছাত্র স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য স্কুল-কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

২. সংগীত ও শোভাযাত্রার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তার ভাবধারা ছড়িয়ে দেওয়া।

৩. বিলাতি পণ্য ক্রয়-বিক্রয় থেকে দেশবাসীকে প্রতিনিবৃত্ত করা।

৪. শহরে গ্রামে ঘরে ঘরে স্বদেশী বস্ত্রের সরবরাহ করা।

৫. সভাসমিতির আয়োজন করে স্বদেশী আন্দোলনকে জনপ্রিয় করা।"[১]

এই কর্মসূচীর প্রথম দফা থেকেই ধীরে ধীরে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ' গড়ে উঠল। এদিক দিয়ে 'ডন সোসাইটি'র ভূমিকার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাদেশিকতার প্রবর্তনে সতীশচন্দ্রের নেতৃত্বে এই 'সোসাইটি'র দান অবিস্মরণীয়। ১৯০৫ সালের ৫ই নভেম্বর 'সোসাইটি'র আহ্বানে জাতীয় শিক্ষা উদ্বোধনের জন্য এক বিরাট জনসভা আহূত হয়। তাতে প্রায় দু-হাজার ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, সতীশচন্দ্র এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই সভায় ভাষণ দেন। এর চার দিন পরে (৯ নভেম্বর, ১৯০৫) 'পান্তির মাঠে' আরেক জনসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সুবোধচন্দ্র মল্লিক জাতীয় শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে সম্মান জানালো। পরদিন ঘোষিত হল যে মৈমনসিংহ জেলার গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা দান করেছেন।

দু'দিন পরে [১১ই নভেম্বর] গোলদিঘিতে পাঁচ হাজারেরও বেশি ছাত্রদের সমাবেশে সভাপতি আশুতোষ চৌধুরী অনতিবিলম্বে জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ গঠন সম্পর্কে প্রধান নেতাদের এক সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব করলেন।

১৬ই নভেম্বর এই সম্মেলনের অধিবেশন হয়। তাতে যোগদান করেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, রাসবিহারী ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারকনাথ পালিত, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ, আব্দুল রসুল, নীলরতন সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, লালমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, মতিলাল ঘোষ, এবং সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এই সম্মেলনে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হল :

১. সর্বপ্রকার সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার জন্য একটি 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ' গঠিত হোক।

২. ছাত্রগণ যে পরীক্ষা বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাতে তাঁদের স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু দেশের স্বার্থের বিষয় বিবেচনা করে তাঁদের পরীক্ষা দেওয়াই সমীচীন বলে সম্মেলন মনে করে।

এই সম্মেলনে ঘোষিত হয় যে, সুবোধচন্দ্র মল্লিক এবং ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আরেক ধনাঢ্য পুরুষ নগদ দু'লক্ষ টাকা এবং একটি বড় বাড়ি 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদে'র জন্য দান করেছেন। আরেক জন বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এই 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ' গঠনের প্রাথমিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ওপর। পরিষদের শিক্ষাদানের মূলনীতির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল এই যে, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা—সবরকম শিক্ষারই মাধ্যম হবে বাঙালীর মাতৃভাষা বাংলা।

'জাতীয় শিক্ষা পরিষদে'র প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে দুটি মত সেদিন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রথম দল ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ বর্জনের পক্ষে। দ্বিতীয় দল চেয়েছিলেন এই পরিষদের অধীনে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে তা হবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিপূরক। তার ফলে ১৯০৬ সালের ১লা জুন একই দিনে 'National Council of Education' বা 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ' এবং 'Society for the Promotion of Technical Education' বা 'প্রযুক্তিবিজ্ঞান উন্নতি-বিধায়ক সমিতি'—এই দুটি প্রতিষ্ঠান পৃথক পৃথক ভাবে রেজিস্ট্রি করা হল। নেতৃবৃন্দের মধ্যে আদর্শগত মতভেদ থাকলেও বিরোধ বা বিদ্বেষের লেশমাত্রও ছিল না। তারই ফলে ১৯১০ সালে দুটি প্রতিষ্ঠান একীভূত হয়ে দুটি শাখায় পরিণত হল : 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ' ও 'বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটুট'। ভারত স্বাধীন হবার পরে এই 'জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে'র ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়'।

সেদিন বাঙালীর যৌবনজলতরঙ্গ রোধ করবার শক্তি বিদেশী শাসকবর্গের ছিল না। তাদের কূটনীতি, শূন্যগর্ভ আস্ফালন এবং পৈশাচিক দমননীতির বিরুদ্ধে বাংলার ছাত্রসমাজ, বাংলার নেতৃবৃন্দ এবং বাংলার জাতীয় সংবাদপত্র যে ভীতিলেশহীন দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন তা সারা ভারতেই ছিল অভূতপূর্ব। সংবাদপত্রগুলি সারা দেশময় জাতীয় জাগরণের অগ্নিমন্ত্র প্রচার করতে লাগল। সবচেয়ে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। তিনি তাঁর সম্পাদিত ইংরেজি দৈনিকপত্রের নামকরণ করলেন 'বন্দে মাতরম্'। 'অনুশীলন' সমিতির মুখপত্র ছিল বাংলা 'যুগান্তর'। অরবিন্দ ঘোষ বরোদা ছেড়ে যখন কলিকাতায় এলেন তখন বাংলা ও ইংরেজিতে তাঁর অগ্নিবর্ষী রচনা 'যুগান্তর' ও 'বন্দে মাতরম্'-এ প্রকাশিত হতে লাগল। এই ভাবধারার পূর্বসূরি ছিল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা'। 'বন্দে মাতরম্'

ইংরেজি পত্রিকা ছিল বলে তার প্রচার ছিল সারা ভারত জুড়ে। স্বভাবতই তার ভাষা ছিল অপেক্ষাকৃত সংযত, কিন্তু 'যুগান্তর' খোলাখুলিভাবেই বিপ্লবের মন্ত্রে তরুণসমাজকে উদ্দীপিত করতে লাগল।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিকে জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ আন্তরিকতার সঙ্গেই তাঁদের হিন্দু ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। সুমিত সরকার তাঁর গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে 'হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে'র আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বের নাম 'The Muslims and the Swadeshi Movement.' তাতে গ্রন্থকার বলেছেন, 'Some amount of Muslim participation can in fact be traced in virtually every aspect of the Swadeshi movement.' উদাহরণ হিসাবে তিনি বলেছেন, গজনবির 'ইউনাইটেড বেঙ্গল কোম্পানি', বগুড়ার নবাব ও গজনবির মিলিত চেষ্টায় 'বেঙ্গল হোসিয়ারি কোম্পানি', এবং চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের সমবেত প্রয়াসে গড়ে-ওঠা 'বেঙ্গল স্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানি' স্বদেশীযুগে মুসলিম সংগঠনের স্মরণীয় উদাহরণ। কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে যাঁরা প্রথম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার আহ্বান করেন তাঁদের মধ্যে আব্দুল রসুলের নাম অবশ্যই করতে হবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ৯২-সদস্যের 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন'-এর ছজন সদস্য ছিলেন মুসলমান। ১৯০৬ সালের 'ঈস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে' ধর্মঘটে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে আবুল হোসেন ও লিযাকৎ হোসেনের নাম অগ্রগণ্য। রাখীবন্ধন, জাতীয় ভাণ্ডার প্রভৃতির আবেদনে যে সকল মুসলমান জমিদার এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে বগুড়ার আব্দুস সোভান চৌধুরী এবং ঢাকার নবাবের ভ্রাতা খাজা আতিকুল্লার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা কর্তব্য। আতিকুল্লাই কলিকাতা কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গবিরোধী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাছাড়া 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহমেডান এসোসিয়েশনে'র সভাপতি খান বাহাদুর মহম্মদ ইউসুফ ১৯০৬ সালের ১৬ অক্টোবর ফেডারেশন হলে যে স্বদেশী সমাবেশ হয় তার সভাপতিত্ব করেন। বরিশালের চৌধুরী গোলাম আলি মোল্লা ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালে রাখীবন্ধন আবেদনে স্বাক্ষর যোজনা করেন। এই জেলারই আরেক মুসলিম জমিদার সৈয়দ মোতাহার হোসেন ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে 'স্বদেশী বান্ধব সমিতি'র প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রায় এক হাজার মুসলমান জমিদার, তালুকদার, জোতদার, ব্যবসায়ী ও অন্যান্যরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে

স্মারকপত্রে স্বাক্ষর করেন তাঁদের মধ্যে প্রথমে ছিলেন ফরিদপুরের চৌধুরী আলিমুজ্জমান।

মুসলিম নেতৃবৃন্দের দ্বিতীয় স্তরে ছিলেন বর্ধমানের আবুল কাসেম, টাঙ্গাইলের জমিদার আব্দুল হালিম গজনবি এবং কলিকাতার ইংগ-মুসলিম সমাজভুক্ত ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল। বয়কট-আন্দোলনে গজনবির নাম যেমন বিশেষভাবে করতে হবে, তেমনি কুমিল্লার আব্দুল রসুলের কলিকাতাস্থ ১৪ নং রয়েড স্ট্রীটের বাসগৃহ ছিল 'বেঙ্গল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র মুখ্য মিলনসত্র।

তৃতীয় স্তরের মুসলিম স্বদেশী আন্দোলনকারীরা ছিলেন সমাজের অপেক্ষাকৃত সাধারণ শ্রেণীর মানুষ। সরকারী নথিপত্রে এঁদের নিন্দিত করে বলা হয়েছিল 'ভাড়াটে বক্তা'। কিন্তু এ অপবাদ যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল তা বলাই বাহুল্য। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দীন মহম্মদ, দেদার বক্স, হেদায়েৎ বক্স, মৌলবী মনিরুজ্জমান, কবি সৈয়দ আবু মহম্মদ ইসমাইল, হোসেন সিরাজী, আবুল হোসেন এবং আব্দুল গফুর। কিন্তু স্বদেশী যুগের মুসলিম বক্তা ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে যিনি সবার উপরে মস্তক উত্তোলন করেছিলেন তিনি হলেন পাটনার লিয়াকৎ হোসেন। 'সার্কুলার-বিরোধী সমিতি'র সক্রিয় সদস্য, স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকদল গঠনে প্রধান উদ্যোক্তা এবং রেলওয়ে ধর্মঘটের শক্তিশালী বক্তা হিসাবে নরমপন্থীদের সংস্রব পরিত্যাগ করে ১৯০৬-৭ সালে লিয়াকৎ হোসেন বিপিনচন্দ্র পাল এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের পাশে সগৌরবে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন।[৮৮]

কিন্তু বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোই ছিল কার্জনের কূটনীতি। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমেই হাত করলেন ঢাকার নবাবকে। নামমাত্র সুদে ১৪ লক্ষ টাকা ধার দিয়ে নবাব সলিমুল্লাকে বশীভূত করা হল। তবু বঙ্গভঙ্গের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে বিপুল উৎসাহে বাংলার সর্বত্র সভাসমিতির অধিবেশন হল। ঢাকা শহরে দু'টি শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ ছিল। জনসভায় নবাব-পরিবারেরই একজন সভাপতিত্ব করেছিলেন।

কিন্তু সরকারী বিভেদসৃষ্টির দুর্নীতিতে উসকানি দেবার মতো কিছু কিছু নেতাও ছিলেন। তাঁদের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী এবং বঙ্গভঙ্গের সমর্থক মুসলমানের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। এই সময় আলিগড়ের প্রসিদ্ধ নেতা সৈয়দ আহমদ মুসলমান সম্প্রদায়কে ভিন্ন জাতি-রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি ঢাকায় এসে

মুসলমান নেতৃবৃন্দের এক সভা আহ্বান করলেন। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা হলেন এই আন্দোলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯০৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 'মুসলিম লীগে'র প্রতিষ্ঠা হল।[৮১]

তার পরের ইতিহাস লজ্জা ও বেদনার। বিভেদকামী লীগপন্থীদের উস্কানিতে পূর্ববঙ্গের মুসলমান ভাইদের হাতে হিন্দু ভাইবোনেরা লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হতে লাগলেন। সেই দুঃখের কাহিনী ইতিহাসে লিপিবন্ধ হয়ে আছে। পরবর্তী চল্লিশ বৎসর একদিকে যেমন জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা হিন্দু ভাইদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন, তেমনি স্বাতন্ত্র্যকামী লীগপন্থীরা ভিন্ন জাতীয়তার দাবিতে শেষ পর্যন্ত হিন্দু মুসলমানের মিলিত ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে পরিণত করেছেন। লীগপন্থীদের স্বাতন্ত্র্যের দাবি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে প্রথম স্বীকৃত হল ১৯০৯ সালের ২৫শে মে 'ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ আইনে'। তাতে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের দাবি বিধিবন্ধ করা হল।

১৫

কিন্তু বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে নাকচ করার জন্য ১৯০৫ সাল থেকে বাংলায় যে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল তার উত্তাল তরঙ্গ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল।

বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে মাদ্রাজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁর মাধ্যমেই দক্ষিণ ভারতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জয়ধ্বনি 'বন্দে মাতরম্' এবং স্বদেশী-গ্রহণ-সংকল্প প্রচারিত হয়। মাদ্রাজের প্রখ্যাতনামা কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে প্রবুদ্ধ হলেন। তিনি ছিলেন ভগিনী নিবেদিতার ভক্ত। নিবেদিতার অনুপ্রেরণাতেই তিনি প্রথম লিখলেন 'জয় বাংলা'। তারপর তাঁর তিনটি গীতিকবিতা 'বন্দে মাতরম্', 'নমো ভারত' এবং 'ভারত আমাদের দেশ' বিখ্যাত প্রকাশক জি. এ. নটেশন বিনামূল্যে পনেরো হাজার কপি মুদ্রিত করে প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। মাদ্রাজের স্বদেশসেবক সুরেন্দ্রনাথ আয়ারও হাটে-বাজারে সভা আহ্বান করে মাদ্রাজ-বাসীকে স্বদেশীমন্ত্রে দীক্ষা দিতে লাগলেন। স্বদেশী আন্দোলনের আরেকটি প্রধান কেন্দ্র ছিল তুতিকোরিন। বহু বৎসর ধরে তুতিকোরিন ও কলম্বোর মধ্যে স্টিমার যোগাযোগ ছিল: এই সমুদ্রপথে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্টিম

ন্যাভিগেশন কোম্পানি'র স্টিমারই চলত। তারা যাত্রীদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাদের কাছে চড়া ভাড়া আদায় করত। বাংলার 'বন্দে মাতরম্' আন্দোলন বঙ্গোপসাগরের ঊর্মিমালায় মাদ্রাজে উপনীত হবার পর বিদেশী কোম্পানির এই একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ হল। ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে 'স্বদেশী স্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পানি'র জন্ম হল। বিলিতি জাহাজ কোম্পানি তাদের ভাড়া কমাতে বাধ্য হল, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে তারা পরাস্ত হল। ক্রমে ক্রমে এই স্বদেশী আন্দোলন ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ল। 'বন্দে মাতরম্' হল আন্দোলনকারীদের কণ্ঠের বুলি। একটি পনেরো বছরের বালক 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট কক্স বালককে বেত্রদণ্ডের আদেশ দিলেন। এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে হল হরতাল। তুতিকোরিন থেকে হাজার হাজার লোক এল তিনেভেলিতে। তারা তুমুল আন্দোলন শুরু করল। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় অচল হয়ে পড়ল। হরতালে চার হাজার লোক যোগ দিয়েছিল, তার মধ্যে বেশির ভাগই ছাত্র।

দক্ষিণ ভারতের এই আন্দোলন কিছুদিনের মধ্যেই পশ্চিম ভারতে পেঁছিল। পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও সেই প্রেরণায় হল প্রবুদ্ধ। 'টাইমস' পত্রিকা লিখল, ভারতবাসী 'বন্দে মাতরম্'কে তাদের কণ্ঠের বুলি করে নিয়েছে। 'বন্দে মাতরমে'র অর্থ মাকে বন্দনা করি। দেশমাতার নামে এটি ভক্ত সন্তানের জয়ধ্বনি। এই মাতৃমন্ত্রকে পুলিশী শাসনে কি স্তব্ধ কবা যাবে? কোটি কোটি ভারতবাসীর কন্ঠ মূক করে দেবার মত কত পুলিশ আছে ব্রিটিশ সরকারেব?

পঞ্জাবে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিক্রমা বিশেষ ফলপ্রসূ হল। বাংলার সঙ্গে লালা লাজপৎ রায়ের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বাংলার আন্দোলনকে পঞ্জাবে ছড়িয়ে দিল। তিনি উর্দুভাষায় 'বন্দে মাতরম্' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করলেন।

রাওয়ালপিণ্ডিতে স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় অনেককে গ্রেপ্তার করা হল। সংবাদটি লাহোরে পেঁছবার সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রতিবাদসভার আয়োজন করা হল এবং শোভাযাত্রা বেরলো। শোভাযাত্রীদের লক্ষ্য ছিল সাহেবপাড়ায় গিয়ে প্রতিবাদ জানানো। কিন্তু পুলিশ আনারকলিতে তাদের ঘেরাও করে রাখল। শোভাযাত্রীরা কিছুতেই পশ্চাৎপদ না হওয়ায় অশ্বারোহী বাহিনী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, সঙ্গে চলল বেপরোয়া লাঠিচালনা। এই ভাবেই পঞ্জাবের শহরে ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল বাংলার আন্দোলন।

মহারাষ্ট্রের নেতা তিলক ছিলেন বিদ্রোহী বাংলার প্রধান সমর্থক। তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় তিনি প্রথম থেকেই বাংলার আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। তিলকই 'শিবাজি উৎসবে'র প্রতিষ্ঠাতা। বাংলায় শিবাজি উৎসব তাঁর প্রেরণাতেই প্রতিপালিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ১৩১১ সালে [১৯০৪] রচিত রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজি উৎসব' কবিতাটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। তার শেষ স্তবকে কবি বলছেন,

মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো,
'জয়তু শিবাজি'।
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।

শিবাজির উপাস্যা দেবী ছিলেন 'ভবানী'। অরবিন্দ ঘোষ এবং তাঁর অনুজ বারীন ঘোষ 'ভবানী মন্দিরে' ভারত-মাতাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বঙ্গেতে 'বন্দে মাতরম্' দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। পুনা থেকে 'বন্দে মাতরম্' নামে যে সংবাদপত্র প্রকাশিত হল তাতে বাংলার বিপ্লববহ্নিই নবরূপে দেশবাসীর চিত্তকে অনুরঞ্জিত করতে লাগল। মহারাষ্ট্রের যুবসমাজ আন্দোলনের সম্মুখ সারিতে এগিয়ে এলেন। তিলক ও সাভারকরের নেতৃত্বে বিলিতি বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব হল। শাসকদের নিষেধ সত্ত্বেও নাগপুরের নীলসিটি স্কুলের ছাত্ররা স্বদেশী সভায় যোগদান করে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত গান করায় অধ্যক্ষ তাদের 'রিস্‌লি সার্কুলার' পড়ে শোনালেন। জনৈক ইন্‌স্‌পেক্টর তদন্তে গিয়ে দশম শ্রেণীতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা সমবেত ভাবে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিতে লাগল। পরের ক্লাসেও ঘটল একই ঘটনা। ক্রোধান্ধ ইন্‌স্‌পেক্টর আদেশ দিলেন, কে প্রথম এই ধ্বনি উচ্চারণ করেছিল তার নাম বলতে হবে। তাকে কিছুতেই খুঁজে না পাওয়ায় নবম ও দশমশ্রেণীর সব ছাত্রকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হল। তারা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে স্কুল থেকে বেরিয়ে গেল। মাস দুই পরে অধ্যক্ষ তাদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলেন।

১৯০৮ সালের জুন মাসে লোকমান্য তিলক গ্রেপ্তার হলেন। তাঁর ছয় বৎসর নির্বাসন দণ্ড হল। ২৯ জুন তাঁর বিচারের দিন পুলিশ-আদালতের

চারপাশে বিরাট জনতা ঘন ঘন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিতে লাগল। সহস্র কণ্ঠে 'তিলক মহারাজের জয়'-ধ্বনিও আকাশ বিদীর্ণ করল। বিকেল তিনটের সময় অশ্বারোহী বাহিনী আহ্বান করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা হল।

সেপ্টেম্বরে ছিল 'গণপতি' পূজা। পূজার মণ্ডপে তিলকের ফোটো টাঙানো হল। মণ্ডপে মণ্ডপে 'বন্দে মাতরম্' ও 'ভারতমাতা কি জয়' ধ্বনি উৎসবের অঙ্গীভূত হল।

হায়দ্রাবাদে একটি ব্যায়ামাগারকে কেন্দ্র করে তিলকের অনুরক্ত যুবকেরা স্বদেশী আন্দোলনের বাণী প্রচার করতে লাগল। তারা তিলক ও বিপিনচন্দ্র পালের রচনা পুস্তিকাকারে প্রকাশ ও প্রচার করতে লাগল। তাদের শ্লোগান ছিল—'স্বদেশী ব্যবহার কর', তাদের প্রাণের গান ছিল 'বন্দে মাতরম্'।

পুনা থেকে স্বদেশী আন্দোলন এল কর্নাটকে। কর্নাটকের উচ্চ-শিক্ষার্থী যুবকেরা পুনায় পড়তে যেত। তারা তিলকের 'কেশরী' পত্রিকা কানাড়ি ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করতে লাগল। তাছাড়া কর্নাটকে ১৯০৫ সালের আগেই 'বন্দে মাতরম্' গান বহুল পরিচিত ছিল। ভেঙ্কটাচার্য কানাড়ি ভাষায় পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের অনুবাদ করেছিলেন।

ধীরে ধীরে ভারতের সেনাবাহিনীতেও 'বন্দে মাতরম্'-এর অনুপ্রবেশ ঘটতে লাগল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'উত্তরবঙ্গে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের একটি সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। যখন 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া হতে লাগল তখন বাহিনীর ব্রিটিশ কর্মাধ্যক্ষেরা অন্য সকলের সঙ্গে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হলেন। ব্রিটিশ রাজের উর্দিপরা সেনারা যখন বিভিন্ন সহরে যেত তখন নাগরিকগণ তাদের সংবর্ধনা জানাতো 'বন্দে মাতরম্' বলে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যখন বাহিনীতে লোকনিয়োগ করা হচ্ছিল তখন উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ অফিসারদের শুনিয়ে শুনিয়েই তারা বলেছে, জার্মান বাহিনীর 'ট্রেঞ্চ' আক্রমণের সময় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করলেই তারা সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হবে।'[৮২]

৯৬

শুধু ভারতেই নয়, ভারতের বাইরেও 'বন্দে মাতরম্'-এর জয়যাত্রা শুরু হল। তখন সাভারকর এবং হরদয়াল ব্রিটেনে রয়েছেন। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের 'সুবর্ণজয়ন্তী' অনুষ্ঠিত হল ১৯০৮ সালের ১০ই মে। নিমন্ত্রণ-পত্রের শিরোনামায় স্থান পেল 'বন্দে মাতরম্'। সভা শুরু হল 'বন্দে মাতরম্'

সংগীত দিয়ে। সভাকক্ষ থেকে ঘন ঘন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দশদিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। লণ্ডনস্থ ভারতীয় যুবকেরা ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মারক হিসাবে বুকে 'বন্দে মাতরম্' লেখা অভিজ্ঞান লাগিয়ে সদর্পে ব্রিটিশ রাজধানীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। কলেজেও ভারতীয় যুবকেরা যখন ওই অভিজ্ঞান নিয়ে প্রবেশ করল তখন স্বভাবতই অধ্যক্ষ আপত্তি জানালেন। তাঁর আপত্তিতে ছাত্ররা কর্ণপাত না করায় তিনি সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে নানা রকম কটূক্তি করতে লাগলেন। তরুণ ছাত্রদের পক্ষে তা অসহ্য হল। তারা কলেজ বর্জন করল। মদনলাল ধিংরা অভিজ্ঞান নিয়েই কলেজে গিয়েছিল। অধ্যাপক এবং শ্বেতাঙ্গ ছাত্ররা তা পরিত্যাগ করার দাবি জানালো। সে তাতে ভ্রুক্ষেপমাত্র করল না। তখন শ্বেতাঙ্গ ছাত্ররা উৎকট ও কুৎসিত আচরণ আরম্ভ করল। অভীক্ মদনলাল একটি ছেলেকে পাকড়াও করে তার বুকের উপর চেপে বলল, 'সাবধান, বাড়াবাড়ি করো তো তোমার গলা কেটে দেব'। শ্বেতাঙ্গ ছাত্ররা ভয়ে পিছিয়ে গেল। তারপর এই বীর ভারতীয় যুবককে আর কেউ স্পর্শ করারও সাহস করেনি। প্রায় এক বছর পরে মদনলালই সৃষ্টি করল এক নতুন ইতিহাস। লণ্ডনের জাহাঙ্গীর হলে হত্যা করল কুখ্যাত ইংরেজ-শাসক কার্জন ওয়াইলিকে। আদালতে বিচারপতির সামনে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল 'বন্দে মাতরম্'। বিচারে এই বীর যুবকের ফাঁসির আদেশ হল। ফাঁসিকাষ্ঠে চড়ে তার কণ্ঠ থেকে অন্তিম বাণী নির্গত হল 'বন্দে মাতরম্'।

যখন অরবিন্দের 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা শাসকবর্গ বন্ধ করে দিল তখন ফ্রান্সে ভারতের বিপ্লবিনী শ্রীমতী ভিখাজী রুস্তম কামা এবং বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন ভারতীয় মিলে প্যারিসে ওই নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। প্যারিসেই তৈরি হল ভারতের জাতীয় পতাকা। অবশ্য তার আগে ভগিনী নিবেদিতা ভারতের একটি জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন 'মডার্ন রিভিয়ু'তে। মাদাম কামার নেতৃত্বে প্যারিসে যে পতাকা প্রস্তুত হল তার বুকে দেবনাগরী হরফে লেখা হল 'বন্দে মাতরম্'।

শুধু ব্রিটেন এবং ফ্রান্সেই নয়। 'বন্দে মাতরম্'-এর ঢেউ অতলান্তিক মহাসমুদ্র পার হয়ে পৌঁছল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে। গদর আন্দোলনের নেতারা যখন কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রে মিলিত হতেন তখন তাঁদের পারস্পরিক অভিবাদনবাণী ছিল 'বন্দে মাতরম্'।

৯৭

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল বারাণসীতে, ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে। সেই অধিবেশনে বহুজনের আন্তরিক অনুরোধে গোখলে শেষ পর্যন্ত আহ্বান করলেন সরলা দেবীকে 'বন্দে মাতরম্' গান গাইতে। এই সম্পর্কে সরলা দেবী তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনের ঝরাপাতা'য় লিখেছেন :

'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথম দুটি পদে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] সুর দিয়েছিলেন নিজে। তখনকার দিনে শুধু সেই দুটি পদই গাওয়া হ'ত। একদিন আমার উপর ভার দিলেন—'বাকী কথাগুলিতে তুই সুর বসা।' তাই ত্রিংশকোটিকণ্ঠ কলকলনিনাদকরালে থেকে শেষ পর্যন্ত কথায় প্রথমাংশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আমি সুর দিলুম। তিনি শুনে খুশী হলেন। সমস্ত গানটা তখন থেকে চালু হল'।[৮৩]

সরলা দেবী পুনশ্চ লিখেছেন, 'বন্দে মাতরম্' শব্দটি মন্ত্র হল সব প্রথম যখন মৈমনসিংহের 'সুহৃৎ সমিতি' আমাকে স্টেশন থেকে তাদের সভায় প্রসেশন করে নিয়ে যাবার সময় ঐ শব্দ দুটি হুংকার করে যেতে থাকল। সেই থেকে সারা বাংলায় এবং ক্রমে ক্রমে সারা ভারতবর্ষে ঐ মন্ত্রটি ছড়িয়ে পড়ল—বিশেষ পূর্ববঙ্গে যখন গবর্নর সাহেবের অত্যাচার আরম্ভ হল, আহিমালয়-কুমারিকা ঐ বোলটি ধরে নিলে।

'আমার বিয়ের পর গোখলের সভাপতিত্বে বেনারস কংগ্রেসে প্যাণ্ডেলের দোতলায় মেয়েদের মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলুম। আমার পাশে ছিলেন লেডি অবলা বসু। হঠাৎ সভা থেকে গোখলের কাছে অনুরোধ গেল আমাকে দিয়ে 'বন্দে মাতরম্' গাওয়ানর জন্যে। গোখলে পড়লেন বিপদে। তার কিছু আগে বাঙলাদেশে কোথাও কোথাও ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা 'বন্দে মাতরম্' সভাসমিতিতে গাওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে। তিনি সাবধানপন্থী। গবর্নমেণ্টের সঙ্গে ভাব রেখে কাজ করতে চান্। গবর্নমেণ্টের আদেশের বিরুদ্ধে কিছু করতে চান না। কিন্তু কি করবেন? ভারতের সর্বপ্রদেশ থেকে সমাগত প্রতিনিধিদের 'বন্দে মাতরম্' শোনার তীব্র ইচ্ছা কিছুতেই নিরোধ করতে পারলেন না। তখন গোখলে আমার কাছে একটি ক্ষুদ্র লিপি পাঠালেন গাইতে অনুরোধ করে—সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন—সময় সংক্ষেপ, সুতরাং দীর্ঘগানের সবটা না গেয়ে ছেঁটে গাই যেন। কোন অংশটা তাঁর অভিপ্রেত ছিল জানিনে, আমি মাঝখানে একটু ছেঁটে চট করে 'সপ্ত কোটি'র স্থলে 'ত্রিংশ কোটি' বলে

সমগ্রটা গাওয়ারই ফল শ্রোতাদের কাছে ধরে দিলুম, তাঁদের প্রাণ আলোড়িত হয়ে উঠল। ভারতের প্রান্ত প্রান্ত থেকে সমাসীন দেশভক্তদের মধ্যে আজও যাঁরা জীবিত আছেন—সেদিনকার গান ভুলতে পারেন নি।'[৮৪]

সরলা দেবীই বঙ্কিমচন্দ্রের 'সপ্তকোটি'কে প্রথম 'ত্রিংশকোটি'তে পরিণত করেছিলেন। পূর্বেই বলেছি যে, বাংলার দেশাত্মবোধ প্রথম থেকেই দুটি প্রবাহে প্রবাহিত হয়েছে। বঙ্গভূমি ও ভারতভূমি ; কখনো যুক্তবেণী, কখনো মুক্তবেণী। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, 'হিন্দু মেলা'র দ্বিতীয় অধিবেশনে ১৮৬৮ সালে গীত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ''মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মনঃপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান' গানটিই প্রথম সার্থক ভারতসংগীত। এই গানেই ভারতের প্রথম আই. সি. এস. সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন

হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

মেজমামার এই ভারত-সংগীতের প্রেরণায় তাঁর ভাগিনেয়ী সরলা দেবী সপ্তকোটি বাঙালীকে ত্রিংশকোটি ভারতবাসীর স্বদেশচেতনায় সম্প্রসারিত করেছিলেন।

কংগ্রেসমণ্ডপে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গান করেন তাঁর সর্বোত্তম উত্তরসূরি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' গানে নিজেই সুর দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখে গেয়েছিলেন। সেই সুরেই তিনি ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে গানটি গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য গানের প্রথম দুটি কলি—অর্থাৎ 'সুখদাং বরদাং মাতরম্' পর্যন্ত সাতটি পংক্তিতে সুর দিয়েছিলেন। স্বরবিতান ষট্‌চত্বারিংশ খণ্ডে তাঁর প্রদত্ত সুরের স্বরলিপি দেওয়া আছে।[৮৫] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার থেকে সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' নামে শিশুদের জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চব্বিশ বৎসর। এই পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় 'গান-অভ্যাস' বিভাগে হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভাসুন্দরী দেবীর নামে যে-দুটি গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয় তার একটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথম সাত পংক্তি। প্রতিভাসুন্দরী লিখেছেন, 'বন্দে মাতরম্' নামক বিখ্যাত গানটির সমস্তটা দেওয়া গেল না। কারণ উক্ত গানের সুর অত্যন্ত কঠিন, সমস্তটা দিলে পাঠকের সহজে আয়ত্ত

হইবে না। 'বন্দে মাতরম্' গানে বিস্তর অলংকার লাগিয়াছে।' 'বালক' পত্রিকায় এই গানটির সঙ্গে সুজলা সুফলা বহুসন্তানপরিবৃতা বঙ্গজননীর একটি পূর্ণ পৃষ্ঠাব্যাপী ছবি আছে। ছবিটি হরিশ্চন্দ্রের আঁকা। এই ছবিতে বঙ্গজননীর যে মূর্তি অংকিত হয়েছে তাতে দেবীভাব বিন্দুমাত্র নেই, ইনি নিতান্তই দ্বিভুজা প্রাকৃত বঙ্গজননী।

'বালকে' প্রকাশিত 'বন্দে মাতরম্' গানের পরিচয়ে বলা হয়েছে : 'রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালি।' সরলা দেবীর 'শতগান' গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ ১৩০৭ বৈশাখ) ঐ অংশের সুরতালের পরিচয়ে বলা হয়েছে 'রাগিণী দেশ—একতালা', সুরকারের নাম রবীন্দ্রনাথ। 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'তাল-পরিচয়ে কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও গানের স্বীকৃত আংশিক পাঠ এবং রাগিণীর ঐক্যের কথা ভাবলে মনে হয় 'বালকে' প্রকাশিত সুরও সম্ভবত রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া।'[৮৬]

১৯০৬ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় কলিকাতায়। তার আগে পাঁচ সালেই কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী—দু'দলে বিভক্ত হয়েছিল। কলিকাতা কংগ্রেসে তার প্রমাণ পাওয়া গেল সভাপতি-নির্বাচনে। শেষ পর্যন্ত দাদাভাই নৌরজিকেই সভাপতিত্বে বরণ করা হল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন রাসবিহারী ঘোষ। তিনি তাঁর অভিভাষণে সে সময়কার বাংলার শাসনব্যবস্থাকে রাশিয়ার জারের নির্মম শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করেন। সভাপতির ভাষণে দাদাভাই নৌরজি বললেন, 'আন্দোলন কর, আন্দোলন কর, আন্দোলনের তরঙ্গ-হিল্লোলে আসমুদ্র হিমাচল কাঁপিয়ে তোল।' ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্পর্কে তিনি বললেন, তা হবে গ্রেটব্রিটেন ও স্বাধিকারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ উপনিবেশের অনুরূপ শাসনতন্ত্র, এক কথায় যার নাম 'স্বরাজ'। কংগ্রেস-সত্র থেকে 'স্বরাজ' কথাটি এই প্রথম উচ্চারিত হল।[৮৭]

কিন্তু বড়লাট লর্ড মিণ্টো এবং ভারতসচিব লর্ড মর্লি—উভয়ে মিলে তখন থেকেই মর্লি-মিণ্টো শাসনসংস্কারের যে পরিকল্পনা করছিলেন তার পরিসমাপ্তি ঘটল ১৯০৯ সালে পার্লামেণ্টে 'ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ আইন' বিধিবদ্ধ হয়ে ; সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

১৮

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রোধ হল। সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লি দরবারে তা ঘোষণা করলেন। বিদেশী শাসকবর্গের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বাংলা তথা

ভারতের প্রথম সক্রিয় আন্দোলন জয়যুক্ত হল। সেদিনকার প্রবলপ্রতাপান্বিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিদ্রোহী বাঙালীর কাছে মস্তক অবনত করতে বাধ্য হল। অবশ্য ব্রিটিশের কুটিল কূটনীতির ফলে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ দেখা দিল। তারই অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে 'স্বদেশী আন্দোলন' ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্মের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হতে লাগল। কিন্তু একথা অবশ্যই স্মরণীয় যে, জাতীয়তাবাদী মুসলমানসমাজ চিরদিনই তাঁদের হিন্দু ভাইদের সঙ্গে একযোগে ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু শাসকবর্গের প্ররোচনায় লীগপন্থীরা স্বতন্ত্র পথে চলতে লাগলেন। তারই পরিণামে 'হিন্দু জাতীয়তাবাদের' উদ্ভব হল। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে তখনো মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ঘটেনি। তথাপি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, বিশেষ করে অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে বরিশালের সার্বভৌম আন্দোলন অহিংসার মন্ত্রে অবিচলিত থেকেই পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ আমলাদের বর্বরোচিত পৈশাচিক নির্যাতনে সেদিনকার বিপ্লবী তরুণেরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথেই অগ্রসর হলেন। তারই পরিণাম ঘটল সন্ত্রাসবাদে।

সুমিত সরকার তাঁর গবেষণাগ্রন্থে স্বদেশী যুগের আন্দোলনকারীদের চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন: ১. নরমপন্থী বা Moderates; ২. সংগঠনপন্থী স্বদেশী, তাঁর ভাষায় 'Constructive Swadeshi'; ৩ বয়কট ও প্রতিরোধপন্থী; এবং ৪. সন্ত্রাসবাদী।[৮৮]

কিন্তু আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিতে আন্দোলনকারীদের মধ্যে কোনো ইতর-বিশেষ ছিল বলে মনে হয় না। ১৯০৮ সালের ১১ ডিসেম্বর 'Indian Criminal Law Amendment Act' পাশ হল এবং ঐদিনই কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, মনোরঞ্জন গুহ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জি, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ভূপেশচন্দ্র নাগ এবং পুলিনবিহারী দাসের নির্বাসনের আদেশ হল।

সপ্তাহ তিনেক পরে, ১৯০৯ সালের ৫ই জানুয়ারি বরিশালের 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি,' ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি,' ফরিদপুরের 'ব্রতী সমিতি', মৈমনসিংহের 'সুহৃৎ সমিতি' এবং 'সাধনা সমাজ' নিষিদ্ধ ঘোষিত হল।[৮৯]

১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ এলেন ভারতে। কংগ্রেস তখন নরম-পন্থীদের দখলে। কংগ্রেস-অধিবেশনেও সম্রাটের সংবর্ধনার ব্যবস্থা হল।

১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর পঞ্চম জর্জ দিল্লীর দরবারে বাংলা বিভাগের অবসান ঘোষণা করেন। তার দু' সপ্তাহ পরে—২৬, ২৭, ২৮ ডিসেম্বর

কলিকাতা কংগ্রেসের ষড়্‌বিংশ অধিবেশন বসে। পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৯০৭-এর দক্ষযজ্ঞের পর বৎসর-কয়েক কংগ্রেস ছিল নরমপন্থীদের দখলে। পঞ্চম জর্জের ঘোষণায় বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়েছে, এতে উৎফুল্ল হয়ে কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতারা স্থির করলেন, কংগ্রেসমণ্ডপ থেকেই সম্রাটের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে রাজদম্পতিকে স্বাগত সম্ভাষণ জানানো হবে। এই উপলক্ষে একটি প্রশস্তি-সংগীত রচনার অনুরোধ এল রবীন্দ্রনাথের কাছে। অনুরোধ জানালেন কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভাদেবীর স্বামী আশুতোষ চৌধুরী। তিনি ছিলেন রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। এটা পরম দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, রাজভক্ত আশুতোষ বুঝতে পারেন নি যে, এ ধরনের অনুরোধ কবির কাছে করা অমার্জনীয় অপরাধ। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার সম্পর্কে সামান্য ধারণাও যাঁর আছে তিনি কিছুতেই এরকম অনুরোধ কবিকে করতে পারেন না। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত ও বিরক্ত হলেন। এই প্রসঙ্গে ১৩০৫ সালের আশ্বিন মাসে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'রাজটিকা' গল্পের খেতাবপ্রত্যাশীর বিড়ম্বনার কথা রসিকগণের মনে পড়বে। যাই হোক, স্নেহাস্পদ আত্মীয়ের অনুরোধে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ায় জন্ম হল ভারতের অন্যতর জাতীয় সংগীত 'জনগণমন-অধিনায়ক'। এই প্রসঙ্গে ১৯৩৭ সালে লীগপন্থী মুসলমানদের প্রতিবাদের ফলে যখন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে 'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন হল, এবং রবীন্দ্রনাথও বন্দে মাতরম্ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করলেন, তখন টেনে আনা হল 'জনগণমন-অধিনায়ক'-এর জন্মকালীন ইতিহাসকে। আশুতোষ চৌধুরীর অনুরোধের উল্লেখ করে কবির বিরুদ্ধে কুৎসার বান ডাকল। সেই সময় পুলিনবিহারী সেন কবিকে একখানি পত্র লিখলেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন :

'রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান্ আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্য আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, এই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমন-অধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগযুগ-ধাবিত যাত্রীদের যিনি চির-সারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক, সেই যুগান্তরের মানব-ভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনোক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেননা তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক, বুদ্ধির অভাব ছিল না।'[২০]

পুলিনবিহারী সেনকে লেখা এই চিঠির তারিখ হল ২০ নভেম্বর, ১৯৩৭। দেড় বৎসর পরে, ১৯৩৯ সালের ২৯শে মার্চ তারিখে কবি সুধারানী দেবীকে লিখিত আরেক পত্রে লিখেছেন,

'শাশ্বত মানব-ইতিহাসের যুগযুগধাবিত পথিকদের চিরসারথি বলে আমি চতুর্থ বা পঞ্চম জর্জের স্তব করতে পারি, এরকম অপরিমিত মূঢ়তা আমার সম্বন্ধে যাঁরা সন্দেহ করতে পারেন তাঁদের উত্তর দেওয়া আত্মাবমাননা।'[৯১]

'জনগণমন-অধিনায়ক' যে প্রকৃতই জাতীয় সংগীত, তার একটি অভ্যন্তরীণ প্রমাণও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আমরা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত, 'হিন্দু মেলা'র দ্বিতীয় অধিবেশনে গীত—'মিলে সবে ভারত সন্তান' গানটিকে ভারতের প্রথম সার্থক জাতীয় সংগীত বলেছি। রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' গ্রন্থে উদ্ধৃত এই গানটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গানটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্মদা, গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। পূর্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।'

সত্যেন্দ্রনাথের 'ভারতের জয়ধ্বনি'মূলক এই গানটির অনুপ্রেরণায় রচিত সরলা দেবীর 'হিন্দুস্থান' গানটিও উল্লেখ্য। তাতে আছে :

বঙ্গ-বিহার-উৎকলমান্দ্রাজ-মারাঠগুর্জর-পঞ্জাব রাজপুতান।
হিন্দু পার্সি জৈন ইসাই শিখ মুসলমান,
গাও সকলকণ্ঠে সকল ভাবে—'নমো হিন্দুস্থান,
জয় জয় জয় হিন্দুস্থান, নমো হিন্দুস্থান।'

'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ'-এর গ্রন্থকার লিখেছেন, এই গানটি প্রথম গাওয়া হয়েছিল ১৯০১ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশনে।[৯২]

এই দুই গানের জয়ধ্বনি, এবং সরলা দেবীর গানের ভারতের অঙ্গদেশ-গুলি ও ধর্মাবলম্বীদের নাম রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক' এবং 'হে মোর চিত্ত'— এই দুটি গীতিকবিতায় পরিশীলিত রূপে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। তফাৎ কেবল এইখানে যে, সত্যেন্দ্রনাথ ও সরলা দেবীর গানে আছে ভারতবন্দনা আর রবীন্দ্রনাথের গানে আছে 'ভারতবিধাতা'র বন্দনা। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-সংগীতগুলি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে আছে স্বদেশবন্দনা, দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে বিশ্ববিধাতার কাছে প্রার্থনা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের রাখী-বন্ধন-সংগীতেও কবি ভগবানের কাছেই প্রার্থনা করেছেন। ১৯১৭ সালের

কংগ্রেসে তিনি যে 'ভারতের প্রার্থনা' কবিতাটি পাঠ করেন তাতেও বিশ্বপিতার কাছেই প্রার্থনা জানানো হয়েছে। কবি অন্তিম পংক্তিমিথুনে বলেছেন :

নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।

'জনগণমন' গানটির 'ভারতভাগ্যবিধাতা'ও যে বিশ্বপিতা তার আরেক প্রমাণ কংগ্রেস অধিবেশনে গীত হবার পরের মাসেই (মাঘ ১৩১৮) 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় 'ভারতবিধাতা' শিরোনামে গানটি মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন স্বয়ং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক। পাদটীকায় গানটির পরিচয় দিয়ে লেখা হয় 'ব্রহ্ম-সংগীত'। তারপর ১১ই মাঘ মহর্ষিভবনে যে মাঘোৎসব হয় তাতেও গানটি রবীন্দ্রনাথেরই পরিচালনায় ব্রহ্ম-সংগীতরূপে গীত হয়। এই মাঘোৎসব উপলক্ষে তিনি 'ধর্মের নবযুগ' নামে যে ভাষণ দেন তার উপসংহারে বিশ্বপিতার জয়ধ্বনি কবি উচ্চারণ করেন 'জনগণমন' গানের ঈষৎ পরিবর্তন করে—

'জয় জয় জয় হে, জয় বিশ্বেশ্বর, মানবভাগ্যবিধাতা।'

এখানে মূল গানের 'রাজেশ্বর' হয়েছেন 'বিশ্বেশ্বর', এবং 'ভারতভাগ্যবিধাতা' হয়েছেন 'মানবভাগ্যবিধাতা'।[২৩]

১৯১১ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের তিন দিনের অধিবেশনে প্রথম দিনে গাওয়া হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্', দ্বিতীয় দিনে রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' এবং তৃতীয় দিনে সরলা দেবীর 'গাহ আজি হিন্দুস্থান'।[২৪]

১৯

ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের ফলে আন্দোলনের পট-পরিবর্তন হল। ১৯২১ সালের 'অহিংস অসহযোগ' আন্দোলনে গান্ধীজি 'খিলাফৎ আন্দোলন'-কারীদেরও আহ্বান করলেন। তাতে স্বাধীনতা সংগ্রাম আবার হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংগ্রামে পরিণত হল। তারই ফলে আন্দোলনের জয়ধ্বনিরূপে 'বন্দে মাতরম্'-এর সংগে যুক্ত হল 'আল্লা-হো-আকবর'। ১৯২১ সাল থেকে যখন হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে সংগ্রাম করেছেন তখন যুগ্ম-জয়ধ্বনিই উচ্চারিত হয়েছে। আর যখন হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর-বিবদমান দুই শিবিরে বিভক্ত হয়েছেন, তখন এক পক্ষের ধ্বনি হয়েছে 'বন্দে মাতরম্', এবং অন্যপক্ষের 'আল্লা-হো-আকবর'। হিন্দু-

মুসলমানে ভ্রাতৃঘাতী নরহননের দিনেও দুই শিবির থেকে অনুরূপ ধ্বনিই উচ্ছ্বসিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনের ইতিহাস সংক্ষেপে বলে নেওয়া ভালো। ইসলাম সম্প্রদায়ের খলিফা [নেতা] বলে তুরস্কের সুলতান সারা পৃথিবীর মুসলমানসমাজে স্বীকৃত ও সম্মানিত। তাঁর অধীনস্থ ইসলামের ধর্মরাজ্য খিলাফৎ স্বভাবতই মুসলমানের দৃষ্টিতে পরম পবিত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করায় যুদ্ধশেষে জার্মানির পরাজয়ে যে সন্ধি হয় তাতে তুরস্কের ভৌগোলিক সীমা ও শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত করা হয়। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় মুসলমানদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা রক্ষিত না হওয়ায়, অর্থাৎ তুরস্কের শক্তি হ্রাস করায় ভারতীয় মুসলমানেরা ক্ষুব্ধ হলেন। শুরু হল ভারতে খিলাফৎ আন্দোলন। গান্ধীজির সাহায্যে ও সমর্থনে এই আন্দোলন অধিকতর শক্তিশালী হল। প্রতিদানে মুসলমানেরাও গান্ধীজির 'অহিংস অসহযোগ' আন্দোলনে যোগ দিলেন।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ভারতের মুসলমানের মধ্যে যে সেতু নির্মাণের চেষ্টা করেছিলেন তা তুরস্ক কর্তৃক খলিফার পদটি বিলুপ্ত করে দেওয়ার ফলে ভেঙে পড়ল। আবার সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। উভয় সম্প্রদায়ের উদার জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এই বিরোধমূলক মনোভাব সমূলে উৎপাটিত করার চেষ্টা বারবার করেছেন। কিন্তু ভারতের রাজনীতিতে 'মুসলিম লীগে'র প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব ক্রমশ বাড়তে লাগল। ১৯৩০ সালের 'আইন অমান্য' আন্দোলনে হিন্দু মুসলমানের যুগ্মজয়ধ্বনি ক্ষীয়মাণ হয়ে এল। একত্রিশ সালে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে আহ্বান করে ব্রিটিশ বিভেদনীতি পুনরায় প্রকট হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকেই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। তখন তিনি আন্তর্জাতিক ঐক্য ও মিলনের বিশ্বদূত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশবাসীর উন্নতি, শৃঙ্খলমুক্তি ও কল্যাণচিন্তার কথা তিনি কোনোদিনই ভোলেন নি। কেননা তাঁর জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতায় কোনো বিরোধ ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই তিনি একথা বুঝেছিলেন যে, ভারতের হিন্দু-মুসলমানকে একসূত্রে মিলিত করতে না পারলে স্বদেশের সংগ্রামক্ষেত্রেই হোক, আর বিলেতের গোলটেবিলেই হোক্, মূলে সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। তাই তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন, 'রাষ্ট্রিক হাটে রাষ্ট্রাধিকার নিয়ে দরদস্তুর করে হট্টগোল যতই পাকানো যাক, সেখানে গোলটেবিলের চক্রবাত্যায় প্রতিকারের

চরম উপায় মিলবে না ; তরীর তলায় যেখানে বাঁধন আলগা সেইখানেই অবিলম্বে হাত লাগাতে হবে।'[২৫]

১৯৩০-এর 'আইন অমান্য' আন্দোলনের পর ভারতের স্বাধীনতার দাবি সম্পর্কে ব্রিটিশ শাসকবর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য দু-দুবার লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এই বিশাল দেশের বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভেদবুদ্ধির সুযোগ নিয়ে কূটনীতিবিশারদ ব্রিটিশ শাসকবর্গ গোলটেবিল বৈঠককে একটা হাস্যকর প্রহসনে পরিণত করে দিল। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে 'ভারতের অর্ধনগ্ন ফকির' শূন্য হাতে দেশে ফিরে এলেন। ১৯৩২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল।

ওদিকে গোলটেবিল বৈঠকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে কোনো একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। শুধু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যেই ভাবী শাসননীতি ও সংবিধান সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে এমন নয়, হিন্দুমহাসভা, অনুন্নত সম্প্রদায়, শিখসমাজ সবাই নিজ নিজ সম্প্রদায় কিংবা ধর্মের নামে রক্ষাকবচের জন্য বিচিত্র দাবি উত্থাপন করতে লাগলেন। কাজেই নেতৃবৃন্দ একমত হতে না পারায় তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের উপরই শেষসিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব অর্পণ করতে হল। তিনি ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রিটিশ কূটনীতির চালে শুধু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেই বিভেদ পাকা করলেন না, হিন্দুসমাজকেও দ্বিধা বিভক্ত করে বর্ণহিন্দু ও তপশিলী হিন্দু—এই দুই সম্প্রদায়ে চিহ্নিত করে তাদের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেন। হিন্দুসমাজের মধ্যে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে এতদিন যে সামাজিক ভেদ ছিল ব্রিটিশ শাসকবর্গ তারই পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন। এই সম্ভাবনার কথা বহুপূর্বেই রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। 'গীতাঞ্জলি'র 'অপমানিত' কবিতায় তিনি বলেছিলেন :

> হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
> অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
> মানুষের অধিকারে
> বঞ্চিত করেছ যারে,
> সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
> অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

কবির এই ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি যে কত সত্য ছিল এবার মর্মে মর্মে তার উপলব্ধি হল। অন্তরিত মহাত্মা গান্ধী কারাপ্রাচীরের অন্তরাল থেকে এই সাম্প্রদায়িক

বাঁটোয়ারার তীব্র প্রতিবাদ করে সারাদেশব্যাপী সক্রিয় আন্দোলনের আহ্বান জানালেন। তখন ভারতের বড়লাট লর্ড উইলিংডন। তিনি শক্ত হাতে আন্দোলনের কণ্ঠরোধে প্রয়াসী হলেন। সারা ভারতে কংগ্রেস নিষিদ্ধ হল। এই চরম সংকটে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে গান্ধীজি মরণপণ অনশনের সংকল্প গ্রহণ করলেন। অনশনের পূর্ব-মুহূর্তে 'গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে লিখলেন :

If you can bless the effort, I want it.

রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীর একুশ সালের 'অহিংস অসহযোগ'কে সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি বলেছিলেন, এ আহ্বান 'সত্যের আহ্বান' নয়। ত্রিশ সালের 'আইন অমান্য' আন্দোলনেও তিনি কোনো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। তবু মহাত্মা গান্ধী তাঁকে 'গুরুদেব' বলেই সম্বোধন করতেন। রবীন্দ্রনাথ চিঠির উত্তরে তারবার্তায় জানালেন :

It is worth sacrificing precious life for the sake of India's unity and her social integrity.

শুধু তারবার্তা পাঠিয়েই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হলেন না; তাঁরও শরীর তখন অসুস্থ; কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে তিনি পুনায় কারারুদ্ধ মহানায়কের শয্যাপার্শ্বে উপনীত হলেন। শেষ পর্যন্ত মোটামুটি একটা সন্তোষজনক সমাধান হওয়ায় নেতৃবৃন্দের অনুরোধে গান্ধীজি অনশন পরিত্যাগ করলেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, গান্ধীজির 'হরিজন আন্দোলনে' তিনি তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন।[৯৬]

২০

আমরা 'বন্দে মাতরম্'-এর ইতিহাস থেকে ঈষৎ দূরে সরে এসেছি। কিন্তু র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' 'বন্দে মাতরমে'র উপর লীগ-পন্থী মুসলমানদের বিরোধিতা কিভাবে ধাপে ধাপে বাড়িয়ে তুলল তার দিকে দৃষ্টি রেখেই আপাত-অপ্রাসঙ্গিক এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে হল।

বর্ণহিন্দু, তপশীলী হিন্দু, এবং মুসলমান—এই ত্রিধা বিভক্ত সদস্য-নির্বাচনের ভিত্তিতেই পঁয়ত্রিশ সালের নির্বাচন নিষ্পন্ন হল। যে-সব প্রদেশে বিধানসভায় কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য ছিল, সে-সব প্রদেশে বিধানসভার অধিবেশনের প্রারম্ভে 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া হত। এতে লীগ-সদস্যগণ আপত্তি করতে লাগলেন। এই আপত্তি ক্রমশই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে

লাগল। কোনো কোনো সার্বজনিক সভায় মুসলমান ছাত্র ও জনতার আপত্তির ফলে এই গান গাওয়াই দুঃসাধ্য হয়ে উঠতে লাগল। প্রতিবাদকারীদেব মতে 'বন্দে মাতরম্' পৌত্তলিকতার পরিপোষক। এই গানে, বিশেষ করে

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বং—

এই স্তবকাংশে, হিন্দু দেবীগণের নাম থাকায় অপৌত্তলিকগণের কাছে জাতীয় সংগীত হিসাবে গানটি আপত্তিকর বিবেচিত হতে লাগল। তদুপরি, গানটি 'আনন্দমঠে'-র অন্তর্গত। যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় মুসলমান-বিদ্বেষ খুঁজে পেলেন তাঁদের কাছে 'আনন্দমঠে'র অন্তর্ভুক্ত 'বন্দে মাতরম্' আপত্তিকর বলে মনে হল। তাঁদের মধ্যে যাঁরা উগ্র তাঁদের রোষবহ্নি এমনভাবে প্রজ্বলিত হল যে কলিকাতার রাজপথে স্তূপীকৃত 'আনন্দমঠে'র বহ্ন্যুৎসব হল।

এই উপলক্ষে জাতীয়তাবাদী মুসলিম-নেতা রেজাউল করীম তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ' গ্রন্থে 'আনন্দমঠের বহ্নি-উৎসব' প্রবন্ধে বলেছেন, 'যাঁহারা ভিতরেব খবর রাখেন না, তাঁহারা হয়ত মনে করিতে পারেন যে, 'আনন্দমঠে'র বিরুদ্ধে মুসলমানের যে অভিযোগ আছে, তাহার প্রতিকারের জন্যই তাঁহারা উক্ত প্রকার আচরণ করিলেন। কিন্তু আসল ব্যাপার তাহা নহে। বহুদিন হইতে 'আনন্দমঠে'র প্রতি সরকারের আক্রোশ ছিল। তাঁহারা বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, দেশে যে মুক্তি-আন্দোলন হইতেছে, তাহার প্রধান খোরাক জোগাইয়াছে 'আনন্দমঠ'। তাই কোনদিনই কর্তৃপক্ষ গ্রন্থখানিকে সুনজরে দেখেন নাই। অথচ একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের লিখিত গ্রন্থকে তাঁহারা সরাসরি বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন নাই। বর্তমানে 'আনন্দমঠে'র বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হইতেছে, তাহা যে অদৃশ্য হস্তের গোপন ইঙ্গিতেই হইতেছে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। এ বিষয়ে আর বেশি কথা বলিব না। তবে এ কথা প্রত্যেকের জানা দরকাব,—বহু বর্ষ পরে হঠাৎ আজ 'আনন্দমঠে'র বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা মুসলমানের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার উদ্দেশ্যে নহে ;—তাহার মূল কারণ —মুসলমান যাহাতে মুক্তি-আন্দোলনে যোগ দিতে না পারে, তাহার জন্য কতকগুলি ছল বাহির করিবার দুরভিসন্ধি। 'পদ্ম' ও 'শ্রী'র বিরুদ্ধে আন্দোলনও সেইরূপ একটা ছল। তাহাতে যখন কিছু ফল পাওয়া গেল, তখন

মজলিস গরম করিবার জন্য এবং মুসলমানের কংগ্রেস-বিদ্বেষকে আরও তীব্র-ভাবে জাগাইয়া রাখিবার জন্য আর একটি ছল উদ্ভাবিত হইল—'আনন্দমঠে'র মধ্যে মুসলিম-বিদ্বেষকে উপলক্ষ করিয়া। মাননীয় মওলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রতিভা এজন্য অজস্র ধন্যবাদের পাত্র। একখানা 'আনন্দমঠ' বাজেয়াপ্ত হইলেই কি, আর কয়েক সহস্র ভস্মীভূত হইলেই বা কি—তাহাতে অপরের বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু ইহাকে উপলক্ষ করিয়া মুসলমানের মধ্যে যে ধর্মান্ধতা প্রশ্রয় পাইতেছে, তাহাতে সমাজের বিস্তর ক্ষতি হইবে, এবং তাহার মানসিকতা কলুষিত হইয়া পড়িবে। তাই আমরা প্রত্যেক সমাজহিতৈষীকে এই প্রকার জঘন্য আন্দোলন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি।"[৭]

কিন্তু করাচী প্রস্তাব অনুসারে কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কংগ্রেসের অবলম্বিত কোনো বিধিবিধানের প্রতিবাদ করলে তার বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে কংগ্রেস বাধ্য। স্বভাবতই কংগ্রেস এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন। ১৯৩৭ সালের অক্টোবরে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের 'ওয়ার্কিং কমিটি' এবং 'নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি'তে এ বিষয়ে আলোচনা করে 'বন্দে মাতরম্'-এর অংগচ্ছেদ করে তা সর্বজনগ্রাহ্য হয় কিনা তার চেষ্টা করা হল।

রবীন্দ্রনাথ তখন কলিকাতায় ছিলেন। ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৭) তিনি বিসর্পরোগের আক্রমণে শান্তিনিকেতনে সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন। দুদিন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকার পর ডাক্তার নীলরতন সরকারের চিকিৎসায় তাঁর জ্ঞান ফিসে আসে। সাতাত্তর বৎসরের বৃদ্ধ কবি অসুখের এই কঠিন আক্রমণে বিশেষ দুর্বল হয়ে পড়েন। এক মাস শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে চিকিৎসা ও আরোগ্যলাভের জন্য ১২ই অক্টোবর এলেন কলিকাতায়। তখন মহানগরীতে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা কবিকে দেখতে যান। মহাত্মা গান্ধী নিজেও খুবই অসুস্থ ছিলেন, তবু একদিন কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মোটর গাড়িতে উঠতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। টেলিফোনে সংবাদ পেয়ে কবি তৎক্ষণাৎ গান্ধীজির সংগে দেখা করতে গেলেন।

সুভাষচন্দ্র সদ্য বিদেশ সফর থেকে ফিরে এসেছেন। 'বন্দে মাতরম্'-এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বভাবতই তাঁর দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। তিনি তখন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কার্সিয়ং-এ আছেন। সেখান থেকে তিনি দুখানি চিঠি লিখলেন। একখানি রবীন্দ্রনাথকে, অন্যখানি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে। রবীন্দ্রনাথকে ১৬।১০।৩৭ তারিখে তিনি লিখলেন,

পরমশ্রদ্ধাভাজনেষু—

আপনার বর্তমান শারীরিক অবস্থায় আপনাকে বিরক্ত করা অত্যন্ত অন্যায়, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণে আপনার উপদেশের জন্য লিখিতে বাধ্য হইতেছি। এর সঙ্গে পণ্ডিত জহরলালজীর একখানি চিঠি পাঠাইতেছি। তাহা হইতে দেখিবেন যে কংগ্রেস মহলে "বন্দে মাতরম্" গানেব বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে। ২৬শে তারিখে Congress Working Committee-র যে সভা কলিকাতায় বসিবে, সেখানে এ বিষয়ে আলোচনা হইবে। হয়তো উক্ত কমিটি এই গান বর্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করিবে। এ বিষয়ে আপনার মতামত আমি জানি না এবং জানিবার জন্য এই পত্র লিখিতেছি। বাংগলা দেশে, এবং বাংগলার বাহিরে হিন্দু সমাজে, খুব চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে এবং বহু বন্ধুর অনুরোধে আপনার উপদেশ পাইবার জন্য এই পত্র লিখিতেছি।

৯ই অক্টোবরের "Comrade" পত্রিকায় বিশ্বভারতীব শ্রীযুক্ত কে. আর. কৃপালনীর এক প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। তাহাতে শ্রীযুক্ত কৃপালনী বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদক বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি "বন্দে মাতরম্" গানের বিরুদ্ধেই লিখিয়াছেন। তাঁহার মত বিশ্বভারতীর মত কি না তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।[১৮]

আপনার যদি এই মত হয় যে "বন্দে মাতরম্" গানের বর্তমান মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা উচিত তাহা হইলে আপনি যদি পণ্ডিত জহরলাল ও মহাত্মা গান্ধীকে এ বিষয়ে লেখেন তাহা হইলে খুব ভাল হয়। মহাত্মাজীর কাছে আপনার কথার কতটা মূল্য আছে তাহা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। জহরলালজী বোধ হয় কলিকাতায় আসিবার পথে আপনার সহিত দেখা করিবেন—অতএব আপনি ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে তাঁহাকে নিজেই বলিতে পারেন। মহাত্মাজীকে কিন্তু লেখাই ভাল। তিনি বোধ হয় ২৬শে তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিবেন এবং ১নং উডবার্ন পার্কে [1 Woodburn Park] থাকিবেন।

সতত আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আমরা প্রার্থনা করি। আমার ৺বিজয়ার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম আপনি গ্রহণ করিবেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু[১৯]

চারদিন পরে, ২০।১০।৩৭ তারিখে, কার্সিয়ং থেকেই সুভাষচন্দ্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখলেন,

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—

আপনার পত্র এইমাত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আমি কলিকাতায় ২৪শে তারিখে পৌঁছিব এবং সেখানে এক সপ্তাহ থাকিব। আমার ঠিকানা—38/2 Elgin Road। মহাত্মাজী ও পণ্ডিত জহরলাল ২৬শে তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিবেন এবং থাকিবেন—1 Woodburn Park-এ। আপনি যদি মহাত্মাজীকে "বন্দে মাতরম্"-এর বিষয়ে লেখেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়, আপনার সাহায্য এ বিষয়ে একান্ত দরকার। আমি জানি না "ওয়ার্কিং কমিটি" এ বিষয়ে কি করিয়া বসিবেন—কমিটিতে আমি একমাত্র বাঙ্গালী। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে কবিকে অনুরোধ করিবেন মহাত্মাজীকে লিখিবার জন্য। আমি কবিকে লিখিয়াছি, কিন্তু কি ফল হইবে জানি না। অন্যান্য বিষয়ে আপনাকে পরে লিখিতেছি।

আমার বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি—

বিনীত
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু[১০০]

জওহরলাল তখন কংগ্রেস সভাপতি। তিনি ২৫শে অক্টোবর একান্তভাবে কবির সঙ্গে কথাবার্তা বলে গেলেন। ২৬ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে তাঁর মতামত কংগ্রেস-সভাপতি জওহরলালের কাছে নিজের একান্ত-সচিবের মাধ্যমে লিখে পাঠালেন। কবির এই চিঠি এখানে সমগ্রভাবে উদ্ধারযোগ্য। তিনি লিখলেন :

An unfortunate controversy is raging round the question of suitability of 'Bande Mataram' as national song. In offering my own opinion about it I am reminded that the privilege of originally setting its first stanza to the tune was mine when the author was still alive and I was the first person to sing it before a gathering of the Calcutta Congress. To me the spirit of tenderness and devotion expressed in its first portion, the emphasis it gave to beautiful and beneficient aspects of our motherland made special appeal so much so that I found no difficulty in dissociating it from the rest of the poem and from those portions of the book of which it is a part, with all sentiments of which, brought up as I was in the monotheistic ideals of my father, I could have no sympathy.

It first caught on as an appropriate national anthem at the poignant period of our strenuous struggle for asserting the people's will against the decree of separation hurled upon our province by the ruling power. The subsequent developments during which 'Bande Mataram' became a national slogan cannot, in view of the stupendous sacrifices of some of the best of our youths, be lightly ignored at a moment when it has once again become necessary to give expression to our triumphant confidence in the victory of our cause.

I freely concede that the whole of Bankim's 'Bande Mataram' poem read together with its context is liable to be interpreted in ways that might wound Moslem susceptibilities, but a national song though derived from it which has spontaneously come to consist only of the first two stanzas of the original poem, need not remind us every time of the whole of it, much less of the story with which it was accidentally associated. It has acquired a separate individuality and an inspiring significance of its own in which I see nothing to offend any sect or community.[১০১]

মুখ্যত রবীন্দ্রনাথের এই সমর্থন লাভ করে, ১৯৩৭ সালের ২৮শে অক্টোবর 'কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি' সিদ্ধান্ত করেন যে, জাতীয়-সভাসমিতিতে 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া হলে এই গানের শুধু প্রথম দুটি কলি গাওয়া হবে। তবে এই গানের পরিবর্তে অন্য কোন সর্বজনগ্রাহ্য গান পরিবেশন করার পূর্ণ স্বাধীনতা উদ্যোক্তাদের থাকবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই ঐতিহাসিক প্রস্তাবের মুসাবিদা করেন জওহরলাল স্বয়ং। দিল্লীর 'নেহরু স্মারক প্রদর্শশালা'য় জওহরলালের হস্তাক্ষরে মুসাবিদাটি রক্ষিত আছে।[১০২] আমরা তার নির্বাচিত প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধার করছি :

...The song and words 'Bande Mataram' were considered seditious by the British Government and were sought to be suppressed by violence and intimidation. At a famous session of the Bengal Provincial Conference held in Barisal in April

1906, under the Presidentship of Shri A. Rasul, a brutal lathi charge was made by the police on the delegates and volunteers and the 'Bande Mataram' badges worn by them were violently torn off. Some delegates were beaten so severely as they cried 'Bande Mataram' that they fell down senseless. Since then, during the past thirty years, innumerable instances of sacrifice and suffering all over the country have been associated with 'Bande Mataram' and men and women have not hesitated to face death even with that cry on their lips. The song and the words thus became symbols of national resistence to British imperialism in Bengal especially, and generally, in other parts of India. The words 'Bande Matarm' became a slogan of power which inspired our people, and a greeting which ever remind us of our struggle for national freedom.

... ...

The Working Committee feel that past associations, with their long record of suffering for the cause, as well as popular usage, have made the first two stanzas of this song a living and inseparable part of our national movement and as such they must command our affection and respect. There is nothing in these stanzas to which any one can take exception, The other stanzas of the song are little known and hardly ever sung. They contain certain allusions and a religious ideology which may not be in keeping with the ideology of other religious groups in India.

The Committee recognise the validity of the objection raised by Muslim friends to certain parts of the song. While the Committee have taken note of such objection in so far as it has intrinsic value the Committee wish to point out that the modern evolution of the use of the song as part of National life is of infinitely greater importance than its setting in a

historical novel before the national movement had taken shape. Taking all things into consideration therefore the Committee recommend that wherever the Bande Mataram is sung at national gatherings only the first two stanzas should be sung, with perfect freedom to the organisers to sing any other song of an unobjectionable character, in addition to, or in the place of, the Bande Mataram song.

জওহরলাল-রচিত এই প্রস্তাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মেনে নিলেন 'the validity of the objection raised by Muslim friends to certain parts of the song.' বলাই বাহুল্য, জওহরলাল দুর্গা, কমলা এবং বাণী—এই তিন হিন্দুদেবীর নামই শুধু দেখেছেন। সংগীতের ভাবার্থে অনুপ্রবেশ করে এই নামত্রয়ের অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করে দেখার আবশ্যকতা অনুভব করেন নি। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিবৃতিও তাঁকে বিশেষভাবেই প্রভাবিত করেছিল এ কথা অনুমান করা অসংগত হবে না। তাছাড়া ভারতের অহিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি সমদর্শী মহানুভবতাও নিশ্চয়ই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কংগ্রেস যে সাম্প্রদায়িতার ঊর্ধ্বে, এ কথা প্রমাণ করা সেদিন বড়ো প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু প্রস্তাবের অনুজ্ঞা অংশ বন্দে মাতরম্-এর অশুভ ভবিষ্যতের সূত্রপাত করেছে। ওয়ার্কিং কমিটি যদি সেদিন এই মহাসংগীতের প্রথম দুটি স্তবক গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হতেন তাহলেও হয়তো বলার কিছু ছিল না। কেননা স্বাধীনতা সংগ্রামে 'বন্দে মাতরম্' যে মহাপ্রেরণা সঞ্চার করেছে, প্রারম্ভিক ভূমিকায় জওহরলাল তার যে বলিষ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাতে তার প্রতি সুবিচারই করা হ'ত। তিনি বলেছেন, 'There is nothing in the stanzas to which any one can take exception.' এই উক্তি যদি অকপট হয় তাহলে যে-দুটি স্তবক 'living and inseparable part of our national movement' তার বদলে অন্য কোনো গান গাওয়ার প্রশ্ন ওঠে কেন?

শুধু প্রশ্নই নয়, জাতীয় সংগীতের একটি প্রামাণ্য সংকলনগ্রন্থ রচনার প্রস্তাবও ওয়ার্কিং কমিটি করলেন। উক্ত সংকলনগ্রন্থে সংগীত নির্বাচনের জন্য একটি সাব-কমিটিও গঠিত হল। তার চারজন সদস্য হলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু ও নরেন্দ্র দেব। তাঁরা প্রচলিত অন্যান্য জাতীয় সংগীত পরীক্ষা করবেন। এমন কি, কেউ

যদি তাঁর নিজের লেখা নতুন গান পাঠাতে চান তাও তাঁরা গ্রহণ করবেন। কিন্তু, বলা হল, যে-সব গান সহজ হিন্দুস্থানীতে লেখা, অথবা সহজেই হিন্দুস্থানীতে অনুবাদ করা সম্ভব, সেগুলিই সাব-কমিটি গ্রহণ করবেন। ইংরেজি বয়ানে বলা হয়েছে, 'Only such songs as are composed in simple Hindustani or can be adapted to it, and have a rousing and inspiring tune will be accepted by the sub-committee for examination.

এখানেই শেষ নয়, প্রস্তাবের উপসংহারে বলা হল, ওয়ার্কিং কমিটি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলির কাছে সুপারিশ করছেন, তাঁরা যেন তাঁদের নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষায় অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে অনুমোদিত হল। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল রবীন্দ্রনাথকে এই প্রস্তাবের সঙ্গে জড়িয়ে রাখা। বলা হল, সাব-কমিটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করবেন এবং তাঁর উপদেশ গ্রহণ করবেন।

ভাবতে বিস্ময় লাগে, জওহরলালের মতো রাষ্ট্রনীতিবিশারদ নেতৃ-পুরুষের সেদিন মনে হয়েছে, কোনো দেশের জাতীয় সংগীত ফরমাস দিয়ে তৈরি করা যায়। জাতীয় সংগীত যে জাতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তা যে জাতীয় ঐতিহ্য থেকেই উৎসারিত এবং জাতীয় বীরবৃন্দের প্রাণ-স্পন্দনে সঞ্জীবিত, এই সত্য বিস্মৃত হলে যে বিভ্রান্তি ঘটে সেদিন কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের সেই বিভ্রান্তিই ঘটেছিল।

এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী জাতীয় সংগীত 'মার্সাই' (Marseillaise)-এর কথা মনে পড়ে। একদিক দিয়ে 'বন্দে মাতরম্'-এর সঙ্গে এর একটা সাদৃশ্য রয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে 'বন্দে মাতরম্' ছিল সপ্তকোটীকণ্ঠের জীবনসংগীত। ধীরে ধীরে তা সারা ভারতের জাতীয় সংগীতে রূপান্তরিত হয়। 'মার্সাই'-সংগীতও প্রথমে ছিল 'রাইন-বাহিনীর রণসংগীত'—'Battle song of the Rhine Army'. এর রচয়িতা Rouget de Lisle নামে একজন রাজভক্ত এঞ্জিনিয়ার অফিসার। গানটির প্রথম ছ'টি স্তবক তিনি রচনা করেন ১৭৯২ সালের ২৪।২৫ এপ্রিলে স্ট্রাসবুর্গে। গানটি অপ্রত্যাশিত দ্রুতগতিতে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মার্সাই শহরের জনগণ তাঁদের বিভিন্ন সভাসমিতিতে গান করার জন্য সংগীতটি নির্বাচন করেন। গানের এই বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা দেখে এর রাজানুগ্রহধন্য রচয়িতা কিঞ্চিৎ ভীত হয়ে ওঠেন। Lamartine লিখছেন, 'It was the fire-water of the Revolu-

tion, which instilled into the sense and soul of the people the intoxication of battle.' Carlyle মার্সাই সংগীত সম্পর্কে বলেছেন, 'The luckiest musical composition ever promulgated, the sound of which will make the blood tingle in men's veins ; and assemblages will sing it with eyes weeping and burning, with hearts defiant of Death, Despot and Devil.'[১০৩] স্বভাবতই রাজতান্ত্রিক ফ্রান্সে গানটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, কিন্তু ১৮৩০ সালের জুলাই-বিপ্লবে এর পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং সারা ফ্রান্সের জাতীয় সংগীতে পরিণত হয়। ততদিনে মূল গানের সঙ্গে আরেকটি স্তবক যুক্ত হয়ে তা সপ্ত স্তবকে সম্পূর্ণতা পায়।[১০৪]

'এনস ইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা'য় 'জাতীয় সংগীত' সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'Words and music should convey something of the national temper, should voice the aspiration of the people and express to some extent the ideas that a nation stand for.'[১০৫] এই আভ্যন্তর ধর্মেই একদেশের জাতীয় সংগীতের সঙ্গে দেশান্তরের জাতীয় সংগীতের পার্থক্য ঘটে। মার্সাই সংগীতের সঙ্গে 'বন্দে মাতরমে'র তুলনা করলেই বুঝতে পারা যাবে ফ্রান্সের মতো একটি সামরিক দেশের সঙ্গে ভারতের মতো একটি শান্তিপ্রিয় দেশের পার্থক্য কোথায়। কাজেই ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে যে 'rousing and inspiring tune'-এর কথা বলা হয়েছে তার আদর্শ মার্সাই সংগীত নয়, বন্দে মাতরম্-এর মধ্যেই তার সন্ধান করতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সংগীতে যে ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার সম্যক্ বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক। দুঃখের বিষয় সেদিকে যথার্থ মনোনিবেশ না করেই কংগ্রেস বন্দে মাতরমের অঙ্গচ্ছেদ করে আপৎকালীন একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। কিন্তু তাতে মুসলিম লীগকে বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট করা গেল না। ১৯৩৮ সালে মিঃ জিন্না যে এগারো দফা দাবি উত্থাপন করলেন তার প্রথম দফাই হল 'বন্দে মাতরম্' বর্জন। 'The 'Bande Mataram song to be given up.'[১০৬]

২১

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে যে মহাসংগীত বাঙালী-জীবনে মন্ত্রের মতো কাজ করেছে, যে সংগীত সারা ভারতে জাতীয় সংগীতরূপে স্বীকৃত হয়েছে, যে সংগীতের প্রতি মহাত্মা গান্ধী আজীবন পরম শ্রদ্ধার

মনোভাব পোষণ করে বলেছেন, 'It never occurred to me that it was a Hindu song or it was meant only for the Hindus', সেই সংগীতের অঙ্গচ্ছেদে বাংলায় যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল তা মোটেই অসংগত বা অস্বাভাবিক ছিল না।

বাংলার সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবিগণ এক সভায় মিলিত হয়ে 'বন্দে মাতরমে'র অঙ্গচ্ছেদের তীব্র নিন্দা করেন। এই সভায় সুভাষচন্দ্র এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিয়েছিলেন। সভার উদ্যোক্তারা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে তাঁদের মুখপাত্র নির্বাচন করে তাঁদের বক্তব্য গান্ধীজির নিকট উপস্থাপিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিজে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে 'বন্দে মাতরম্' পৌত্তলিকতাদোষ-মুক্ত ও মুসলিম-বিদ্বেষহীন বলেই প্রতিভাত হয়েছে। তিনি গান্ধীজির কাছে উপস্থাপিত করার জন্য যে বক্তব্য প্রস্তুত করেছিলেন তা যেমন বলিষ্ঠ তেমনি তাঁর উদার ও স্বচ্ছদৃষ্টির পরিচায়ক। গান্ধীজি বাংলার বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য শুনতে রাজী হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অসুস্থতা ও কাজের চাপে তা সম্ভব হয় নি।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত ইংরেজি মাসিক 'মডার্ন রিভিউ' এবং বাংলা মাসিক 'প্রবাসী'তে সে বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। 'মডার্ন রিভিউ'র ১৯৩৭-এর ডিসেম্বর সংখ্যায় ৭১০-১১ পৃষ্ঠায় প্রথমে লেখেন 'The question of a National Anthem for India'. তাছাড়া 'Some Bengali Litterateurs' statement to Mahatma Gandhi on Bande Mataram'-ও এই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। তার ভূমিকা হিসাবে সম্পাদক বলেন যে, গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয়নি বলে বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ভূমিকায় তিনি বলেন, 'Mr. Chatterji desires humbly to say that he is a monotheist who does not worship images and is not interested in promoting image-worship. But he believes that 'Bande Mataram' is not an idolatrous song. His reasons have been given in the Modern Review and Prabasi. He also thinks that full freedom of poetic expression should be enjoyed by all poets, whether their form of worship is iconic or aniconic.'

তারপর গান্ধীজিকে প্রেরিত ইংরেজি ভাষায় লেখা সমগ্র বক্তব্যটি 'The Statement' শিরোনামায় মুদ্রিত হয়।

'প্রবাসী' পত্রে ১৩৪৪ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'বিবিধ প্রসঙ্গে' পর পর 'বন্দে মাতরম্ গান সম্বন্ধে আন্দোলন', 'রবীন্দ্রনাথ ও স্বাধীনতা' এবং 'বন্দে মাতরম্'—এই তিনটি 'প্রসঙ্গ' প্রকাশিত হয়।

'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পত্র প্রকাশের পর কোনো কোনো জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে তার কঠোর সমালোচনা করা হয়; এবং ধীরে ধীরে অন্যান্য সাময়িকপত্রে তা ছড়িয়ে পড়ে। বিতর্ক যুক্তিতর্কের সীমানা পেরিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও জঘন্য কুৎসাপ্রচারে পর্যবসিত হতে থাকে। তারই প্রতি লক্ষ্য রেখে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার জন্য ব্যক্তিগত আক্রমণ ও হীন অভিসন্ধি আরোপ স্থলবিশেষে তর্কবিতর্কের রীতি লঙ্ঘন এবং শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। এরূপ আক্রমণে সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হয় না। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস।'

'আন্তরিক বিশ্বাসে'ই যে কবি তাঁর সেদিনকার বক্তব্য অকুণ্ঠ ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন তার আরেকটি অন্তরঙ্গ প্রমাণ আছে। বুদ্ধদেব বসু 'শ্রীহর্ষ' পত্রে রবীন্দ্রনাথের উক্তির প্রতিবাদ করে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধ পড়ে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে লেখেন :

'বন্দে মাতরম্' ব্যাপারটা নিয়ে বাঙালি হিন্দু-সমাজে যে উন্মত্ত বিক্ষোভের আলোড়ন উঠেছে আমার বুদ্ধিতে এ আমি কখনো কল্পনাও করি নি। গালিগালাজ জিনিসটা চিরপ্রত্যাশিত—বাংলাদেশে যখন জন্মেছি তখন কটূক্তির হিল্লোল উঠলেই অনুভব করি স্বদেশী হাওয়া সেবন করছি। এ নিয়ে কোনোদিন নালিশ করি নি। আমার দুঃখিত হবার দিন গেছে কিন্তু বিস্মিত হবার বোধশক্তি এখনো ভোঁতা হয় নি। শ্রীহর্ষে বন্দেমাতরংবাদীদের পক্ষে তোমার লেখা পড়ে বিস্মিত হয়েছি স্বীকার করি।...

'তুমি আমাকে গাল দাও নি। কিন্তু তাই যথেষ্ট নয় তুমি আমাকে বুঝিয়ে দাও। তর্কটা হচ্ছে এ নিয়ে যে ভারতবর্ষে ন্যাশনাল গান এমন কোনো গান হওয়া উচিত যাতে একা হিন্দু নয় কিন্তু মুসলমান, খ্রীষ্টান—এমন কি ব্রাহ্মও—শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে যোগ দিতে পারে। তুমি কি বলতে চাও, 'ত্বং হি দুর্গা', 'কমলা কমলদলবিহারিণী', 'বাণী বিদ্যাদায়িনী' ইত্যাদি হিন্দু দেবী-নামধারিণীদের স্তব, যাদের 'প্রতিমা পূজি মন্দিরে মন্দিরে', সার্বজাতিক গানে মুসলমানদের গলাধঃকরণ করাতেই হবে। হিন্দুর পক্ষে ওকালতি হচ্ছে এগুলি আইডিয়া মাত্র। কিন্তু যাদের ধর্মে

প্রতিমাপূজো নিষিদ্ধ তাদের কাছে আইডিয়ার দোহাই দেবার কোনো অর্থই নেই।'...[১০৭]

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের উত্তরে আরেকজন প্রাজ্ঞ ও প্রবীণ ব্রাহ্ম রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য এবার সমগ্রভাবে উদ্ধার করা যেতে পারে। ১৩৪৪ সালের অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'র 'প্রসঙ্গ কথা'য় 'বন্দে মাতরম্' শিরোনামায় তিনি লেখেন :

'বন্দে মাতরম্' গানটি আদ্যোপান্ত বঙ্গে ও বাঙ্গালীদের নিকট যেরূপ পরিচিত, বঙ্গের বাহিরে ও অবাঙ্গালীদের মধ্যে তদ্রূপ নহে। 'আনন্দমঠ' এবং 'রাজসিংহ'ও অবাঙ্গালীদের পরিচিত নহে। এই জন্য আমরা গানটি ও এই দুখানি বহি সম্বন্ধে আমাদের মত কিঞ্চিৎ যুক্তিসহ ইংরেজি মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছি। বাঙ্গালীদের জন্য প্রবাসীতে এত কথা লেখা অনাবশ্যক। তথাপি কিছু লিখিতেছি।

'আমাদের মত এই যে, 'বন্দে মাতরম্' গানটি পৌত্তলিকতাব্যঞ্জক বা পৌত্তলিকতাপ্রণোদিত নহে—যদিও শুনিবামাত্র বা ভাসা ভাসা ভাবে পড়িবামাত্র ইহা পৌত্তলিক গান মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। আমরা কেন ইহাকে অপৌত্তলিক গান মনে করি তাহা পরে বলিতেছি।

'গানটি যে মুসলমানবিদ্বেষপ্রসূত বা মুসলমানবিদ্বেষজনক নহে, সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মুসলমানদের কোন নিন্দা ইহাতে থাকা দূরে থাক, ইহাতে কোথাও মুসলমানদের উল্লেখ পর্যন্ত নাই। বরং ইহাতে মুসলমানদিগকেও মাতৃভূমির সন্তান বলিয়া ধরিয়া জন্মভূমি যে সংঘশক্তিতে বলীয়সী তাহাই বলা হইয়াছে। গানটি রচনার সময় বিহার ও উড়িষ্যা বাংলার সহিত যুক্ত ছিল এবং সমগ্র বাংলা প্রদেশের লোকসংখ্যা তখন সাত কোটি ছিল। এইজন্য গানটিতে সপ্তকোটি কণ্ঠ ও দ্বিসপ্তকোটি ভুজের উল্লেখ। পরে যখন গানটিকে সমগ্র ভারতের উপযোগী করিবার নিমিত্ত সপ্তকে ত্রিংশ করা হয়, তখন ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ছিল ত্রিশ কোটি। সপ্ত কোটি ও ত্রিংশ কোটি উভয়ের মধ্যেই মুসলমান আছেন। জাতি যে মুসলমানদেরও বলে বলীয়ান্, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং গানটি মুসলমানবিরোধী নহে।

'ইহা "আনন্দমঠ" রচিত হইবার বহুপূর্বে রচিত হয়। সুতরাং "আনন্দমঠে" যদি মুসলমান-বিরোধিতা থাকে, যাহা নাই আমরা বলিয়াছি, তাহা 'বন্দে মাতরম্' গানে আরোপিত হওয়া উচিত নয়। 'রিপুদলবারিণীম্' শব্দের 'রিপুদল' দ্বারা মুসলমান বুঝাইতে পারে না কারণ সপ্তকোটি বা ত্রিংশ

কোটি জাতীয় দলের মধ্যে মুসলমানদিগকে ধরা হইয়াছে। যদি গানটিকে 'আনন্দমঠে'র অংশ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলেও যেহেতু ঐ পুস্তকে বর্ণিত যুদ্ধগুলি ইংরেজ কোম্পানীর ইংরেজ সেনাপতিদের দ্বারা চালিত সৈনিকদের বিরুদ্ধে হইয়াছিল, সেইজন্য যদি তৎকালিক কোন দলকে লক্ষ্য করিয়া 'রিপুদল' প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা ঐ ইংরেজ সেনাপতিগণ ও তাহাদের সৈনিকগণ।

'গানটি বাঙালী হিন্দুর রচিত। এইজন্য ইহাতে পৌরাণিক কোন কোন দেবতার নাম ও স্বরূপ ব্যবহার করিয়া কবি নিজের ভাব ও চিন্তা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাতে গানটি পৌত্তলিক গান হইয়া যায় নাই। সে কথা পরে বলিতেছি। মাতৃভূমিতে ব্যক্তিত্ব আরোপ, চেতনা আরোপ, অহিন্দু অভারতীয় সভ্য জাতিরাও করিয়া গান ও কবিতা রচনা করিয়াছে ও করে। ইহা পৌত্তলিকতা নহে। মাতৃভূমিকে নমস্কার করাও পৌত্তলিকতা নহে। কোন কোন মুসলমান বলিয়াছেন, আমরা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কাহারও কাছে নতি জানাই না, ইহা কি সত্য? তাঁহারা কি কোন গুরুজনকে নতি জানান না, কোন প্রভুকে ঝুঁকিয়া সেলাম করেন না? মাতৃভূমি অবশ্য বৈজ্ঞানিকের ভাষায় জড় পদার্থ। কিন্তু জাতীয় পতাকা কি তাহা অপেক্ষাও অধিক জড় পদার্থ নহে? কোটি কোটি সচেতন মানুষ এবং অগণিত অন্য প্রাণবান্ জীব ও উদ্ভিদ মাতৃভূমিতে বাস করে এবং আমরা মাতৃভূমি হইতে আমাদের প্রাণরক্ষার সমুদয় উপকরণ সংগ্রহ করি, আত্মার পুষ্টিও কম পাই না। কিন্তু পতাকা জিনিষটি হইতে ত তাহাও করি না। তথাপি কংগ্রেস পতাকাকে সেলাম করার বৈদেশিক রীতি চালাইয়াছেন, এবং তাহাতে কংগ্রেসী কোন মুসলমান আপত্তি করেন নাই। অধিকন্তু অকংগ্রেসী—কংগ্রেসবিরোধী—মোস্লেম লীগ তাঁহাদের একটি স্বতন্ত্র পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, তাহা হইলে 'তোমাকে বন্দনা করি', মাতৃভূমিকে বলাতেই কি যত দোষ?

'বন্দেমাতরম্' গানটিতে আছে, 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী', 'কমলা কমলদল-বিহারিণী', 'বাণী বিদ্যাদায়িনী'। ইহার অর্থ অনেকে এইরূপ বোঝেন—আমিও তাই বুঝি, 'তুমিই দুর্গা, তুমিই কমলা, তুমিই বাণী', অন্য কোন দুর্গা, কমলা, বাণী নাই। এইরূপ ব্যাখ্যার সমর্থন 'আনন্দমঠ' হইতেই পাওয়া যায়। ইহার শেষ অধ্যায়ে আছে :—

"মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝাইয়াছেন, একথা তোমাকে সেইরূপ বুঝাই, মনোযোগ দিয়া শুন, তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম নহে। সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতন ধর্ম—ম্লেচ্ছেরা

যাহাকে হিন্দুধর্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক —কর্মাত্মক নহে।”

‘ইহাতে বুঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্র পৌত্তলিক ছিলেন না, সুতরাং ‘বন্দে মাতরম্’ রচনা করিয়া তিনি পৌত্তলিকতা প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন, ইহা ধরিয়া লওয়া যায় না।

‘গানটিতে আছে বটে, ‘তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে’। ইহাতে ইহা বুঝায়, যে, যেমন ‘তুমিই দুর্গা, কমলা, বাণী, অন্য কোন দুর্গা কমলা, বাণী নাই, তদ্রূপ, মন্দিরে অন্য যে-সব দেবতার কল্পিত মূর্তি গড়া হয় তুমিই সেই সব, অন্য সেই সব দেবতা নাই। তদ্ভিন্ন আমরা অনেক বিখ্যাত মানুষের সম্বন্ধেও ত বলিয়া থাকি, তাঁহাদের মূর্তি দেশের লোকদের বা জগদ্বাসীর হৃদয়মন্দিরে গৃহে গৃহে চিরকাল বিরাজ করিবে। তাহাতে পৌত্তলিকতা হয় না।

‘আনন্দমঠে’ “হরে মুরারে মধুকৈটভারে। গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে” ইত্যাদি গানটি আছে বটে। কিন্তু তাহাতে বহিখানি পৌত্তলিকতাদুষ্ট মনে করা উচিত নহে, যেমন রবীন্দ্রনাথের “বাল্মীকিপ্রতিভা” পুস্তকে কালীবিষয়ক কয়েকটি গান আছে বলিয়া কেহ তাহাকে পৌত্তলিক পুস্তক বলে না।

‘বহুদেববাদ হইতে উদ্ভূত শব্দ ব্যবহার মাত্রই পৌত্তলিকতা নহে। সংগীতের ইংরেজী প্রতিশব্দ music গ্রীক বহুদেববাদজাত। তদ্রূপ ইংরেজী Jovial, Saturnine, Martial, Son of Mars, Mammonite, Votary of the Muses, Cupid’s arrows (বাংলা ‘পুষ্পবাণ’) ইত্যাদিও বহু-দেববাদপ্রসূত। তাহা হইলেও এইগুলির ব্যবহারহেতু ইংরেজদিগকে কেহ পৌত্তলিক বলে না। শয়তানে ও বহু ফেরেস্তায় বিশ্বাসও একপ্রকার বহুদেববাদ। কিন্তু সেরূপ বিশ্বাসহেতু, কিংবা মুসলমানী কোন পুস্তকের বিজ্ঞাপনে তাহাকে ‘কৌস্তুভমণি” বলায়, কিংবা মুসলমান অনেক কবি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কবিতা রচনা করায় কিংবা আধুনিক কোন কোন মুসলমান কবি ‘প্রেমবৃন্দাবন’ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করায় কেহ মুসলমানদিগকে পৌত্তলিক বলিলে ঠিক বলা হইবে না। “ব্রাহ্মধর্ম” গ্রন্থে ও “ব্রহ্মসংগীতে” শিব, শঙ্করী, শম্ভু, বিষ্ণু, মহেশ প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু তজ্জন্য ব্রাহ্মদিগকে কেহ পৌত্তলিক বলে না। কতকগুলি কবিতা পড়িয়া ‘শ্বেতভুজা ভারতীকে” রবীন্দ্রনাথের মনে পড়িয়াছিল বলিয়া তিনি বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি পৌত্তলিক হইয়া যান নাই।

'গানটিতে মাতৃভূমির শক্তিব্যঞ্জক অনেক কথা আছে। কিন্তু শক্তি থাকিলেই তাহার হিংস্র ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী নহে। দুষ্টের দমন ও অমঙ্গল বিনাশের জন্য শক্তি আবশ্যক।

'অধিক লিখিবার স্থান নাই, সময় নাই, ইচ্ছাও নাই। কেবল উপসংহারে দু-একটা কথা বলি।

'কংগ্রেস "বন্দে মাতরম্" সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত করিবেন জানি না। সকল পক্ষের সব কথা শুনিয়া বিচার করিলে কাজটি সুবিবেচিত হইবে। তাঁহারা সিদ্ধান্ত যাহাই করুন, বন্দে মাতরমের স্থান জাতীয় জীবনে থাকিবে।

'আপাতত কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমীটি যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য বলি। তাঁহারা যে জাতীয় সংগীতের মধ্যে বন্দে মাতরমের প্রধান স্থান স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তেরা প্রীত।

'কোন কবিতা ও গানের সমালোচনা করিতে হইলে তাহার মর্মগত ভাবটির দিকেই, তাহার প্রাণের দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কমীটি তাহা করেন নাই। তাঁহারা ইহার আক্ষরিক ও শাব্দিক অর্থের প্রতিই বেশী দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। তাহা ঠিক হয় নাই। স্বদেশভক্তি এই গানটির প্রাণ, এই তত্ত্বের উপর সমুচিত ও যথেষ্ট জোর দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয়ত সাধারণতঃ এক-একটি গান ও কবিতা—অন্তত এই গানটি—একটি অখণ্ড সমগ্র বস্তু। দুই দাবীদারের মধ্যে একটি শিশুকে কাটিয়া ভাগ করিয়া দিলে যেমন তাহার প্রাণ যায়, অনেক কবিতা ও গানের দ্বিখণ্ডী-করণেও সেইরূপ তাহার প্রাণ যায়। এক্ষেত্রে হয়ত বন্দে মাতরমের অশত্রু কেহ কেহ "সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" নীতির অনুসরণ করিয়া গানটির অধিকাংশ বর্জনে সায় দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তাহার প্রাণ গিয়াছে। যে-দুটি অংশ রাখা হইয়াছে, "সুখদাং বরদাং" ছাড়া তাহার সমস্তটি মাতৃভূমির বাহ্য রূপ ও বাহ্য উপাদান বিষয়ক। গানটির পরবর্তী অংশে জন্মভূমি হইতে জনগণ যে ঐক্য শক্তি সাহস জ্ঞান ধর্ম বিদ্যা প্রভৃতির অনুপ্রেরণা পাইতে পারে ও পায়, তাহাই লিখিত হইয়াছে। বাহ্য রূপ অপেক্ষা এই প্রাণময়ী মনোময়ী আত্মিক মূর্তির মূল্য অধিক। তাহা বাদ পড়িয়াছে।

'যাহাতে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা, দুর্নীতি, কুরুচি প্রশ্রয় পায়, যাহাতে ধর্মান্ধতা, বিবাদপরায়ণতা, হিংস্রতা বাড়ে, আমরা তাহার বিরোধী। লেখকদের

যেরূপ স্বেচ্ছাচারিতায় ঐরূপ কুফল ফলিতে পারে, আমরা তাহার বিরোধী। কিন্তু আমরা চিন্তায়, কথায়, লেখায় মানুষের স্বাধীন আত্মপ্রকাশ অতি মূল্যবান অধিকার মনে করি। ইংরেজ গবর্নমেণ্ট তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতে এই অধিকারে হস্তক্ষেপ মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কৃত আইন দ্বারা তাঁহারা এই ক্ষমতা লইয়াছেন। কংগ্রেসও কি অনভিপ্রেতরূপে পরোক্ষভাবে মানুষের এই অধিকারে হাত দিতে চান? ভারতীয় কবি কী রূপক, কী পৌরাণিক উপমার প্রয়োগে আত্মপ্রকাশ করিবেন, তাহা কি তাঁহারা বাঁধিয়া দিতে চান? কোন প্রকৃত কবি এ-বাঁধন মানিবেন না। ফল এই হইবে যে, প্রকৃত কবিদের সহিত কংগ্রেসের বিচ্ছেদ ঘটিবে। বরাত দিয়া, ফরমাশ করিয়া অনুপ্রেরণাপূর্ণ জাতীয় সংগীত কংগ্রেস পাইবেন না। "নিরংকুশাঃ কবয়ঃ", কংগ্রেস যেন ইহা না ভুলেন।

"ভারতীয় সংস্কৃতির স্বাভাবিক ধারায়, বিবর্তনে, বিকাশে, কংগ্রেসের পরোক্ষ হস্তক্ষেপও অবাঞ্ছনীয় ও অনিষ্টকর।"[১০৮]

২২

'কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি' প্রচলিত কোনো গানেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁরা এমন একটি গান চেয়েছিলেন যা হিন্দুস্থানীতে রচিত হবে, অথবা সহজেই হিন্দুস্থানীতে অনূদিত হতে পারবে। কিন্তু এখানেও তাঁরা সারা ভারতের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতের তামিল-তেলুগু প্রভৃতি ভাষা-ভাষীদের কথা ভেবে দেখেন নি। বস্তুত, ভারতে এমন কোনো ভাষা নেই যা আসমুদ্র হিমাচলে সর্বজনবোধ্য।

যাই হোক্, 'ওয়ার্কিং কমিটি' ভারতের জাতীয় সংগীত সম্পর্কে চার জনের একটি উপসমিতি গঠন করে স্থির করেছিলেন যে, এই উপসমিতি রবীন্দ্রনাথের সংগে পরামর্শ করে, তাঁর উপদেশ নিয়ে একটি পাকা সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। তখনো যে তাঁরা 'বন্দে মাতরমে'র স্থলবর্তী কোনো সংগীতের সন্ধান পান নি তার একটি পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে জওহর-লালের উক্তিতে। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থ 'Rabindranath Tagore: A Centenary Volume 1861-1941'-এর ভূমিকায় জওহরলাল লিখেছেন,

During my last visit to him I requested him to compose a National Anthem for the new India. He partly agreed. At

that time I did not have 'Jana-Gana-Mana', our present National Anthem, in mind. He died soon after. It was a great happiness to me when some years later after the coming of Independence we adopted 'Jana-Gana-Mana' as our National Anthem. I have a feeling of satisfaction that I was partly responsible for this choice, not only because it is a great national song, but also because it is constant reminder to all our people of Rabindranath Tagore.[১০৯]

এই উক্তি থেকে দেখা যাচ্ছে : ১. জওহরলাল রবীন্দ্রনাথকে নবভারতের জাতীয় সংগীত রচনার অনুরোধ করেছিলেন। এবং এই অনুরোধ রক্ষা করতে কবি কিছুটা রাজিও হয়েছিলেন। ২. তখনো জওহরলালের মনে 'জন-গণ-মন' গানের কথা উদিত হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জওহরলাল 'জনগণমন'কেই আমাদের জাতীয় সংগীত বলে উল্লেখ করেছেন। ৩. ভারত স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরে 'জনগণমন'কে যে আমাদের 'জাতীয় সংগীত' হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে তাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, কেননা এই গানটিকে জাতীয় সংগীত হিসাবে নির্বাচনের জন্য তিনিই অংশত দায়ী। ৪. জওহরলালের সন্তোষের অধিকন্তু কারণ এই যে, 'জনগণমন' শুধু মহান জাতীয় সংগীতই নয়, তা আমাদের জনগণের চিত্তে রবীন্দ্রনাথকে অনুক্ষণ স্মরণীয় করেও রেখেছে।

এই বিশ্লেষিত উক্তিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি জওহরলালের যে বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমরা আনন্দিত। বিশ্ববাসীর কাছে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বাণীদূত। তাঁর সার্বভৌম চেতনায় জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার পরম সম্মিলন ঘটেছে। তিনি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকবি হিসাবে দেশে দেশে বন্দিত। সুতরাং তাঁর একটি সংগীত যদি ভারতের জাতীয় সংগীত হিসাবে গৃহীত হয় তাহলে বিশ্ববাসীর কাছে ভারতের মান ও মর্যাদা বর্ধিত হবারই কথা।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের গুরুত্ব শেষদিন পর্যন্ত স্বীকার করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে দ্বিধাবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতার পুরোবর্তী হিংসামত্ত দিনগুলির কথা। কলিকাতা-বিহার-নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যে বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে নেতৃবৃন্দ অবশ্যই বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু সেদিন সত্য ও অহিংসার জীবন্ত বিগ্রহরূপে মহাত্মা

গান্ধী উপদ্রুত অঞ্চলগুলিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়িয়ে জীবন্মৃত নরনারীকে যে বরাভয় দান করেছিলেন তা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। টেণ্ডুলকরের 'মহাত্মা' গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে ২৪৩ পৃষ্ঠা থেকে ৩৬১ পৃষ্ঠায় সে কাহিনী বিবৃত করা হয়েছে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর গান্ধীজি কলিকাতায় আসেন। ২৩ শে আগস্ট এক অভিভাষণে তিনি বলেন, কোনো কোনো সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দু 'আল্লা-হো আকবর' ধ্বনিতে আপত্তি করছেন। কিন্তু এতে আপত্তি করার কি আছে? তিনি বলেন, 'it was probably a a cry than which a greater one had not been produced by the world. It was a soul-starring religious cry which meant God only was great.'[১১০]

তারপর তিনি 'বন্দে মাতরম্‌' ধ্বনির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, 'That was no religious cry. It was a purely political cry... It was to be remembered that it was the cry that had fired political Bengal. Many Bengalis had sacrificed their lives for the political freedom with that cry on their lips. Though, therefore, he felt strongly about "Bande Mataram" as an ode to Mother India, he advised his League friends to refer the matter to the League High Command. He would be surprised if in view of the growing friendliness between the Hindus and and the Muslims the Muslim League High Command objected to the prescribed lines of 'Bande Mataram', the national song and national cry of Bengal, which sustained her when the rest of India was almost asleep and which was, so far as he was aware, acclaimed by both the Hindus and the Muslims of Bengal.[১১১]

২৯শে আগস্ট গান্ধীজির প্রার্থনাসভা শুরু হল 'বন্দে মাতরম্‌' গান দিয়ে। সে সভায় সহীদ সুরাবর্দি ও অন্যান্য মুসলিম নেতা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা 'বন্দে মাতরম্‌' গাওয়ার সময় দণ্ডায়মান হয়ে জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। গান্ধীজি তাঁর ভাষণ শুরু করেন দণ্ডায়মান সুরাবর্দি সাহেব ও অন্যান্য মুসলিম নেতার প্রশংসা করে। কিন্তু, তিনি বলেন, জাতীয় সংগীত গান করার সময় দণ্ডায়মান হওয়া

পাশ্চাত্য পদ্ধতি। টেণ্ডুলকর লিখছেন, 'He himself purposely kept seated, because he has learnt that the Indian culture did not require standing as a mark of respect when any national song or *Bhajan* was sung. It was an unnecessary importation from the West.'[১১২]

কিন্তু ১৯৩৭ সালে 'বন্দে মাতরম্'-এর যে প্রথম সাত পংক্তি জাতীয় সংগীত হিসাবে গৃহীত হয়েছিল দশ বৎসর পরে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তার প্রতিও জওহরলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ঔদাসীন্য প্রকট হয়ে উঠল।

১৯৪৭ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার একটি অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধিগণকে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করার অনুরোধ করা হলে তাঁরা তৎকালীন সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী 'জনগণমন' গানটি পরিবেশন করেন। এর পর থেকে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর বাদ্যসংগীতে ও বিদেশী দূতাবাসের অনুষ্ঠানগুলিতে এই গানই ব্যবহৃত হতে থাকে।[১১৩]

এই নিয়ে স্বভাবতই নেহরু সরকারকে সারাদেশব্যাপী সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া'য় বলা হয়েছে, 'The greatest and most enduring gift of the Swadeshi movement was Bande Mataram, the uncrowned national anthem.'[১১৪] এই 'অনভিষিক্ত জাতীয় সংগীতে'র 'অভিষেক' যখন দেশ প্রত্যাশা করছে তখন তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় অসন্তোষ দিকে দিকে ধূমায়িত হতে লাগল। গণপরিষদের শুরুতে সুচেতা কৃপালনীর কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্'ই উদ্গীত হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে মতভেদ দেখা দিতে লাগল। জাতীয় সংগীত সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হতে লাগল। অবশেষে গণপরিষদের একাধিক সদস্যের চাপে জওহরলাল ১৯৪৮ সালের ২৫শে আগস্ট একটি বিবৃতি দিয়ে বললেন, ১৯৪৭ সালে নিউ ইয়র্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার অধিবেশনে 'জনগণমন অধিনায়ক' গানের সুর বাদ্যযন্ত্রে বাজানো হয়েছিল, কারণ 'there was no proper musical rendering of any other national song which we could send abroad.' তবে, জওহরলাল একথাও বললেন, 'Vande Mataram is obviously and indisputably the premier national song of India, with a great historical tradition and intimately connected with our struggle for

freedom. That position it is bound to retain and no other song can displace it.[১১৫]

কিন্তু অর্কেস্ট্রাতে সুরযোজনা করে গাওয়ার দিক দিয়ে 'জনগণমন' 'বন্দে মাতরম্'-এর চেয়ে অধিকতর উপযোগী বলে বিবেচিত হওয়ায় সমস্যাটির সমাধান ঘোরালো হয়ে উঠল। এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানকল্পে বাংলায় আনন্দবাজারের সুরেশচন্দ্র মজুমদার এবং পুনার মাস্টার কৃষ্ণ রাও রামচন্দ্র ফুলাম্ব্রিকার সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন এবং বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় প্রমাণ করলেন যে, 'বন্দে মাতরম্' সংগীত অর্কেস্ট্রায় সাফল্যের সঙ্গেই গীত হতে পারে।[১১৬] কিন্তু এ নিয়ে যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হল তার নিরশনকল্পে গণপরিষদ একটি 'জাতীয় সংগীত নির্ধারণ কমিটি' গঠন করলেন। উক্ত কমিটি ১৯৪৯ সালের নভেম্বরে সুপারিশ করলেন যে, দুটি গানকেই জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দেওয়া হোক্। তবে, কমিটি বললেন, 'বন্দে মাতরম্' গীত হবে কণ্ঠসংগীত হিসাবে, আর 'জনগণমন' গীত হবে যন্ত্রসংগীত হিসাবে।

বিষয়টি গণপরিষদের আলোচ্য সূচীতে ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অনালোচিতই রয়ে গেল। অবশেষে ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি ড° রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে গণপরিষদের অধিবেশন বসলে সভাপতি জাতীয় সংগীত সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করলেন :

'There is one matter which has been pending for discussion, namely the question of the National Anthem. At one time it was thought that the matter might be brought up before the House and a decision taken by the House by way of a resolution. But it has been felt that, instead of taking a formal decision by means of a resolution, it is better if I make a statement with regard to the National Anthem. Accordingly I make this statement.

'The composition consisting of the the words and music known as Jana Gana Mana is the National Anthem of India, subject to such alterations in the words as the Government may authorise as occasion arises,; and the song Vande Mataram which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honoured equally with Jana Gana Mana and

shall have equal status with it (Applause). I hope this will satisfy the members.[১১৭]

অর্থাৎ, গণপরিষদের সভাপতির বিবৃতির বলে 'বন্দে মাতরম্' প্রথম স্থান থেকে দ্বিতীয় স্থানে নেমে এল। সদসাগণের হর্ষধ্বনিতে তাঁদের সন্তোষ অবশ্যই ভাষা পেয়েছে। কিন্তু যা আলোচ্যসূচীতে স্থান পেয়েছিল, আলোচনা দ্বারা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা গণতন্ত্রসম্মত হয়নি। তাছাড়া তৎকালীন গণপরিষদের অভিমতই চিরকালীন ভারতের অভিমত হতে হবে, একথাও স্বতঃসিদ্ধ নয়।

২৩

'এহো বাহ্য, আগে কহ আর'। বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'মাতৃস্তোত্র' রচনা করেছিলেন তখন এ-রকম পরিণতির সম্ভাবনা তিনি কি ভাবতে পেরেছিলেন? অথবা, এই সম্পর্কে 'চিত্রা'র 'সাধনা' কবিতাটিতে কাব্যসত্যের শেষকথাই হয়তো উচ্চারিত হয়েছে :—

দেবী, এ-জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি অনেক গান
পেয়েছি অনেক ফল ;
সে-আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান,
ভরেছি ধরণীতল।
যার ভালো লাগে সেই নিয়ে যাক্,
যতদিন থাকে ততদিন থাক্,
যশ-অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক
ধুলার মাঝে।
বলেছি যে-কথা করেছি যে-কাজ
আমার সে নয় সবার সে আজ,
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসারমাঝ
বিবিধ সাজে।

'বন্দে মাতরম্'-কেও কতজনে কতভাবেই না গ্রহণ করেছেন! গ্রহীতার মেজাজ ও মর্জি অনুসারে তার বিবিধ রূপ। কবির সৃষ্টি বিশ্বজনের সম্পদ। যে যেভাবে তাকে কাজে লাগাতে পারে সে সেইভাবেই ফল পায়।

'আনন্দমঠ' প্রকাশের অব্যবহিত পরেই 'বান্ধব'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'আনন্দমঠের মূলমন্ত্র' প্রবন্ধ ['বান্ধব', সপ্তম বর্ষ, বৈশাখ ১২৮৯] তাঁর

সম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কালীপ্রসন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের বৎসর তিনেকের ছোট ছিলেন [১৮৪১-১৯১০]। তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮৯ সালের ২৩শে পৌষ (৬ জানুয়ারি ১৮৮৩) যে পত্র লেখেন তাতে 'বন্দে মাতরম্‌' ও 'আনন্দমঠে'র স্রষ্টার ব্যক্তিগত মনোবেদনাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ১৮৮২ সালের আগস্ট মাসে তাঁকে 'ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও অস্থায়ী ডেপুটি কালেক্টর' হিসাবে জাজপুরে (কটক) বদলি করা হয়। পরবর্তী জানুয়ারিতে বঙ্কিমচন্দ্র বান্ধব-সম্পাদককে লিখছেন :

'এক্ষণে জানিলাম ইহার ভিতর অনেক চক্র আছে।...সেই মন্থরার দল আমাদের স্বদেশী স্বজাতি, আমার তুল্য পদস্থ; আমার ও আপনার বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য। আমিই বা আনন্দমঠ লিখিয়া কি করিব, আপনিই বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন? এই ঈর্ষাপরবশ জাতির উন্নতি নাই। বল, 'বন্দে উদরম্‌'।[১১৮]

'আমিই বা আনন্দমঠ লিখিয়া কি করিব, আপনিই বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন?'—'বন্দে মাতরম্‌' মন্ত্রের স্রষ্টার এই খেদোক্তি সত্যসত্যই বেদনাদায়ক। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্‌' [ও আনন্দমঠের] অপব্যাখ্যা চরমে উঠল এই শতাব্দীর প্রথম দশকে। স্বৈরাচারী শাসনশক্তির বিরুদ্ধে সারা বাংলাদেশ যখন প্রতিবাদে, বিদ্রোহে, ও জাতিগঠনে কৃতসংকল্প হয়ে 'বন্দে মাতরম্‌' ধ্বনি ও সংগীতে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করতে লাগল, যখন তার প্রতিধ্বনিতে ভারতের দশদিগন্ত মুখরিত হতে লাগল, তখন কার্জনের তল্পিবাহক শ্বেতাঙ্গের দল 'বন্দে মাতরম্‌'-এর অপব্যাখ্যায় বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিলেন। সর্বাধিক মূঢ়তার পরিচয় দিলেন ড° জি. এ. গ্রীয়ারসন। ১৯০৬ সালে ১২ সেপ্টেম্বর 'টাইমস' পত্রিকায় তিনি লিখলেন, 'বন্দে মাতরম্‌'-এর মাতা হিন্দুদের মাতৃদেবীরই একজন—তাঁর মতে ইনি হচ্ছেন 'মৃত্যু ও সংহারের দেবী কালী': 'The Goddess of death and destruction.' 'বন্দে মাতরম্‌'-এর 'মাতা' গ্রীয়ারসনের মতে দেশজননী কিছুতেই হতে পারেন না, কেন না, মাতৃভূমির ভাবনা হিন্দুদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল; 'The idea of a "mother-land" is wholly alien to Hindu ideas.'[১১৯]

'এই প্রসঙ্গে 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'তে টিপ্পনী করা হয়েছে যে, 'it is quite possible that Bankim Chandra may have assimilated it with his European culture.'

'বন্দে মাতরম্‌'-এর শ্বেতাঙ্গ অপব্যাখ্যাতাদের মধ্যে আমরা গ্রীয়ারসনের

নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছি, কেননা গ্রীয়ারসন প্রাচ্যভাষাবিদ্ বলে এদেশে স্বীকৃত। কিন্তু অল্পবিদ্যা যে কত ভয়ংকরী হতে পারে তা গ্রীয়ারসনের 'বন্দে মাতরম্' ব্যাখ্যাতেই প্রমাণিত হয়েছে। শুধু অল্পবিদ্যাই নয়, তার সঙ্গে বিক্রীতবিবেকের বিমূঢ়তাও এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ছিল। 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের একটি কলিতে বলা হয়েছে, যাঁর সপ্তকোটি সন্তান, আর তাদের দ্বিসপ্ত কোটি হস্তে 'খর করবাল', তিনি নিজেকে কেন শক্তিহীনা মনে করবেন?—'অবলা কেন মা এত বলে?'—এখানে জননীর বীরসন্তানদের কল্পনাই বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন। কিন্তু সংগীতে কোথাও এই মাতৃমূর্তিকে 'মৃত্যু ও ধ্বংসের দেবী'রূপে কল্পনা করা হয় নি।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে অবশ্য প্রথম খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে মায়ের ত্রিকালীনী মূর্তির সঙ্গে পরিচিত করালেন। 'মা যা ছিলেন' সেই জগদ্ধাত্রী মূর্তি; 'মা যা হইয়াছেন' সেই কালিকামূর্তি, এবং 'মা যা হইবেন' সেই সর্বমঙ্গলা শিবা সর্বার্থসাধিকা 'দুর্গামূর্তি'। বলাই বাহুল্য, দেশমাতার এই ত্রিকালীন অবস্থা বোঝাতে বঙ্কিমচন্দ্র জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গার যে ত্রিমূর্তি কল্পনা করেছেন তা পৌরাণিক রূপকল্পকে আশ্রয় করে স্বদেশেরই ভূত বর্তমান ও ভবিষ্যতের রূপ। মনে রাখতে হবে, আনন্দমঠের কাহিনী শুরু হয়েছে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহ শ্মশানচিত্র দিয়ে। তাই 'মা যা হইয়াছেন' তার বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, 'হৃতসর্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী।' মহেন্দ্র ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাতে খেটক খর্পর কেন?' উত্তরে ব্রহ্মচারী বললেন, 'আমরা সন্তান, অস্ত্র মার হাতে এই দিয়েছি মাত্র'—'খেটক ও খর্পর'ই যাঁর অস্ত্র, তিনি 'নগ্নিকা কালিকা' মূর্তি হলেও 'মৃত্যু ও ধ্বংসের দেবতা' কিছুতেই হতে পারেন না।

ত্রিকালীন ভারতের এই ত্রিমূর্তিরচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতচেতনাই বাণীমূর্তি লাভ করেছে। স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতবর্ষ একদিন ছিল জগৎপালিনী জগদ্ধাত্রী। বিদেশী লুণ্ঠনকারীরা তাঁকে হৃতসর্বস্ব করেছে। 'দেশের সর্বত্রই শ্মশান,—তাই মা কঙ্কালমালিনী'। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশের যে রূপ পরিস্ফুট হয়েছিল তার মূর্তি-কল্পনায় 'কঙ্কালমালিনী' শব্দটি নতুন অর্থ-ব্যঞ্জনা পেয়েছে। 'হৃতসর্বস্বা'র সঙ্গে অন্বিত হয়ে তা 'কঙ্কালমালাধারিণী' না হয়ে হয়েছে 'কঙ্কালদেহিনী'। অর্থাৎ তাঁর দেহের অস্থিপঞ্জরই হয়েছে কঙ্কালের মালা। তাঁর হাতে অস্ত্র হিসাবে সন্তানেরা তুলে দিয়েছেন খেটক আর খর্পর। খেটক অর্থ ঢাল। খর্পর মৃৎপাত্র। এই খেটক-খর্পরধারিণী,

কঙ্কালমালিনী মূর্তি মৃত্যু ও প্রলয়ের কারয়িত্রী মহাদেবী নন, তিনি দেশের হৃতসর্বস্বা মূর্তিরই বাক্‌প্রতিমা।

তাছাড়া, 'বন্দে মাতরম্' সংগীতে বঙ্কিমচন্দ্রের ঋষিদৃষ্টিতে যে দেশজননীর মূর্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তিনি অতীত-বর্তমানের প্রতিমা নন, ভাবীকালের সর্বৈশ্বর্যময়ী সর্বমঙ্গলা।

গ্রীয়ারসনের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে আরেকটি আপ্তবাক্য নিঃসৃত হয়েছে : 'the idea of 'mother-land' is wholly alien to Hindu ideas', অর্থাৎ, হিন্দুদের মধ্যে স্বদেশচেতনার বিন্দুবিসর্গও ছিল না।

এই প্রসঙ্গে এখানে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস একটু সংক্ষেপেই আলোচনা করা ভালো। বঙ্কিমচন্দ্র বৈদিক যুগের দেব-দেবী সম্পর্কে একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'প্রচারে'র [১২৯১] প্রথম বর্ষে প্রকাশিত 'দ্যাবাপৃথিবী' প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'বেদে যেমন আকাশের স্তোত্র আছে, তেমনি পৃথিবীরও আছে।...একত্রে একসূত্রেই স্তুত হইয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তনাম দ্যাবাপৃথিবী।'

এই আকাশ ও পৃথিবী জীবের পিতা ও মাতারূপে বর্ণিত হয়েছেন। 'তন্মাতা পৃথিবী তৎপিতা দৌঃ।' এই প্রবন্ধেই বঙ্কিমচন্দ্র মনু-বচনও উদ্ধার করেছেন : 'মাতা পৃথিব্যাঃ মূর্তি'।[১২০]

বঙ্কিমচন্দ্র অথর্ববেদের উল্লেখ করেননি। কিন্তু অথর্ববেদের দ্বাদশকাণ্ডে মহীসূক্ত বা পৃথিবীসূক্ত বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই কাণ্ডের দ্বাদশ সূক্তে বলা হয়েছে

মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ।

'ভূমি আমার মাতা, আমি পৃথিবীর পুত্র।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থে 'মাটির ডাক' বলে যে কবিতাটি লিখেছেন তা অথর্ববেদের মহী-সূক্তের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রাণিত।

এই পার্থিব চেতনারই অন্তরঙ্গতর স্তর হল স্বদেশচেতনা। কেননা পৃথিবী-চেতনায় মাতা পৃথিবীর পুত্র আমি ; কিন্তু পৃথিবীর যে ভূভাগে আমি জন্ম গ্রহণ করেছি সেই ভূভাগ ঘনিষ্ঠ তাৎপর্যেই আমার জন্মভূমি। বাল্মীকি রামায়ণে বলা হয়েছে জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী।

রাবণ-বিজয়ের পর লক্ষ্মণকে সম্বোধন করে রামচন্দ্র বলছেন,

ন মে স্বর্ণময়ী লঙ্কা রোচতে তাত লক্ষ্মণ।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী॥

রামচন্দ্রের মুখে জন্মভূমির এই প্রশস্তি নাকি বাল্মীকি রামায়ণের বঙ্গীয়

সংস্করণেই শুধু পাওয়া যায়। কিন্তু 'শুকসপ্ততি'-কারের কণ্ঠেও এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি শুনে বিস্মিত হতে হয়:

সর্বস্বর্ণময়ী লঙ্কা ন মে রোচতে লক্ষ্মণ।
পিতৃক্রমাগতাযোধ্যা নির্ধনাপি সুখায়তে ॥[১২১]

হয়তো 'রামায়ণ' ও 'শুকসপ্ততি' থেকে উদ্ধৃত শ্লোক দুটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের রচনা। কিন্তু 'মাতৃভূমি'র কল্পনা আমাদের দেশে প্রতীচ্য-সংস্পর্শের পূর্বে ছিল না, গ্রীয়ারসনের এই উক্তি নিতান্তই অজ্ঞতাপ্রসূত।

এ বিষয়ে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'The Soul of India' (১৯১১) গ্রন্থের তৃতীয় পত্র 'India the Mother' শীর্ষক রচনায় যে আলোকপাত করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন:

Our history is the sacred biography of the Mother. Our philosophies are the revelations of the Mother's mind. Our arts—our poetry and our painting, our music and our drama, our architecture and our sculpture, all these are the outflow of the Mother's diverse emotional moods and experiences. Our religion is the organised expression of the soul of the Mother. The outsider knows her as India. The outsider sees only her outer and lifeless physical frame. The outsider sees her as a mere bit of earth, and looks upon her as only a geographical expression and entity. But we, her children, know her even to-day as our father and their fathers had done before, for countless generations, as a Being, as a manifestation of *Prakriti*, as our mother and the Mother of our race. And we have always worshipped and do still worship her as such.[১২২]

অর্থাৎ বিপিনচন্দ্রের মতে, জন্মভূমিকে আমাদের এবং আমাদের জাতির মাতা হিসাবে দেখার দৃষ্টি আমরা ইদানীন্তন কালে গড়ে তুলি নি। এ দৃষ্টি আমরা বহু প্রাচীন কাল থেকেই পুরুষপরম্পরাগতভাবে পেয়েছি। তাছাড়া, ভারতভূমি এক এবং অভিন্নবর্গীয় মানুষের জন্মভূমি নয়। বহু বর্ণ, বহু রক্ত, বহু ধর্ম, বহু ভাষা ও বহু সংস্কৃতির সম্মিলনে ভারতীয় মহাজাতির উদ্ভব হয়েছে। বহুবিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেই এই পুণ্যভূমিতে মহা-মানবের জন্ম। তাই ভারতের জাতীয়তা বহু প্রজাতির মেলবন্ধনে এক আদর্শ জাতীয়তা। বিপিনচন্দ্রের ভাষায়, 'In fact, India furnishes a model

of that Universal Federation, the Federation of the World, whieh is the dream of the seers and prophets of modern Western humanity.[১২৩]

২৪

অধ্যাপক বিনয় সরকার 'বন্দে মাতরম্'কে বলেছেন 'কোঁতীয় স্তোস্ত্র'—'Comtist Hymn'. তিনি বলেছেন,

'Chatterji's patriotic doctrine of the country as the object of worship is integrally associated with his Comtist religion in which humanity (and not Divinity) commands adoration. ***Bande Mataram*** is a Comtist hymn, an antitheocratic ode of nationalism free from the cult of Gods.[১২৪]

অধ্যাপক সরকারের এই মন্তব্য যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করে দেখা প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে কোঁত্, বেন্থাম, মিল এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের দার্শনিক চিন্তা বাঙালী চিন্তানায়কগণের চিত্তে বিচিত্ররূপে ক্রিয়াশীল হয়েছিল। বিদ্যাসাগর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বাংলার মনীষিবৃন্দের উপর কোঁতের দর্শনের প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। সম্ভবত কোঁতের প্রভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম জীবনে নাস্তিক ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আগে আমি নাস্তিক ছিলাম।[১২৫] বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র ১৮৮১ সালে পরলোক গমন করেন। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখছেন : '১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে যাদবচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন। (১১৯৯-১২৮৭)। তখনো বঙ্কিমচন্দ্র 'ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন' ছিলেন।[১২৬]

অধ্যাপক বিনয় সরকার 'বন্দে মাতরম্'-কে যে বলেছেন, 'an anti-theocratic ode of nationalism free from the cult or Gods', এ কথা সমর্থনযোগ্য হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-সংগীতকে 'Comtist hymn' বলা কতদূর যুক্তিসংগত তা বিচারসাপেক্ষ।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থের 'উপক্রম' অংশে গ্রন্থের 'মূলকথা' বলে প্রথম খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যথাক্রমে 'কোঁতের দৃষ্টবাদ' এবং 'বেন্থামের হিতবাদ'-এর সঙ্গে বঙ্কিম-সান্নিধ্যের বিষয় আলোচনা করেছেন। তারপর তিনি তৃতীয় থেকে সপ্তম—এই পাঁচ অধ্যায়ে 'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বে'র বিশ্লেষণ করেছেন।

কোঁতের মতে মানুষের চিন্তাধারা তিনটি 'ক্রম' পেরিয়ে চলেছে—আধিদৈবিক আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক। প্রথম অর্থাৎ আধিদৈবিক ক্রমে মানুষ প্রত্যেক প্রাকৃতিক ব্যাপারের পিছনে দেবদেবীর ক্রিয়াকলাপের কল্পনা করে—'regards all effects as the productions of supernatural agents.' আধ্যাত্মিক ক্রমে ওই সব দেবদেবীরা 'অ-দৃষ্ট' প্রতীকে পরিণত হয়ে ধর্ম ও দর্শনের সাংকর্ষ সৃষ্টি করে। 'The supernatural agents give place to abstract forces, personified abstractions.' হীরেন্দ্রনাথ বলেছেন, পরিণত বয়সেও [১২৯৫] গীতার ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কোঁতের এই মতের অনুগামী ছিলেন। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকের [ন জায়তে ম্রিয়তে বা···] ব্যাখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'আত্মার অবিক্রিয়ত্ব একটা দার্শনিক মত। প্রাচীন কালে সকল দেশে, দর্শন ধর্মের স্থান অধিকার করে এবং ধর্ম দর্শনের অনুগামী হয়। ইহা উভয়েরই অনিষ্টকারী। ধর্ম ও দর্শন পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইলেই উন্নতি হয়, নচেৎ হয় না। এই তত্ত্বটি সপ্রমাণ করিয়া কোঁৎ ও তৎশিষ্যগণ দর্শন ও ধর্ম উভয়েরই উপকার করিয়াছেন। আমাদিগেরও সেই মার্গাবলম্বী হওয়া উচিত'।[১২৭]

'কোঁতের তৃতীয় বা আধিভৌতিক ক্রমই বৈজ্ঞানিক ক্রম। এই 'ক্রমে' কার্যকারণের শৃঙ্খলা সাব্যস্ত হইয়া মানবচিন্তা দৃষ্টবাদের (Positivism-এর) তুঙ্গ চূড়ায় সুস্থিত হয়।[১২৮] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রবন্ধপুস্তকের নাম 'বিজ্ঞানরহস্য'। প্রবন্ধগুলি ১২৮০-৮১ বঙ্গাব্দের মধ্যে লেখা। 'বিজ্ঞানরহস্যে' 'জৈবনিক' নামে একটি প্রবন্ধ আছে। 'সূচীপত্রে' তার ইংরেজি নাম 'Protoplasm'। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র এবং আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে বিবাদের উল্লেখ করে বলেছেন, 'এই বিবাদে ভারতবাসীরা 'মধ্যস্থ'। 'মধ্যস্থ'রা আবার তিন শ্রেণীভুক্ত। প্রথম শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন, 'প্রাচীন দর্শন আমাদের দেশীয়। ···সুতরাং প্রাচীন মতই মানিব।' দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যস্থরা দোলাচল-চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন। প্রাচীন বা নবীন—কিছুতেই তাঁহাদের আস্থা দৃঢ় নয়। কিন্তু 'বিজ্ঞান মানিলে বিনা কষ্টে হিন্দুয়ানির বাঁধাবাঁধি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সে অল্প সুখ নহে। সুতরাং বিজ্ঞানই মানিব।'

'তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যস্থরা বলেন, "প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র দেশী বলিয়া তৎপ্রতি আমাদিগের প্রীতি বা অপ্রীতি নাই। আধুনিক বিজ্ঞান সাহেবি বলিয়া তাহাকে ভক্তি বা অভক্তি করিব না। যেটি যথার্থ হইবে, তাহাই

মানিব। 'সর্বজ্ঞ' বা 'সিদ্ধ' মানি না; আধুনিক মানুষাপেক্ষা প্রাচীন ঋষিদিগের কোন প্রকার বিশেষ জ্ঞানের উপায় ছিল তাহা মানি না—কেন না, যাহা অনৈসর্গিক, তাহা মানিব না। বরং ইহাই বলি যে, প্রাচীনাপেক্ষা আধুনিকদিগের অধিক জ্ঞানবত্তার সম্ভাবনা। কেন না, কোন বংশে যদি পুরুষানুক্রমে সকলেই কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া যায়, তবে প্রপিতামহ অপেক্ষা প্রপৌত্র ধনবান্ হইবে সন্দেহ নাই।…যিনি প্রমাণ দেখাইবেন, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিব। যিনি কোন আনুমানিক কথা বলিবেন, তাহার কোন প্রমাণ দেখাইবেন না, তিনি পিতৃপিতামহ হইলেও তাঁহার কথায় অশ্রদ্ধা করিব। দার্শনিকেরা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন…। এ দিকে বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিতেছেন…আমি যাহা তোমার কাছে প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিব, তুমি তাহাই বিশ্বাস করিও…। আমি যে প্রমাণ দিব তাহা প্রত্যক্ষ। সুতরাং বিজ্ঞানেই আমাদের বিশ্বাস।'[১২৯]

বলাই বাহুল্য, 'বিজ্ঞানরহস্যে'র বঙ্কিমচন্দ্র কোঁৎপন্থী। কিন্তু পরবর্তী জীবনে উভয়ের পথ স্বকীয়তায় পৃথগ্‌ভূত হয়েছে।

ধর্ম ও দর্শনকে পরিত্যাগ করে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর জীবনাদর্শ রচনা করতে গিয়ে কোঁত্ উত্তর-জীবনে বুঝতে পেরেছিলেন, মানুষের জীবনে উপাস্য বস্তুর প্রয়োজন অস্বীকার করার উপায় নেই। সেইজন্য তিনি ঈশ্বরের স্থলে 'মানব-দেবী'র পূজা (The Cultus of Humanity) প্রবর্তন করলেন।

'He, therefore, had recourse to what he calls the 'cultus of humanity', considered as a corporate being in the past, present and future, which is spoken of as the *Grand Etre.*

'…Yet the religious impulses of mankind were of the first importance and essential to social progress. He proposed therefore as a substitute for Deity the *Grand Etre,* Humanity, as the object of devotion and worship. Let us transfer the religious emotions from the Deity of the traditional religions to the conception of Humanity as a whole.'[১৩০]

কোঁতের এই 'মানবদেবী'-পূজার সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্বে'র তুলনা করলে উভয়ের জীবনাদর্শের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, মনুষ্যত্ব লাভই মানুষের ধর্ম। এই প্রসংগে বলা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমচন্দ্র গুরু-শিষ্য-সংবাদের পদ্ধতিতে তাঁর ধর্মতত্ত্ব রচনা

করেছেন। অধ্যাপক বিনয় সরকার বলেছেন, আলোচনার এই রীতিও বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করেছেন কোঁতের গ্রন্থ থেকে। সরকার লিখেছেন, 'The Dialogue form with which we are familiar in Chatterji's discussion···may have to be traced back to Comte's Catechisme Positiviste (1852), which contains thirteen conversations between a woman disciple and a philosophic priest.'[১৩১] বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মের নাম অনুশীলন ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে অনুশীলন আর অভ্যাস এক নয়। তাঁর গুরু শিষ্যকে বলেছেন, 'অনুশীলন শক্তির অনুকূল; অভ্যাস শক্তির প্রতিকূল। অনুশীলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার।' তাই অভ্যাস নয়, 'অনুশীলনই ধর্ম'। গুরু বলেছেন, 'আমি ঠিক পাশ্চাত্যদিগের অনুসরণ করিতেছি না।···সত্যের অনুসরণ করিলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে।' উদ্দেশ্য হল অনুশীলনের দ্বারা মনুষ্যত্ব লাভ, কেননা, মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম। গুরু বলছেন, মানুষের বৃত্তি-নিচয়কে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়: শারীরিকী বৃত্তি, জ্ঞানার্জনী বৃত্তি, কার্যকারিণী বৃত্তি ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। এই চতুর্বিধ বৃত্তির উপযুক্ত স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্য যখন সম্পূর্ণ হয় তখন মানুষের বৃত্তিনিচয় ঈশ্বরমুখী হয়। এই ঈশ্বরমুখতাই যথার্থ অনুশীলন। কিন্তু ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, এই জন্য সর্বভূতে প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। গুরু দ্বিধাহীন ভাষায় বলেছেন, 'মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই।' কমলাকান্তও বলেছিল, 'প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি।'

ধর্মতত্ত্বের উপসংহারে গুরুর কাছে শিষ্য অনুশীলন ধর্মের মূলতত্ত্ব যেভাবে বুঝেছে তা বিশ্লেষণ করে বলছে, 'সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই।' অর্থাৎ সর্বজনীন প্রীতিই ধর্ম। এই প্রীতির বিভিন্ন স্তর; আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি ও জাগতিক প্রীতি। জাগতিক প্রীতিই প্রীতিবৃত্তির শেষ সীমা। কিন্তু শিষ্যের কণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, 'ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, স্বদেশপ্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত।' শিষ্যের এই উক্তির সমর্থন করে 'ধর্মতত্ত্বের' অন্তিম বাক্যে গুরুও বলছেন, 'সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।'

বঙ্কিমচন্দ্র জাগতিক প্রীতিকেই প্রীতিবৃত্তির শেষ সীমা জেনেও কেন বললেন, 'স্বদেশপ্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত'—এ প্রশ্নের সদুত্তর

বুঝতে হলে 'ধর্মতত্ত্বে'র চতুর্বিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত 'স্বদেশপ্রীতি' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য স্পষ্ট করে বোঝা প্রয়োজন।

প্রথমেই তিনি গুরুর মুখে বলেছেন, তিনি যে স্বদেশপ্রীতির কথা বলেছেন তা য়ুরোপীয় Patriotism থেকে স্বতন্ত্র। 'ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে।'[১৩২]

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, প্রকৃত স্বদেশপ্রীতি ও জাগতিক প্রীতির মধ্যে কোনো বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই। গুরু বলছেন, 'জাগতিক প্রীতির সঙ্গে, আত্মপ্রীতি বা স্বজনপ্রীতি বা দেশপ্রীতির কোন বিরোধ নাই। যে আক্রমণকারী তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব, কিন্তু তাহার প্রতি প্রীতিশূন্য হইব কেন?…আমি কখনও কাহারও অনিষ্ট করিব না। কোন মনুষ্যেরও করিব না এবং কোন সমাজেরও করিব না। আপনার সমাজের যেমন সাধ্যানুসারে ইষ্টসাধন করিব, সাধ্যানুসারে পর-সমাজেরও তেমনি ইষ্টসাধন করিব। সাধ্যানুসারে, কেন না কোন সমাজের অনিষ্ট করিয়া অন্য কোন সমাজের ইষ্টসাধন করিব না। পর-সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া, আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহারেও আপনার সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য।'[১৩৩]

সর্বজীবে সমদর্শন এবং জাগতিক প্রীতি ও স্বদেশপ্রীতির সামঞ্জস্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার অনুসরণ করতে হলে কয়েকটি রচনার কালক্রমের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব' এবং 'একটি গীত' প্রকাশিত হয় ১২৮১ বঙ্গাব্দের কার্তিকে ও ফাল্গুনে। 'বন্দে মাতরম্' ১২৮২ বঙ্গাব্দের কোনো এক সময় বা তার কিছু পূর্বে। বঙ্গদর্শনে 'আনন্দমঠে'র সূত্রপাত ১২৮৭ সালের চৈত্র মাসে; আর 'নবজীবনে' ধর্মতত্ত্বের প্রাথমিক রূপের প্রকাশ ১২৯১-৯২ বঙ্গাব্দে। ১২৯২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণের 'নবজীবনে' ধর্মতত্ত্বের 'প্রীতি' শীর্ষক আলোচনা প্রকাশিত হয়। ১২৯৫ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় 'প্রীতি' বিস্তার লাভ করে। অর্থাৎ ১২৮১ থেকে ১২৯৫ বঙ্গাব্দের মধ্যে বঙ্কিমমানসে প্রীতিবৃত্তির যে বিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে তাতে জাগতিক প্রীতি ও স্বদেশপ্রীতির সামঞ্জস্য কখনো বিনষ্ট হয় নি। কিন্তু তথাপি ১২৯৫ বঙ্গাব্দেও বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, 'সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি,

ইহা বিস্মৃত হইও না।' এই জন্যই অরবিন্দের উক্তি পুনঃস্মরণীয় : 'The religion of patriotism,—this is the master idea of Bankim's writings.' এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। তিনি বেলুড় মঠে যে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সন্তান-সম্প্রদায়ের সম্পর্ক আছে কিনা আপাতত সে প্রশ্ন উত্থাপন না করেও বলা যায়, 'সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না'—বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্য বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কণ্ঠেও উচ্চারিত হয়েছে। ১৮৯৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি 'ভারতের ভবিষ্যৎ' সম্পর্কে তিনি যে ইংরেজি ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেছেন,

For the next fifty years this alone shall be our keynote—this our great Mother India. Let all other vain gods disappear for the time from our minds. This is the only God that is awake, our own race, everywhere his hands, everywhere his feet, everywhere his ears, he covers everything.[১৩৪]

২৫

'অনুশীলন ধর্মে'র প্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্রের মতে 'স্বদেশপ্রীতিই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম'। এই প্রসঙ্গে 'আনন্দমঠে'র উপক্রমণিকার কথাও মনে পড়ছে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশের সময় ছিল, অরণ্যে সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে অননুভবনীয় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রশ্ন উত্থিত হল :

'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?'
'এইরূপ তিন বার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল ! তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কি !"
প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবনসর্বস্ব।"
প্রতিশব্দ হইল, "এ পণে হইবে না।"
"আর কি আছে ? আর কি দিব ?"
তখন উত্তর হইল, "তোমার প্রিয়জনের প্রাণসর্বস্ব।"[১৩৫]

গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় বঙ্কিমচন্দ্র উপক্রমণিকার এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিবর্তন করেছেন। 'প্রতিশব্দ হইল, "এ পণে হইবে না" থেকে শেষ তিন পংক্তি নিম্নভাবে পুনর্লিখিত হয়েছে :

প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"
"আর কি আছে ? আর কি দিব ?"
তখন উত্তর হইল, "ভক্তি।"

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে, 'ভক্তি' বলতে বঙ্কিমচন্দ্র কী বুঝেছেন ? অর্থাৎ কার প্রতি ভক্তি, ভক্তির অর্থই বা কী ? ভগবদ্‌ভক্তেরা বলেন, ঈশ্বরে পরম অনুরক্তিই ভক্তি। 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও আনন্দমঠের পুরোভাগে গীতার 'ভক্তিযোগ' শীর্ষক দ্বাদশ অধ্যায় থেকে ৬, ৭, ৮ ও ৯—এই চারটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন—

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

অর্থাৎ, 'হে পার্থ', যাঁহারা সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণপূর্বক 'আমিই পরম পুরুষার্থরূপে উপাস্য'—এইভাবে মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য যোগের দ্বারা আমার উপাসনা ও ধ্যান করেন, আমাতে আবিষ্টচিত্ত সেই সকল ভক্তকে জন্মমৃত্যুরূপ সংসারসাগর হইতে আমি উদ্ধার করি। অতএব বিশ্বরূপ আমাতেই তুমি মন সমাহিত কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর : এইরূপ করিলে দেহান্তে তুমি নিশ্চয়ই মৎস্বরূপে স্থিতিলাভ করিবে, ইহাতে সন্দেহ করা উচিত নহে। হে ধনঞ্জয়, যদি তুমি আমাতে স্থিরভাবে চিত্ত সমাহিত করিতে না পার, তাহা হইলে অভ্যাসযোগের দ্বারা বিশ্বরূপ আমাকে লাভ করিতে যত্ন কর।'[১৩৬]

এই শ্লোকচতুষ্টয়ের অন্তিম শ্লোকে 'অভ্যাস'-যোগের কথা বলা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ধর্মতত্ত্বে 'অনুশীলন'কে 'অভ্যাস থেকে পৃথক করে দেখিয়েছেন। গীতোক্ত ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণ 'পরমপুরুষার্থরূপে উপাস্য।' কিন্তু আনন্দমঠের সন্তানগণের একমাত্র উপাস্য দেবতা হলেন জননী জন্মভূমি। সুতরাং আনন্দমঠের উপক্রমণিকায় প্রোক্ত 'ভক্তি' হল জন্মভূমির প্রতি পরম অনুরক্তি। জন্মভূমির প্রতি ভক্তিই সন্তানের 'পরমপুরুষার্থ'।

এর সমর্থনে প্রথমেই বলা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতরম্'-এর প্রথম

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণেও জননী জন্মভূমিকে 'বিষ্ণুর মাথার উপরে' স্থাপন করেছিলেন। ব্রহ্মচারীর সঙ্গে মহেন্দ্র দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। ...'ঘরের ভিতরে কি আছে' মহেন্দ্র প্রথমে তাহা দেখিতে পাইল না—দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে ক্রমে দেখিতে পাইল, এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্তি, শংখচক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তুভশোভিতহৃদয়, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণায়মানপ্রায় স্থাপিত। মধুকৈটভ স্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মূর্তি রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িত-কুন্তলা শতদলমালামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষিণে সরস্বতী পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, মূর্তিমান রাগরাগিণী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সর্বোপরি বিষ্ণুর মাথার উপর উচ্চ মঞ্চে বহুল রত্নমণ্ডিত আসনোপবিষ্টা এক মোহিনী মূর্তি—লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা। গন্ধর্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে।'[১৩৭]

মহেন্দ্র ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে উনি ?' ব্রহ্মচারী বললেন, 'মা'। মহেন্দ্র—'মা কে ?' ব্রহ্মচারী বললেন, 'আমরা যাঁর সন্তান।' বিস্মিত মহেন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'কে তিনি ?' ব্রহ্মচারী বললেন 'সময় হলে চিনবে। বল, বন্দে মাতরম্।' এই বলে ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে নিয়ে গেলেন। সেখানে মহেন্দ্র দেখলেন অতীতে মা যা ছিলেন—অর্থাৎ তাঁর জগদ্ধাত্রী মূর্তি। তারপরে ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দেখলেন 'মা যা হইয়াছেন' সেই হৃতসর্বস্বা কংকালমালিনী নগ্নিকা কালিকামূর্তি। তারপর ব্রহ্মচারী সেই অন্ধকার ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠ থেকে সোপানশ্রেণী আরোহণ করে মর্মর প্রস্তর-নির্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে 'মা যা হইবেন' সেই সুবর্ণনির্মিতা দশভুজা দুর্গামূর্তি দেখতে পেলেন।

বলাই বাহুল্য, জগদ্ধাত্রী, কালী এবং দুর্গা—এই ত্রিকালীন মূর্তি জন্মভূমির ভূত বর্তমান ও ভবিষ্যতের কবিকল্পিত বাক্‌প্রতিমা। এইখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। বিষ্ণু, জগদ্ধাত্রী এবং দুর্গামূর্তি যে তলে অবস্থিত, কালীমূর্তি সে তলে নয়। তাঁকে স্থাপন করা হয়েছে ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। 'মা যা হইবেন' সেই তলে পৌঁছতে সোপানশ্রেণী আরোহণ করে ঊর্ধ্বে উঠতে হয়েছে। জাতীয় জীবন যে 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা'য় চলছে—এ তারই প্রতীক। আনন্দমঠের বিষ্ণুমন্দিরে বিষ্ণুর 'মাথার উপরে রত্নমণ্ডিত আসনে উপবিষ্ট', লক্ষ্মী সরস্বতীর চেয়েও অধিক ঐশ্বর্যমণ্ডিতা মাতৃমূর্তিই দেশজননীর মূর্তি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকেই সর্বোপরি

সংন্যস্ত করেছেন। সুতরাং তিনিই স্বদেশভক্ত সন্তানের পরম পুরুষার্থরূপে উপাস্য।

এই দেশমাতাই 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের মাতা। আনন্দমঠের প্রথম খণ্ডের দশম অধ্যায়ে ভবানন্দ যখন গানটি গাইতে শুরু করলেন।

সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং
মাতরম্

তখন বিস্মিত মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন "মাতা কে?" কোনো উত্তর না দিয়ে ভবানন্দ গানের প্রথম কলি সমাপ্ত করলেন

শুভ্র জ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

তখন মহেন্দ্র বললেন, "এ ত দেশ, এ ত মা নয—" উত্তরে ভবানন্দ তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই; স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা…"

মহেন্দ্র ভবানন্দকে বাক্যটি পূর্ণ করতে দিলেন না, আবেগভরে বললেন, আবার গাও। ভবানন্দ এবার সমস্ত 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটি গাইলেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আনন্দমঠের সন্তানেরা বিষ্ণু-উপাসক। তাই চতুর্থ সংস্করণ থেকে উপন্যাসে মাতৃমূর্তি আর বিষ্ণুর মাথার উপরে নেই, তিনি 'বিষ্ণুর অঙ্কোপরি' স্থাপিত হয়েছেন। কিন্তু পুনশ্চ আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, 'আনন্দমঠে' বন্দে মাতরম্ অভিযোজিত হয়েছে মাত্র,—দুটি রচনা অপৃথক্‌যত্নসম্ভূত নয়। আনন্দমঠ কথাশিল্প, আর 'বন্দে মাতরম্' কবি বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানসমুখ স্বদেশমন্ত্র। অবশ্য উপন্যাস এবং সংগীত—উভয়েরই আলম্বন স্বদেশপ্রেম। তাই 'বন্দে মাতরম্' 'আনন্দমঠে'র অঙ্গীভূত হওয়ায় সংগীতের ভাবরূপটি উপন্যাসের প্রাণমন্ত্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু উপন্যাসটি সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনীভিত্তিক হওয়ায় কথাশিল্পীর গল্পগ্রন্থনে ইতিহাস এবং কল্পনা পরিপূর্ণ একাত্মীভূত হয়ে উঠতে পারে নি। তার ফলে উপন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে সংগীতটির

অপব্যাখ্যারও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আনন্দমঠের সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে স্বদেশ-সংগীতরূপে 'বন্দে মাতরমে'র বিচারই যথার্থ বিচার।

২৬

'বন্দে মাতরম্' একাধারে স্বদেশমন্ত্র এবং স্বদেশসংগীত। ঐতিহাসিকগণের কেউ কেউ বলেছেন, 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে'র বিদ্রোহীরা 'ওঁ বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করত। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠের তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে 'বাঙ্গালার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস' ইংরেজি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। এই ইতিহাসের উপাদান সংকলিত হয়েছে Warren Hastings' Letters in Gleig's Memoirs থেকে। পরিষৎ সংস্করণের ঐতিহাসিক ভূমিকায় যদুনাথ সরকার লিখেছেন, 'তাঁহার (বঙ্কিমচন্দ্রের) 'সন্তানে'রা বাঙালী ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলে, গীতা যোগশাস্ত্র প্রভৃতিতে পণ্ডিত; কিন্তু যে সব 'সন্ন্যাসী ফকিরেরা' সত্য ইতিহাসের লোক, এবং উত্তরবঙ্গে (বীরভূম নহে) ঐ সব অত্যাচার করে তাহারা এলাহাবাদ কাশী ভোজপুর প্রভৃতি জেলার পশ্চিমে লোক এবং প্রায় সকলেই নিরক্ষর, ভগবদ্‌গীতার নাম পর্যন্ত জানিত না। বঙ্কিমের সন্তানসেনা বৈষ্ণব, আর আসল 'সন্ন্যাসী'রা ছিল শৈব, আজ পর্যন্ত তাহাদের নাগা-সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে, যদিও ইংরেজের ভয়ে তাহারা এখন অস্ত্র রাখিতে বা লুঠ করিতে পারে না। এই সব সন্ন্যাসী গোঁসাই যোদ্ধাদের প্রকৃত ইতিহাস 'রাজেন্দ্রগিরি গোঁসাই' (মৃত্যু দিল্লীর বাহিরে যুদ্ধে, ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে) এবং তাহার চেলা 'হিম্মৎ বাহাদুর' সম্বন্ধে রচিত ফারসী গ্রন্থ এবং হিন্দী 'হিম্মৎ বাহাদুর বিরুদাবলী' প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার বিপ্লবকারী সন্ন্যাসীদের অতি মূল্যবান সত্য বিবরণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'Dawn of New India' (1927)-তে এবং রায় সাহেব যামিনীমোহন ঘোষ তাঁহার 'Sannyasi Fakir Raiders of Bengal' গ্রন্থে (Bengal Secretariat Book Depot, 1930) দিয়াছেন।......সত্যকার সন্ন্যাসী ফকিরেরা অর্থাৎ পশ্চিমে গিরিপুরীর দল, একেবারে লুঠেরা ছিল, কেহ কেহ অযোধ্যা সুবায় জমিদারিও করিত; মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল।'[১৩৮]

ঐতিহাসিকপ্রবর যদুনাথ সরকারের এই তুলনামূলক আলোচনা থেকে বলা যায়, লুঠেরা সন্ন্যাসী ফকিরদের সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের সন্তানসম্প্রদায়ের

কোনোই সাদৃশ্য নেই। তেমনি তাদের 'ওঁ বন্দে মাতরম্'-আরাব আর বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃমন্ত্র 'বন্দে মাতরম্'-এর মধ্যে চেতনার দুস্তর ব্যবধান। ওঁ-'ধ্বনি বর্জনের ফল 'বন্দে মাতরম্' দেবলোকের সম্পর্কমুক্ত হয়ে মর্ত্য-লোকের প্রাণমন্ত্র হয়ে উঠেছে।

বিপিনচন্দ্র পাল মন্ত্র ও স্তোত্রের উদ্ভব ও বিকাশের অপূর্ব বিশ্লেষণ করেছেন ১৩১৬ সালে, অরবিন্দ ঘোষ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'ধর্ম' পত্রিকায়।[১৩৯] ওই সাপ্তাহিকের পৌষ ও মাঘ মাসের তিন সংখ্যায় 'বন্দে মাতরম্' শিরোনামে ধারাবাহিক প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধটি দুর্ভাগ্যবশত কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় লোকলোচনের অন্তরালে চলে গিয়েছে। বিপিনচন্দ্রের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ নিম্নে সূত্রাকারে তাঁরই ভাষায় প্রদত্ত হল :

১. বন্দে মাতরম্ মন্ত্র, কারণ এই মন্ত্র ভক্তিভরে জপ করিলে, মায়ের স্বরূপ চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

২ বন্দে মাতরম্ মায়ের সাধনমন্ত্র, মায়ের স্বরূপের সংকেত, মায়ের স্মারকচিহ্ন।.. এই সিদ্ধমন্ত্রের উচ্চারণে বা স্মরণে, মায়ের সমগ্ররূপ ফুটিয়া উঠে।

৩. ইহার প্রকৃত অর্থ রূঢ়, যৌগিক নহে। ...ইহার প্রকৃত অর্থ কেবল মা। এই মন্ত্র জপিতে জপিতে মায়ের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। স্বরূপ অদ্বৈত বস্তু। স্বরূপ অভেদ বস্তু। স্বরূপকে ভাগ করা যায় না।... সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা এই যে বসুন্ধরা দেখিতেছ, এই যে শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনী, ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনী প্রকৃতিকে দেখিতেছ,—এ মায়ের বিগ্রহ। মাকে পৃথক করিয়া দাও,—ইহার বিগ্রহত্ব অমনি লুপ্ত হইবে।

৪. আমার মা—ইহাই বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের বিশেষত্ব। আমার মার বিগ্রহ বলিয়া এই সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা প্রকৃতির সঙ্গে আমার বিশেষ একটা সম্বন্ধ আছে। অন্যদেশের প্রকৃতির সঙ্গে সে সম্বন্ধ নাই। আর এই যে বিশেষত্ব—ইহাই সর্বত্র ভক্তির প্রাণ।...প্রকৃত ভক্তি ঐকান্তিক বস্তু। মাতৃভক্ত মাকে এই ঐকান্তিকী ভক্তি প্রদান করেন।[১৪০]

৫. শাস্ত্রে বলে, সৃষ্টি দুই প্রকারের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত।...একবিধ জ্ঞানের অবলম্বন ইন্দ্রিয়, অপরের অবলম্বন সমাধি, প্রাকৃতে ও অপ্রাকৃতে পার্থক্য এই। ধ্যান এই অপ্রাকৃত জগতের দ্বারস্বরূপ। ধ্যানে বহিরিন্দ্রিয়ের চেষ্টা ক্রমে রুদ্ধ হইয়া আসে। সমাধিতে এ চেষ্টা একান্তভাবে রহিত হইয়া যায়।...সমাধিতে যাহা প্রত্যক্ষ হয় তাহা অপ্রাকৃত। সমাধিভঙ্গে, সেই

অপ্রাকৃত সাক্ষাৎকারের পুণ্যস্মৃতি, উপযোগী প্রাকৃত বিষয়কে অবলম্বন করিয়া মানসপটে প্রকাশিত হয়।...এই মানসরূপ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়।

৬. দেবতার ধ্যান মাত্রই প্রকৃতাপ্রাকৃত মিশ্রিত। ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং—ইত্যাদিতে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দুই মিশিয়া আছে। এখানে মহেশং—অভিধেয়, রজতগিরিনিভং তার অনুবাদ। আগে অভিধেয় পরে অনুবাদ। আগে বিশেষ্য পরে বিশেষণ। যিনি সমাধিতে মহেশের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার জ্ঞানে মহেশই সত্য, রজতগিরিনিভ ইত্যাদি তাহার উপমা।...ধ্যানের যে ভাবাংগ তাহা প্রাকৃতকে অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠে। সমাধিলব্ধ সত্যে তখন রঞ্জনীর বিচিত্র রং ফলিতে আরম্ভ করে, তখনই এই ভাবাংগ ফুটিয়া উঠে। আর এই ভাবাংগ অবলম্বনে, অপ্রাকৃত সত্য ও সত্তা প্রাকৃত সৃষ্টিতে আবির্ভূত হইয়া সাধকের মনোরঞ্জন করেন।

৭. এইরূপে প্রাকৃত অপ্রাকৃতের অপূর্ব মিশ্রণে, অন্তরস্থ ধ্যানলব্ধ দেবতার স্বরূপকে, সাধক প্রথমে আপনার মানসপটে, ক্রমে বাহিরে, কাব্যে বা চিত্রে, সংগীতে বা ভাস্কর্যে, প্রকটিত করিয়া আপনার জ্ঞান ও ভাবের সমধিক চরিতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন।[১৪১]

৮. বন্দে মাতরম্ সংগীতে মায়ের যে রূপ বর্ণনা আছে, তাহা একান্ত কল্পিত নহে।...কল্পনায়, এক স্থানে, এক সময়ে, এক বস্তুতে যাহা দেখা গিয়াছিল, অন্য স্থানে, অন্য সময়ে, অপর বস্তুতে যেখানে তাহা প্রত্যক্ষ নয় —সেই আগেকার অভিজ্ঞতা আরোপ করে। বেদান্তে ইহাকেই অধ্যাস বলে।...কল্পনা কখনো জ্ঞাতসারেও কার্য করে। কবির কল্পনা এই শ্রেণীর। এখনে কল্পনা স্বল্পবিস্তর উপমা মাত্র। আর এ উপমার সত্যাসত্য বাহিরের বস্তুর দ্বারা পরিমিত হয় না, মনের ভাবের দ্বারাই তাহার অর্থ করিতে হয়।

৯. ধ্যানযোগে যেমন ইন্দ্রিয়ের রাজ্য হইতে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে যাইতে হয়, কল্পনা সহায়ে সেইরূপ অতীন্দ্রিয় অনুভব ও প্রত্যক্ষের কথা, এই ইন্দ্রিয়, এই পার্থিব জগতে ব্যক্ত করিতে হয়। ইহার অন্য পন্থা নাই।...কল্পনা এক্ষেত্রে মিথ্যা নহে। এখানে কল্পনা উপমা মাত্র।

১০. সাধক সমাধিতেই মায়ের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু স্বরূপে ও রূপে পার্থক্য আছে।...সমাধির অবস্থায় দ্রষ্টা আপনার স্বরূপে অবস্থান করেন। যোগশাস্ত্রে ইহাকেই তো সমাধি কহে। দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থিতম্। কিন্তু তাঁর নিজের তো একটা রূপও আছে। এই রূপ পঞ্চকোষাত্মক।

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, এই পঞ্চকোষের ভিতরে, এই পঞ্চকোষের অতীতে, তার স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত। এই কোষপঞ্চক ক্রমে জড় হইতে অজড়ে, প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতে, ধাপে ধাপে উন্নীত হইয়াছে। আমাদের যেমন রূপ ও স্বরূপ, এই দুইই আছে। দুই পরস্পরের মাখামাখি হইয়া রহিয়াছে ; মায়েরও তাহাই। মায়ের স্বরূপের সঙ্গে সঙ্গে রূপ সমাধিগম্য ; রূপ চক্ষুগ্রাহ্য ভাবগ্রাহ্য।...বন্দে মাতরম্ সংগীতে মায়ের পঞ্চকোষাত্মক রূপের বর্ণনা আছে। এ রূপ সত্য, মিথ্যা নহে। প্রত্যক্ষ, কল্পিত নহে ; ইহাতে কোনো অধ্যাসও নাই।[১৪২]

'বন্দে মাতরমে' বিপিনচন্দ্র প্রথমে দেখেছেন মন্ত্র, তারপর স্তব। এই মন্ত্র ভক্তিভরে জপ করলে মায়ের স্বরূপ চিত্তে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বিপিন-চন্দ্র একথাও বলেছেন, মন্ত্র মাত্রেরই অর্থ রূঢ়, যৌগিক নয়। যৌগিক অর্থে বন্দে মাতরমের অর্থ 'মাকে বন্দনা করি।' রূঢ় অর্থে তার অর্থ কেবল মা, আমার মা। এই মায়ের নাম বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘদিন ভক্তিভরে জপ করেছেন। কমলাকান্ত বঙ্কিমের অন্তরতর কবিসত্তা। কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব' এবং 'একটি গীতে' এই মাতৃ-মন্ত্রই উচ্চারিত হয়েছে।

বিপিনচন্দ্র বলেছেন, জন্মভূমি মায়ের বিগ্রহ। 'বন্দে মাতরম্' তাঁর সাধনমন্ত্র। এই মন্ত্র জপ করতে করতে মায়ের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। সমগ্র-রূপই তাঁর স্বরূপ। স্বরূপ অদ্বৈত ও অভেদবস্তু, তাকে ভাগ করা যায় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের পথে যখন তাঁকে দেখি তখন তাঁর প্রাকৃতরূপই প্রত্যক্ষগোচর হয়, সমাধিতে যখন তাঁকে দেখি তখন তাঁর অপ্রাকৃতরূপ মানস-প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয়। 'বন্দে মাতরমে' মায়ের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয়রূপই সমগ্রভাবে ধরা পড়েছে। প্রথমে ভক্তের ধ্যানদৃষ্টিতে তাঁর প্রাকৃত-রূপের প্রকাশ—

> সুজলাং সুফলাং
> মলয়জশীতলাং
> শস্যশ্যামলাং
> মাতরম্।
> শুভ্র-জ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীম্
> ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
> সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
> সুখদাং বরদাং মাতরম্।

মায়ের এই সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা বিগ্রহরচনা কবি

বঙ্কিমের এক অসামান্য কবিকৃতি। পুরাণাদিতে—বিষ্ণুপুরাণে ভাগবতে—মায়ের রূপ ও স্বরূপের বিচিত্র সুন্দর বর্ণনা আছে। কিন্তু 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে'—এমন লাবণ্যময়ী মূর্তি পূর্বে কোথাও দৃষ্ট হয় নি। তবু মনে রাখতে হবে, শুধু কবিকল্পনা নয়, মাতৃভক্তের ধ্যানলব্ধ এই মূর্তি। সামান্য দুটি তুলনায় আমাদের বক্তব্য বিশদীভূত হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর-সূরিদের মধ্যে প্রায় সবাই স্বদেশগীতাঞ্জলি রচনায় বঙ্কিমপন্থী; তাঁদের মধ্যে দুজন বিশিষ্ট গায়ককবির কথাই বলছি: দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ। মাতৃ-স্তোত্ররচনায় এই শতাব্দীর প্রথম দশকে উভয়েই অসামান্য কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্যপুষ্পভরা' গানটির কথাই ধরা যাক্:

ধনধান্যপুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা;
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা:
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি... ইত্যাদি

এ গানে কবিকল্পনা স্বদেশভাবনায় লীলায়িত হয়েছে। কিন্তু তদ্গত ভক্তের ধ্যান থেকে এ গানের উদ্ভব হয় নি। সত্য বটে, সন্তানের কাছে মায়ের মতো বস্তু আর নেই। তাই অন্যদেশের সঙ্গে স্বদেশের তুলনা কবিমানসে সমুদিত হয়েছে। আমরা বলছি না, এতে য়ুরোপীয় স্বাদেশিকতার প্রভাব পড়েছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের গানে মায়ের স্বরূপ কবিকল্পনার স্তর অতিক্রম করতে পারে নি। কেননা ভক্তের ধ্যানে মায়ের যে স্বরূপের প্রকাশ ঘটে তা অদ্বৈত। সেখানে মাতা-সন্তানের একাত্মীভূত সত্তা ছাড়া তৃতীয়ের অস্তিত্ব নেই, সুতরাং তুলনা তন্ময়ীভূত ধ্যানের বিঘ্নকারক। দ্বিজেন্দ্রলালের গানটি তাই সুন্দর, কিন্তু ধ্যানসম্ভূত নয়, কবিকল্পনাপ্রসূত।

রবীন্দ্রনাথের 'শরৎ' কবিতাটিকেও এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে। শরতে মায়ের 'মধুর মুরতি' কবিতাটির আলম্বন। কবি বলছেন,

আজি কি তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে।
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদীজলধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর,

ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
তোমার-কানন-সভাতে।
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
শরৎকালের প্রভাতে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই স্তবকের শেষ চরণে মাতৃবিগ্রহকে নিসর্গ-পরিবেশের মাঝখানে কবি স্থাপন করেছেন। তাই এও শুদ্ধ কবিকল্পনা। কেননা সমগ্র নৈসর্গিক রূপই মায়ের অবিচ্ছেদ্য রূপ। শব্দশিল্পের রূঢ় ধর্মেই রূপের মধ্যে স্বরূপের উদ্ভব হয়। 'বন্দে মাতরম' তা-ই হয়েছে। 'সুজলাং' থেকে 'দ্রুমদলশোভিনীং' পর্যন্ত প্রতিটি শব্দে মাতৃবিগ্রহ বিশেষিত। 'অভিধেয়' থেকে 'অনুবাদ'কে পৃথগ্‌ভূত করা যায় না, কেননা তাহলে বিগ্রহভঙ্গ হয়। সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা যে মা, বহুব্রীহি সমাসে গ্রথিত শব্দমালায় তিনি 'শুভ্র-জ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনী', এবং তৃতীয়া বা সপ্তমী তৎপুরুষে তিনিই 'ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনী।' কিন্তু মাতৃবিগ্রহ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে প্রথম স্তবকের শেষ দুই চরণে :

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

প্রথম চরণে ভক্তের ধ্যানদৃষ্টিতে চক্ষুকর্ণ একসঙ্গে পরিতৃপ্ত হয়েছে। এবং দ্বিতীয় চরণে তাঁর বাৎসল্যবিভাবিত মাতৃরূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে 'সুখদা বরদা'-অনুবাদে।

২৭

বিভেদকামী লীগপন্থীদের রাষ্ট্রনৈতিক চালে পর্যুদস্ত হয়ে কংগ্রেস 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের অঙ্গচ্ছেদ করে ওই সপ্তপংক্তিমাত্র রেখে লীগের মনস্তুষ্টির যে চেষ্টা করেছিলেন তার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু এই চেষ্টা যে পণ্ডশ্রম মাত্র হবে তা জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। রেজাউল করীম তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ' গ্রন্থের 'বন্দে মাতরমে আপত্তি কেন ?' প্রবন্ধে বলেছিলেন :

'দেশের 'মাইনরিটি' সম্প্রদায় কংগ্রেসের অবলম্বিত কোন কার্যের প্রতিবাদ করিলে, করাচী প্রস্তাব অনুসারে প্রত্যেক কংগ্রেস-কর্মী সেই প্রতিবাদ সম্বন্ধে একটা বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য। 'মাইনরিটি'র অভিযোগের প্রতিকার করিতে প্রস্তুত না হইলে করাচী প্রস্তাবের কোনই মূল্য

থাকে না। মুসলমানগণ 'বন্দে মাতরমে'র বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলিয়াছেন, তাহা কি সেই ধরণের অভিযোগ, যাহার প্রতিকার করাচী প্রস্তাবে পাওয়া যাইতে পারে? অথবা ইহা কি জিন্না সাহেবের চতুর্দশ দফার আর একটা বর্ধিত আকার, যাহার প্রতিকার কংগ্রেসের দ্বারা কোন মতেই হইতে পারে না? ইহা বিবেচনা করিবার বিষয় বটে। তবে একটা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, যে সব মুসলমান কংগ্রেসের দলভুক্ত, তাঁহারা এযাবৎ কেহই 'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করেন নাই। অথচ যাঁহারা চিরকালই কংগ্রেস-বিরোধী এবং কংগ্রেসে যোগদানের যাঁহাদের কোনই সম্ভাবনা নাই, কেবল তাঁহারাই 'বন্দে মাতরম্'কে উপলক্ষ করিয়া মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেস-বিদ্বেষ প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। এখানে আর একটা কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখিতেছি। কংগ্রেস যদি জিন্না-পন্থীদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য 'বন্দে মাতরম্' বাতিল করিয়া দেয়, তাহা হইলেও জিন্নাপন্থীদের একটি প্রাণীও কংগ্রেসের পতাকার তলে সমবেত হইবেন না। কারণ উদ্দেশ্য ত আর 'বন্দে মাতরম্' বাতিল করা নয়—অন্য একটা ষড়যন্ত্র পূর্ণ করিবার জন্য উহা একটা উপলক্ষ মাত্র।'[১৪৩]

রেজাউল করীম সাহেবের আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, তার প্রমাণ ১৯৩৮ সালে জিন্নার এগারো দফা দাবির মধ্যেই প্রকট হয়ে উঠল। পূর্বেই বলা হয়েছে, তার প্রথম দাবিই ছিল 'বন্দে মাতরম্' বর্জন। কাজেই রাষ্ট্র-নৈতিক সমাধান হিসাবে 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত যে ব্যর্থ হয়েছিল তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

তাছাড়া, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ঠিকই বলেছিলেন, 'সাধারণত এক একটি গান ও কবিতা—অন্তত এই গানটি—একটি অখণ্ড সমগ্র বস্তু। দুই দাবী-দারের মধ্যে একটি শিশুকে কাটিয়া ভাগ করিয়া দিলে যেমন তাহার প্রাণ যায়, অনেক কবিতা ও গানের দ্বিখণ্ডীকরণেও সেইরূপ তাহার প্রাণ যায়। এক্ষেত্রে হয়ত বন্দে মাতরমের অশত্রু কেহ কেহ 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' নীতির অনুসরণ করিয়া গানটির অধিকাংশ বর্জনে সায় দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তাহার প্রাণ গিয়াছে। যে-দুটি অংশ রাখা হইয়াছে 'সুখদাং বরদাং' তাছাড়া তাহার সমস্তটি মাতৃভূমির বাহ্য রূপ ও বাহ্য উপাদান বিষয়ক। গানটির পরবর্তী অংশে জন্মভূমি হইতে জনগণ যে ঐক্য শক্তি সাহস জ্ঞান ধর্ম বিদ্যা প্রভৃতির অনুপ্রেরণা পাইতে পারে ও পায়, তাহাই লিখিত হইয়াছে। বাহ্য রূপ অপেক্ষা এই প্রাণময়ী মনোময়ী আত্মিক মূর্তির মূল্য অধিক।'[১৪৪]

অর্থাৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে 'বন্দে মাতরমে'র যে-অংশ কংগ্রেস রক্ষা করেছেন তা মাতৃভূমির 'বাহ্য রূপ ও বাহ্য উপাদান বিষয়ক' ; যে অংশ বর্জিত হয়েছে তার মধ্যেই নিহিত আছে জন্মভূমির 'প্রাণময়ী মনোময়ী আত্মিক মূর্তি'।'

আমরা আলোচনার প্রথমেই বলেছি, 'বন্দে মাতরম্' সংগীতে জননী জন্মভূমির স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের বর্ণনা কবিকল্পনায় পরিশীলিত হয়ে আরো সত্য ও সার্থক হয়ে উঠেছে।'[১৪৫] মনে রাখতে হবে, বঙ্কিমের কাছে স্বদেশপ্রেম ছিল ধর্ম। সেই ধর্মেরই সাধনসংগীত 'বন্দে মাতরম্'। তাঁর কবিকল্পনা সেই সাধনার ভাবানুষঙ্গকেই অনুসরণ করেছে।

স্থূল শরীর ইন্দ্রিয়বেদ্য। সংগীতের প্রথম সপ্তপংক্তিতে জন্মভূমির স্থূল শরীরের বর্ণনাই মুখ্য। বর্জিত অংশে আছে সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের বর্ণনা। শাস্ত্রাদিতে সূক্ষ্মশরীর সম্পর্কে বলা হয়েছে :

বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥[১৪৬]

অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বের সমষ্টির নাম সূক্ষ্ম শরীর।

এই সূক্ষ্ম শরীর ধ্যানবেদ্য। এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের অপূর্ব বিশ্লেষণ পুনঃস্মরণীয়। তিনি বলেন :

'সৃষ্টি দুই প্রকারের, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। যাহা চক্ষুরাদি দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই প্রাকৃত সৃষ্টি। যাহা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হয় না, আর ইন্দ্রিয়-মুখাপেক্ষী অনুমান বা উপমানের গ্রাহ্য নহে, তাহাই অপ্রাকৃত।...প্রাকৃত সৃষ্টির প্রামাণ্য সমাধি হইতে উৎপন্ন অপার্থিব আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান। একবিধ জ্ঞানের অবলম্বন ইন্দ্রিয়, অপরের অবলম্বন সমাধি, প্রাকৃতে ও অপ্রাকৃতে পার্থক্য এই। ধ্যান এই অপ্রাকৃত জগতের দ্বারস্বরূপ।

'ধ্যানে বহিরিন্দ্রিয়ের চেষ্টা ক্রমে রুদ্ধ হইয়া আসে। সমাধিতে এ চেষ্টা একান্তভাবে রহিত হইয়া যায়।...

'সমাধিতে যাহা প্রত্যক্ষ হয় তাহা অপ্রাকৃত। সমাধিভঙ্গে সেই অপ্রাকৃত সাক্ষাৎকারের পুণ্যস্মৃতি, উপযোগী প্রাকৃত বিষয়কে অবলম্বন করিয়া মানসপটে প্রকাশিত হয়। ইহা হইতেই দেবতার মানসরূপের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই মানসরূপ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়।'[১৪৭]

'বন্দে মাতরম্' সংগীতের 'সপ্তকোটীকণ্ঠ' থেকে 'নমামি ত্বাং' পর্যন্ত অংশ মায়ের সূক্ষ্ম শরীরের স্বরূপ ভক্তের মানসপটে উদ্ভাসিত হয়েছে।

জন্মভূমির সূক্ষ্ম শরীরের স্বরূপ বাৎসল্যবেষাত্মক। বাৎসল্য মাতা ও সন্তানের মিলিত সত্তারই উপলব্ধি মুখ্য। আর বেষ শব্দের অর্থ পরস্পরের মধ্যে তার ব্যাপ্তি। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, গানটির এই অংশে 'জন্মভূমি হইতে জনগণ যে ঐক্য শক্তি সাহস জ্ঞান ধর্ম বিদ্যা প্রভৃতির অনুপ্রেরণা পাইতে পারে ও পায়' তা-ই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমরা এই সম্পর্ককে বলেছি 'বাৎসল্যবেষাত্মক'। অর্থাৎ মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক পরস্পরের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েই সত্য ও সার্থক। স্বদেশভক্ত সন্তানই যে মায়ের শক্তির পরম উৎস এই কথাই বঙ্কিমচন্দ্র এই অংশের পংক্তিপুঞ্জকে বলেছেন :

সপ্তকোটীকণ্ঠ-কলকলনিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈধৃতখরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।

পৌরাণিক দেবীগণের সঙ্গে এইখানেই জননী জন্মভূমির মৌল পার্থক্য রচিত হয়েছে। পৌরাণিক দেবীরা দৈবশক্তিতে বলীয়সী। কিন্তু জন্মভূমির শক্তি তাঁর সন্তানবৃন্দ। সন্তানের বলেই তিনি 'বহুবলধারিণী', এবং সেই বলে বলীয়সী হয়েই তিনি বিঘ্ন-বিপদ-'তারিণী' এবং 'রিপুদলবারিণী'। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'রিপুদলবারিণী' শব্দটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তারিণী মা আমাদের 'রিপুদলনাশিনী' নন, 'রিপুদলবারিণী'। শক্তি থাকলেই তা 'পরবিনাশিনী' হবে কেন, কেবল আপৎকালেই, প্রয়োজন হলে তা নিযুক্ত হবে শত্রুনিবারণে। এখানেই য়ুরোপীয় 'প্যাট্রিওটিজম্' থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির মৌলিক পার্থক্য। তাই তাঁর স্বদেশপ্রীতি জাগতিক প্রীতির বিঘ্নস্বরপ না হয়ে তার সোপান-স্বরূপ হয়ে ওঠে। কিন্তু 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। স্বদেশ-প্রীতিই হোক্, আর জাগতিক প্রীতিই হোক্, যে শক্তিহীন তার দ্বারা কিছুই সম্ভব নয়। গত সহস্র বৎসর ধরে আমরা দিন দিন শক্তিহীন হয়েছি বলেই আমাদের বিড়ম্বনা আর দুর্গতির শেষ নেই। স্বামী বিবেকানন্দ 'ভারতীয় জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ' ['Vedanta in its application to Indian Life'] ভাষণে বলেছেন :

What we need is strength, who will give us strength? There are thousands to weaken us, and of stories we have had enough. ...Everything that can weaken us as a race we have had for the last thousand years. It seems as if during that

period the national life had this one end in view, viz how to make us weaker and weaker till we have become real earthworms crawling at the feet of every one who dares to put his foot on us. Therefore, my friends, as one of your blood, as one that lives and dies with you, let me tell you that we want strength, strength, and every time strength.[১৪৮]

পরবর্তী পংক্তিসপ্তকে সন্তান মাতৃসত্তা থেকে তার দেহ-মন-প্রাণের যে ধর্ম ও গুণরাশি প্রাপ্ত হয় তার কথাই বলা হয়েছে :

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

এই পংক্তিসপ্তকের প্রতিটি শব্দ গূঢ়ার্থে গ্রহণযোগ্য। বিদ্যা নিশ্চয়ই অধ্যায়নজনিত জ্ঞান নয়। শাস্ত্রে মৃত্যুতরণ বিদ্যাকে বলা হয়েছে 'অবিদ্যা', আর অমৃতত্বদায়ক বিদ্যাকেই বলা হয়েছে সত্যকারের বিদ্যা। 'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে'। 'তুমি বিদ্যা' অর্থ তোমাকে জানাই যেমন পরমতত্বজ্ঞান লাভ করা, তেমনি তোমার উপলব্ধিই 'অমৃত সমান'।

'ধর্ম' বলতে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, অনুশীলনের দ্বারা শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিনিচয়ের উৎকর্ষণেই মানুষ যে মনুষ্যত্ব লাভ করে, সেই মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম। যিনি বলেছেন 'বেদে ধর্ম নহে, ধর্ম লোকহিতে' তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্র 'সর্বধর্মবেত্তা' বলে নমস্কার করেছেন।[১৪৯] 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে 'শারীরিকী বৃত্তি'র আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'যদি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা ধর্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধর্ম'। কেননা 'দুর্বল সমাজকে বলবান সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় সর্বদাই আছে। অতএব আপনার দেশরক্ষা ভিন্ন আত্মরক্ষা নাই। আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা যদি ধর্ম হয়, তবে দেশরক্ষাও ধর্ম। বরং আরও গুরুতর ধর্ম, কেননা এস্থলে আপন ও পর, উভয়ের রক্ষার কথা।'[১৫০] 'ধর্মতত্ত্বে'র উপসংহারেও শিষ্য গুরুপ্রোক্ত ধর্ম-তত্ত্বের সার সংকলন করে বলেছেন 'স্বদেশপ্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা

উচিত।' কাজেই 'তুমি ধর্ম'—এই উক্তির অর্থ হল জন্মভূমির প্রতি পরম অনুরক্তিই সন্তানের ধর্ম, তার অন্য কোনো ধর্ম নেই।

'তুমি হৃদি, তুমি মর্ম / ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে'—এই অংশে সন্তানের সত্তায় মাতৃচেতনা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে উঠেছে। 'তুমি হৃদি' বলতে সন্তান জননীকে অন্তঃকরণে প্রতিষ্ঠিত করলেন। পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণ-সমষ্টি থেকে অন্তঃকরণের উৎপত্তি। সেই অন্তঃকরণে ষড়্‌গুণান্বিত পঞ্চ-ভূতের একত্র মিলনকে বলে মর্ম। এই মর্মমধ্যেই প্রাণের অবস্থিতি। 'প্রাণাঃ শরীরে' বলতে ভিন্ন-ভিন্নবৃত্ত পঞ্চপ্রাণই অভিব্যঞ্জিত। গূঢ়ার্থে জন্মভূমি সন্তানের জীবনস্বরূপিণী।

পূর্বেই বলা হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মানুষের বৃত্তিনিচয় দু'ভাগে বিভক্ত—শারীরিক ও মানসিক। মানসিক বৃত্তি আবার ত্রিবিধ—জ্ঞানার্জনী কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী। শারীরিকী বৃত্তিই সর্বাগ্রে স্ফুরিত হয়। এই বৃত্তির যথার্থ অনুশীলনে জন্মভূমিই সন্তানের দেহে শক্তিরূপে বিরাজমানা। 'বাহুতে তুমি মা শক্তি'। 'হৃদয়ে' অর্থাৎ অন্তঃকরণে জন্মভূমির প্রতি সন্তানের পরম অনুরক্তিই মানসিক বৃত্তিনিচয়ের অনুশীলনের নিঃশ্রেয়স। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি।' স্বদেশভক্তের সমগ্র সত্তায়—শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ প্রস্ফুরণের ফলে তাঁর অন্তরে মাতৃমূর্তির প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয়। তখন ভক্ত বলেন, 'তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'।

এই বাক্যটি নিয়ে এককালে প্রচুর বাগাড়ম্বরের উদ্ভব হয়েছিল। মন্দিরের অর্থ গৃহ। দেবমন্দির, নাটমন্দির, পুরমন্দির, পূজামন্দির, হৃদয়-মন্দির প্রভৃতি সমাসবদ্ধ পদই তার সাক্ষ্য বহন করছে। অবশ্য পরে অর্থ-সংকোচের ফলে বাংলায় মন্দির শব্দ দেবমন্দির অর্থ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু সংস্কৃতে মন্দিরের অর্থ ভবন, গৃহ। বঙ্কিমচন্দ্র এই অর্থেই মন্দির শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাই বাক্যটির অর্থ, গৃহে গৃহে তোমারই প্রতিমা রচনা করব। কমলাকান্ত 'আমার দুর্গোৎসবে' বলছে, 'এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্রে, এককালে দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব।'[১৫১] 'আনন্দমঠে'ও মহেন্দ্র মাতৃপ্রণাম করে উঠে জিজ্ঞাসা করছে, 'মার এ মূর্তি কবে দেখিতে পাইব ?' ব্রহ্মচারী বললেন, 'যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।'[১৫২] 'যবে সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে', এই বাক্যেরই রূঢ়ার্থ হল : যেদিন সকল সন্তানের হৃদয়মন্দিরে দেশজননীর মাতৃপ্রতিমা

ঐকান্তিক নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজেই 'মন্দিরে মন্দিরে' যৌগিক অর্থে গৃহে গৃহে, রূঢ় অর্থে ভক্তসন্তানের হৃদয়মন্দিরে।

দেশভক্তের হৃদয়মন্দিরে মাতৃপ্রতিমা সুপ্রতিষ্ঠিত হলে জন্মভূমিই তাঁর একমাত্র আরাধ্য দেবতা হয়ে ওঠেন। তখন তিনি বলেন,

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং।

সংগীতের এই পংক্তিচতুষ্টয় নিয়েই অহিন্দুদের প্রতিবাদ চরমে উঠেছিল। এখানে দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা, কমলদলবিহারিণী কমলা এবং বিদ্যাদায়িনী বাণীর নামোল্লেখেই এই অনবদ্য স্বদেশসংগীত অহিন্দুদের কাছে আপত্তিকর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বাক্যটির সরল অন্বয় করলে দেখা যাবে, 'ত্বং' হচ্ছে এর 'অভিধেয়', বাকিটা তার 'অনুবাদ'। সহজ বাংলা করলে দাঁড়ায়, তুমিই দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা, তুমিই কমলদলবিহারিণী কমলা, তুমিই বিদ্যাদায়িনী বাণী। সন্তানের দৃষ্টিতে 'তুমি' [ত্বং] ভিন্ন অন্য কোনো দেবী নেই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকেই নমস্কার করে বলছেন, 'নমামি ত্বাং'। অর্থাৎ তোমাকেই নমস্কার করি। 'ত্বং' যেমন কর্তৃকারকের একবচন, 'ত্বাং' তেমনি কর্মকারকের একবচন। অর্থাৎ জন্মভূমি যেমন দেশভক্তের এক এবং অদ্বিতীয় ধ্যানের দেবতা, তেমনি তাঁর স্তোত্র রচনা করে ভক্ত সেই এক এবং অদ্বিতীয় দেবতাকেই নমস্কার করে বলেছেন, 'নমামি ত্বাং'।

এই প্রসঙ্গে পুনরায় বিপিনচন্দ্র পালের 'বন্দে মাতরম্' প্রবন্ধটির বক্তব্য উদ্ধারযোগ্য। তিনি বলেছেন,

'দেবতার ধ্যান মাত্রেই প্রাকৃতাপ্রাকৃত মিশ্রিত। ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং—ইত্যাদিতে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দুই মিশিয়া আছে। এখানে মহেশং—অভিধেয়, রজতগিরিনিভং—তাহার অনুবাদ। আগে অভিধেয় পরে অনুবাদ। আগে বিশেষ্য পরে বিশেষণ। যিনি সমাধিতে মহেশের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার জ্ঞানে মহেশই সত্য, রজতগিরিনিভ ইত্যাদি তার উপমা। মহেশের সাক্ষাৎকারে সাধকের অন্তরে যে ভাব হইয়াছিল,—রজতগিরিনিভ সেই ভাবেরই বর্ণনা করিতেছে। যেমন মা সন্তানকে সোনার চাঁদ বলিয়া ডাকেন। ধ্যানের যে ভাবাঙ্গ তাহা প্রাকৃতকে অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠে।'[১৫৩]

বিপিনচন্দ্রের অনুসরণে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র জন্মভূমির যে মাতৃরূপের

ধ্যান করেছেন তার ভাবাঙ্গ হচ্ছে দুর্গা, কমলা ও বাণীর প্রাকৃত প্রতিমা; অভিধেয় জন্মভূমি, অনুবাদ দেবীমূর্তিত্রয়। পুনশ্চ 'আনন্দমঠে' 'ভবানন্দে'র উক্তি স্মরণীয়। মহেন্দ্রকে তিনি বলেছেন, 'আমরা অন্য মা মানি না'...। 'আমরা বলি জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই,—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা...'[১৫৪]।

'আমরা অন্য মা মানি না'—এই উক্তিতে দ্বিধাহীনভাবে অন্যান্য সমস্ত মাতৃদেবীকে অস্বীকার করা হয়েছে।

অথচ, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, অনেকে, এমন কি রবীন্দ্রনাথের মতো কবিসহৃদয়ও একদিন ওই নামাবলীর মধ্যে পৌত্তলিকতার আভাস পেয়েছিলেন, এবং মাত্রাতিরেকী প্রতিকূল সমালোচনায় ঈষৎ অসহিষ্ণু হয়ে শেষ পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসুকে লিখেছিলেন, 'তুমি কি বলতে চাও, 'ত্বং হি দুর্গা' 'কমলা কমলদলবিহারিণী', 'বাণী বিদ্যাদায়িনী' ইত্যাদি হিন্দু দেবী-নামধারিণীদের স্তব, যাদের 'প্রতিমা পূজি মন্দিরে মন্দিরে', সার্বজাতিক গানে মুসলমানদের গলাধঃকরণ করাতেই হবে।'[১৫৫]

উত্তরে অবশ্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য পুনরায় মনে পড়ছে। 'আমাদের মত এই যে, বন্দে মাতরম্ গানটি পৌত্তলিকতাব্যঞ্জক বা পৌত্তলিকতা-প্রণোদিত নহে—যদিও শুনিবামাত্র বা ভাসা ভাসা ভাবে পড়িবামাত্র ইহা পৌত্তলিক গান মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে।'[১৫৬]

অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে প্রশ্ন করতে হচ্ছে, তাহলে রবীন্দ্রনাথও কি সেদিন 'ভাসা ভাসা ভাবে'ই এই পংক্তিগুলির অর্থ গ্রহণ করেছিলেন? তাছাড়া, বুদ্ধদেবকে লেখা চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'যাদের প্রতিমা পূজি মন্দিরে মন্দিরে'...। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু তাঁদের [অর্থাৎ হিন্দুনামধারিণী দেবীদের] প্রতিমা 'পূজার' কথা বলেন নি। বলেছেন, 'তোমার'। 'তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'। রবীন্দ্রনাথ আকস্মিক বিস্মরণবশেই 'গড়ি' স্থলে 'পূজি' এবং 'তোমারই' স্থলে 'তাদের' বলেছেন। বিক্ষুব্ধ কবির এই দুর্ভাগ্যজনক পত্রখানি প্রকাশিত না হওয়াই সমীচীন ছিল।

কেননা, রবীন্দ্রনাথই প্রথম, ১৮৯৬ সালে, বন্দে মাতরম্-এর প্রথম সপ্ত-পংক্তিতে নিজে সুর যোজনা করে কংগ্রেসমণ্ডপে গেয়েছিলেন। বঙ্গদর্শনে প্রকাশের সময় 'বন্দে মাতরম্'-এর সুর ছিল মল্লার, তাল কাওয়ালী। এই 'মল্লার'ই আনন্দমঠের অন্যত্র হয়েছে 'মেঘমল্লার'। তৃতীয় খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদে। আছে, 'তখন উচ্চ নিনাদে মেঘমল্লার রাগে সেই সহস্রকণ্ঠ সন্তান-

সেনা তোপের তালে গায়িল, 'বন্দে মাতরম্'।'[১৫৭] 'তোপের তালে গাওয়া' অবশ্যই রণোন্মাদনার দ্যোতনাবহ। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' সংগীতে প্রথম সুরযোজনা করেছিলেন বিষ্ণুপুরের সুকণ্ঠ গায়ক যদুনাথ ভট্টাচার্য, সংক্ষেপে যদুভট্ট। ললিতচন্দ্র মিত্রের কাছে আমরা জেনেছি, 'বন্দে মাতরম্' রচিত হইবার পরে বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে তদানীন্তন সুকণ্ঠ গায়ক ভাটপাড়ার স্বর্গীয় যদুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ইহাতে সুরতাল সংযুক্ত করিয়া প্রথম গাহিয়াছিলেন।'[১৫৮]

ললিতচন্দ্র যদুনাথকে ভাটপাড়ার লোক বলেছেন। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন বিষ্ণুপুরের লোক। তাঁর শ্বশুরালয় ছিল কাঁচড়াপাড়ায়। সেই উপলক্ষেই তিনি ভাটপাড়া, কাঁঠালপাড়ায় আসতেন। যদুভট্ট নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাজ্যেশ্বর মিত্র বলেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাছে কিছুকাল গানও শিখেছিলেন এবং তৎকালে তাঁকে মাইনে দিতেন মাসিক পঞ্চাশ টাকা।'[১৫৯] রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'যদুভট্ট বা যদুনাথ ভট্টাচার্যকে (১৮৪০-৮৩) দেবেন্দ্রনাথ আহ্বান করিয়া আনিয়া ১৮৭০ অব্দে প্রথম তাঁহার গান শোনেন; তার কয়েক বৎসর পর যদুনাথ ঠাকুরবাড়িতে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি কয়েকটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করিয়াছিলেন। ঠাকুর-পরিবারের সূত্রে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের সহিত তিনি পরিচিত হন; মহারাজ তাঁকে 'রঙ্গনাথ' উপাধি দান করেন। তাঁহার কয়েকটি হিন্দি গানে 'রঙ্গনাথ' নাম পাওয়া যায়।...মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে এই অসামান্য প্রতিভার মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যদুভট্ট-রচিত হিন্দি গান ও সুর লইয়া কয়েকটি বাংলা গান রচনা করেন।'[১৬০] প্রভাতকুমার ওই পাদটীকায় পুনশ্চ লিখেছেন, 'শান্তিদেব ঘোষ 'রবীন্দ্র-সংগীত' গ্রন্থে যদুভট্ট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কবি লিখিয়াছেন, 'ছেলেবেলায় আমি একজন গুণীকে দেখেছিলাম, গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজমর্যাদায় ছিল।...তিনি বিখ্যাত যদুভট্ট।...আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকতেন, নানাবিধ লোক আসত তাঁর কাছে শিখতে; বাংলা দেশে এরকম ওস্তাদ জন্মায় নি। তাঁর প্রত্যেক গানে একটা originality ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়তা'।'[১৬১]

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র সুকণ্ঠ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর 'তাললয়বোধ' অসাধারণ ছিল এবং হারমোনিয়মেও তিনি 'সিদ্ধহস্ত' ছিলেন। রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, প্রিয়নাথ কথক প্রথমে বন্দে মাতরমে সুর দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর দেওয়া সুর বঙ্কিমচন্দ্রের মনোমত হয় নি। যদুভট্টের দেওয়া সুরই তাঁর পছন্দ হয়েছিল। এই সম্পর্কে

আরেকটি মত হল, বন্দে মাতরমের প্রথম সুরদাতার নাম ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনিও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের চুঁচুড়ার জোড়াঘাটের বাড়ির পাশের বাড়িতেই থাকতেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, 'গান যার অন্তরের সিংহাসনে রাজমর্যাদায় ছিল' সেই যদুভট্টই বন্দে মাতরমের সুরস্রষ্টা। বঙ্গদর্শনে যে 'মল্লার—কাওয়ালী' তালের উল্লেখ আছে তা যদুভট্টেরই সৃষ্টি। রাজ্যেশ্বর মিত্র লিখেছেন, 'এটি কিন্তু বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে যদুভট্ট ধ্রুপদী হয়েও 'বন্দে মাতরম্' গানটিকে ধ্রুপদের আদর্শে রূপায়িত করেন নি। কাওয়ালী তালে গীত হওয়ায় গানটি তৎকালীন টপ্পার প্রয়োগবৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হওয়া স্বাভাবিক বলে মনে হয়।'[১৬২]

রাজ্যেশ্বর মিত্র প্রশ্ন করেছেন, রবীন্দ্রনাথ কি যদুভট্টের প্রদত্ত সুরটি শুনেছিলেন? তাঁর মনে এই প্রশ্ন জাগ্রত হওয়ার কারণ এই যে, ' 'দেশ' এবং 'মল্লার' এই দুটি সুরের মধ্যে অনেক দিক দিয়ে সাদৃশ্য আছে এবং অনেকে উক্ত রাগকে 'দেশ-মল্লার'-নামে অভিহিত করে থাকেন।'[১৬৩]

আমাদের বিশ্বাস যদুভট্টের প্রেরণাতেই 'বন্দে মাতরম্' ঠাকুরবাড়িতে বিশেষ সমাদর লাভ করে। কালে কালে এই গানে অনেকেই সুরযোজনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী, দিলীপকুমার ও তিমিরবরণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৬৪] বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন যাঁরা বন্দে মাতরম্ গান গেয়ে দেশের সর্বস্তরে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ঢাকার এক বিখ্যাত জমিদারবংশের সন্তান হরেন্দ্র ঘোষের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়।[১৬৫] ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'জীবনস্মৃতির ভূমিকা'য় লিখেছেন, 'এমন দরাজ গলা জীবনে আর দেখিনি। দশ হাজার লোকের সভায় মাইক ছাড়া গান গাইতেন আর সবাই তা শুনতে পেত।'[১৬৬]

বন্দে মাতরম্ সংগীত বিভিন্ন সুরে গাওয়া সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী একবার বলেছিলেন, দেশের সর্বত্র একই সুরে গানটি গাওয়া উচিত।[১৬৭] পূর্বেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই গানটিতে সুর যোজনা করে বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম কংগ্রেসমণ্ডপে গানটি গেয়েছিলেন। তাঁর 'স্বরবিতান' ষট্চত্বারিংশ খণ্ডে গানটির প্রথম পংক্তিসপ্তকের স্বরলিপি দেওয়া আছে। তাঁর সুরের সঙ্গে সংগতি রেখে সরলা দেবী সমগ্র গানেই সুর দিয়েছিলেন। হরেন ঘোষের উদাত্ত কণ্ঠের সুরও পরবর্তী কালে বহুকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। আমরা মনে করি অখণ্ড বন্দে মাতরমের বিশুদ্ধ স্বরলিপি জাতির অমূল্য সম্পদ হিসাবে রক্ষিত হওয়া উচিত।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাগিনেয়ী সরলা দেবীকে সংগীতের অবশিষ্টাংশে সুর দিতে বলেন। সরলা দেবী বলেছেন রবীন্দ্রনাথের দেওয়া প্রথমাংশের সঙ্গে সংগতি রেখে তিনি সুর দিলেন। রবীন্দ্রনাথ শুনে খুশী হয়েছিলেন। সমস্ত গানটা তখন থেকে চালু হল।[১৬৮] ১৯৩৭ সালে বন্দে মাতরমে পৌত্তলিকতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ যে বিবৃতি দিয়েছিলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দিনে তাঁর মনে যদি সে আপত্তি থাকতো তাহলে কি তিনি সরলা দেবীকে সমগ্র গানে সুর দিতে অনুরোধ করতেন ?

তাছাড়া, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দিনে রবীন্দ্রনাথ যে স্বদেশগীতাঞ্জলি রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে যে মাতৃমূর্তি উদ্ভাসিত হয়েছিল তার কোথাও কোথাও অলংকৃত ভাষায় যে দেবীভাবও আরোপিত হয়েছিল তার প্রতিও আমরা পাঠকের দৃষ্টি পূর্বেই আকর্ষণ করেছি।[১৬৯] আমরা বন্দে মাতরম্ সংগীতে জন্মভূমির সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের যে উল্লেখ করেছি তারও সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে রবীন্দ্রনাথের গানে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন :

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ওই শ্যামলবরন কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা।

এই ভাবসাদৃশ্য সত্যসত্যই বিস্ময়কর। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের স্বোন্মেষণশীলতা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবকে আরো সরস ও মধুর করেছে। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে অন্তরঙ্গ চিঠিপত্রে। ১৯১১ সালে তিনি রচনা করেন 'জনগণমন-অধিনায়ক' গান। তারও পাঁচ বৎসর পরে তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখছেন,

'একদিন চৈতন্য আমাদের বৈষ্ণব করেছিলেন সেই বৈষ্ণবের জাত নেই কুল নেই—আর একদিন রামমোহন রায় আমাদের ব্রহ্মলোকে উদ্বোধিত করেচেন—সেই ব্রহ্মলোকেও জাত নেই দেশ নেই। বাংলা দেশের চিত্ত সর্বকালে সর্বদেশে প্রসারিত হোক্, বাংলা দেশের বাণী সর্বজাতি সর্বমানবের বাণী হোক্। আমাদের বন্দে মাতরং মন্ত্র বাংলাদেশের বন্দনার মন্ত্র নয়—এ হচ্ছে বিশ্বমাতার বন্দনা—সেই বন্দনার গান আজ যদি আমরা প্রথম

উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবী যুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে।'[১৭০]

'বন্দে মাতরম্' সংগীতে রবীন্দ্রনাথ সেদিন যে 'বিশ্বমাতার বন্দনা' শুনেছিলেন তা সংগীতের প্রথমাংশে নেই, আছে সংগীতের শেষাংশে। রবীন্দ্রনাথ দেশের মাটিতে প্রণতি নিবেদন করে বলেছিলেন, 'তোমাতে বিশ্বময়ীর তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।' বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর অমর সংগীত সমাপ্ত করেছেন জন্মভূমির 'ধরণীং ভরণীং' মূর্তির ধ্যান করে।

২৮

'নমামি কমলাং' থেকে সংগীতের শেষাংশে আছে জন্মভূমির কারণ-শরীরের বর্ণনা। তা একান্তভাবেই সমাধিবেদ্য। 'বেদান্তসারে' বলা হয়েছে, 'অস্যেয়ং সমষ্টিরখিলকারণত্বাৎ কারণশরীরং, আনন্দপ্রচুরত্বাৎ কোশ-বদাচ্ছাদকত্বাচ্চানন্দময়কোশং সর্বোপরত্বাৎ সুষুপ্তিঃ, অতএব স্থূল-সূক্ষ্ম-প্রপঞ্চ-লয়স্থানমিতি চোচ্যতে।'[১৭১]

সংগীতের শেষ পংক্তিপঞ্চক হল :

নমামি কমলাম্ অমলাম্ অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরং,
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্ ॥

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, 'বন্দে মাতরমে'র উপসংহারেই বঙ্কিমচন্দ্র জন্মভূমিকে 'কমলা' বলে সম্বোধন করলেন। বলাই বাহুল্য, এই কমলা 'কমলদল বিহারিণী কমলা' নন। সেখানে জননী জন্মভূমি [ত্বং] হচ্ছেন অভিধেয়, 'কমলদলবিহারিণী কমলা' হচ্ছেন তাঁর অনুবাদ। কিন্তু এখানে কমলা হচ্ছেন 'সুজলা সুফলা' প্রাকৃত জননীর সমাধিলব্ধ অপ্রাকৃত স্বরূপ। তাই তিনি 'অমলা' এবং 'অতুলা'। বিশুদ্ধ স্বরূপে অবস্থিত বলেই 'অমলা', এবং সন্তানের অদ্বিতীয়া উপাস্যা দেবী বলেই 'অতুলা'।

'কমলা'রূপিণী জননী সন্তানের মুক্তিপ্রদায়িনী। 'কমলা'র আক্ষরিক ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল ব্রহ্মত্ব ও শিবত্বদাত্রী মহাশক্তি। 'ক (ব্রহ্মত্ব)+ম (শিবত্ব)—লা (দান করা)+ড ; যিনি ব্রহ্মত্ব ও শিবত্ব দান করেন তিনিই কমলা।' ব্রহ্ম হলেন তত্ত্বজ্ঞানী তপস্বী, আর শিব হলেন শুভংকর কল্যাণবিগ্রহ।

অর্থাৎ দেশভক্ত সন্তান একাধারে জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'অনুশীলন ধর্মেই যেমন কর্মযোগ, অনুশীলন ধর্মেই তেমনি জ্ঞানযোগ।'[১৭২] তাঁর মতে 'জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের সংযোগ চাই।'[১৭৩] গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, 'যিনি জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু, কর্মই তাঁহার তদারোহণের কারণ বলিয়া কথিত হয়। অতএব কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।'...'কর্মযোগ ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি জন্মে না। চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানযোগে পৌঁছান যায় না।'...'কর্মযোগের দ্বারা যে ব্যক্তি সংন্যস্তকর্ম এবং জ্ঞানের দ্বারা যার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, সেই আত্মবানকে কর্মসকল বন্ধ করিতে পারে না।'[১৭৪]

অর্থাৎ জ্ঞান এবং কর্ম উভয়ের সংযোগই যে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্মের কাঙ্ক্ষিত বস্তু সংগীতে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কমলারূপিণী জন্মভূমি তাঁর ভক্ত-সন্তানকে জ্ঞানে ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করে তার বন্ধনমুক্তির পথ প্রস্তুত করেন। তারই তত্ত্বার্থ হল ব্রহ্মত্ব ও শিবত্ব দান। কমলাকান্ত তার মাতৃস্তোত্রের অন্তিম চরণে বলেছে, 'নমামি শিরসা দেবীং বন্ধনোহস্তু বিমোচিতঃ।'[১৭৫]

সমাপ্তিপর্বে 'বন্দে মাতরম্' উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখর স্পর্শ করেছে। 'কমলা'-স্তোত্র রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বিশেষিত করে বলেছেন :

শ্যামলাং সরলাম্
সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্ ॥

শ্যামলা, সরলা, সুস্মিতা, ভূষিতা—এই পদচতুষ্টয় মায়ের স্বরূপগত অভিজ্ঞান। শ্যামলা, বলাই বাহুল্য, 'শস্যশ্যামলা' নয়। শব্দকল্পদ্রুমে 'শ্যামলা'র অন্যতম অর্থ হল 'পার্বতী'। 'কমলাকান্ত' 'আমার দুর্গোৎসবে' জননী জন্মভূমিকে বলেছে, 'নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে'।[১৭৬] নিবন্ধশেষে আর্যাস্তোত্রের অনুসরণে যে মাতৃস্তোত্র কমলাকান্ত রচনা করেছে তাতে একবার বলেছে, 'হিমালয়নগবালিকে।'[১৭৭] অন্যবার, 'শৈলপুত্রি বসুন্ধরে'।[১৭৮] 'নগেন্দ্রবালিকা' বা 'হিমালয়নগবালিকা'—এই দুটি অভিজ্ঞানে কমলাকান্তের মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী জন্মভূমি বঙ্গভূমির সীমানা অতিক্রম করে সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-বাহিত সমগ্র আর্যাবর্তে সম্প্রসারিত হয়েছে। ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে অখণ্ড ভারতবর্ষ।

'সরলা'র অর্থ নিগূঢ়তর। 'অমরকোষে' বলা হয়েছে 'দক্ষিণে সরলোদারৌ'। অর্থাৎ দাক্ষিণ্যময়ী, ঔদার্যময়ী—এই অর্থেই জন্মভূমি 'সরলা'।

'সুস্মিতা'র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শব্দকল্পদ্রুমে বলা হয়েছে 'সুষ্ঠু স্মিতং যস্যাঃ'। সুষ্ঠু অর্থাৎ অতিশয় সুন্দর, স্মিত অর্থাৎ মৃদুহাসি। উভয়ের যোগে সুস্মিতার অর্থ হল 'সুন্দরেষন্ধাস্যযুক্তা'। অর্থাৎ, অতীব সুন্দর মৃদু-হাসি যাঁর। সংগীতের প্রথমাংশে মায়ের স্থূল শরীরের বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং'। 'সুস্মিতা'য় তার পুনরুক্তি ঘটেছে বলা ভুল হবে। প্রথম ক্ষেত্রে ছিল মায়ের ইন্দ্রিয়বেদ্য বাহ্যরূপ, সুস্মিতায় মায়ের আন্তর ধর্মের ধ্যানবেদ্য মুখশ্রী উদ্ভাসিত। সেই আন্তর ধর্মের কথা কমলাকান্ত বলেছে মাতৃস্তোত্রে: 'শুভে শোভনে সর্বার্থ-সাধিকে।'[১৭৯] এই শুভংকরী শোভনা সর্বার্থসাধিকা মায়ের 'মনোময়ী প্রাণ-ময়ী আত্মিক' সত্তারই অমলিন মুখশ্রীর অনবদ্য বিশেষণ 'সুস্মিতা'।

'ভূষিতা' শব্দের ইন্দ্রিয়বেদ্য অর্থ হল অলংকৃতা, সজ্জিতা, শোভিতা। শোভিতার অর্থ দীপ্তিময়ী। তাহলে ভূষিতা, 'শোভিতা', দীপ্তিময়ী, দিব্য-কান্তিময়ী। কিন্তু এর অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনা আরো গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে। শব্দকল্পদ্রুমে 'ভূষণে'র অর্থপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'ভূষয়তি ভক্তবৃন্দমিতি ভূষ্যতেঽনেনেতি বা'। এই অর্থে ভূষণ ভাববাচ্যে ক্ত-প্রত্যয়যোগে ভূষিত—স্ত্রীলিঙ্গে ভূষিতা, অর্থাৎ ভক্তসন্তানবৃন্দের গর্ব ও গৌরবস্বরূপিণী কমলা।

সর্বশেষ স্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি জাগতিক প্রীতিতে সম্প্রসারিত হয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। তাই মা হয়েছেন 'ধরণীং ভরণীং'। এখানে এসে দেশমাতা এবং জগন্মাতার প্রভেদ বিলুপ্ত হয়েছে। 'ধর্মতত্ত্বে'র এক-বিংশতিতম 'প্রীতি' অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'দেশবাৎসল্য প্রীতিবৃত্তির স্ফূর্তির চরম সীমা নহে। তাহার উপর আর এক সোপান আছে। সমস্ত জগতে যে প্রীতি, তাহাই প্রীতিবৃত্তির চরম সীমা। তাহাই যথার্থ ধর্ম। যতদিন প্রীতির জগৎপরিমিত স্ফূর্তি না হইল, ততদিন প্রীতিও অসম্পূর্ণ।'[১৮০]

'বন্দে মাতরমে' স্বদেশপ্রীতি 'জগৎপরিমিত স্ফূর্তি' লাভ করেই পূর্ণতা পেয়েছে। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি—ধরণীং ভরণীং—জগতের ভরণকারিণী জগদ্ধাত্রী। এই অন্তিম উচ্চারণে অথর্ববেদের ঋষির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন, 'ভূমিঃ মাতা পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ'। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এমন উদার, এমন গভীর, এমন কোমলকান্ত বিশ্বপ্রীতিপূর্ণ স্বদেশসংগীত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

উল্লেখপঞ্জী

১

১. Sri Aurobindo: Birth Centenary Library, Vol. 17, পৃ ৩৭৭।

২. তদেব, পৃ ৩৬১।

৩. তদেব।

৪. তদেব।

২

৫. Militant Nationalism in India গ্রন্থে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন, The *Vande Mataram* song which now forms a part of the *Anandamath*, was published in the *Bangadarshana* in 1875 ..., স° ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ১৩। মজুমদার মহাশয়ের এই উক্তি স্বকপোল-কল্পিত। কেননা, 'বন্দে মাতরম্' পৃথক সংগীত হিসাবে কোনোদিনই 'বঙ্গ-দর্শনে' প্রকাশিত হয় নি।

৬. দ্রষ্টব্য, 'এস এস বঁধু এস', পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সংকলিত 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ', পৃ ৬০।

৩

৭. ড° বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র সঙ্গে মারাঠী যুবক বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কের [১৮৪৫-১৮৮৩] ব্রিটিশ-বিতাড়নের কল্পনার কিছু কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি তাঁর Militant Nationalism in India গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ফাড়কের কাহিনী বিবৃত করেছেন; এবং গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'আনন্দমঠ ও ফাড়কে' নিবন্ধে তাঁর বক্তব্য বিশদীভূত করার চেষ্টা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে মজুমদার বলেছেন, It is difficult to call it a symptom of a nationalist movement. But he himself had become a sort of a hero in the eyes of many. (পৃ ১২)।

পরিশিষ্ট-ভাগে মজুমদারের বক্তব্য হল: There is no direct evidence to show that Bankim Chandra was aware of the life and writings of Phadke. But there is strong circumstantial evidence to show that the knowledge of the fruitless attempt of Phadke to liberate India and that the unsuccessful attempt of

the Santanas of *Anandamath* bears to a certain extent the impress of this event. (পৃ ১৮৪) ।

কিন্তু মজুমদারের এই অনুমানের দুর্বলতা তাঁর উদ্ধৃত তথ্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তিনি লিখেছেন, বঙ্কিম-সুহৃদ্ অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র যখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে হুগলীতে ছিলেন তখন তিনি আনন্দমঠে বর্ণিত সন্তানদের শেষ সংগ্রামের কাহিনী তাঁকে পড়তে দেন। সুতরাং হাওড়া বদলি হওয়ার পূর্বেই আনন্দমঠ রচিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র হাওড়ায় যোগদান করেন ১৮৮১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি। সুতরাং আনন্দমঠ রচনা ১৮৮০ সালেই সমাপ্ত হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। (মজুমদার, পৃ ১৮১)। ফাড়কের যাবজ্জীবন নির্বাসনের আদেশ হয় ১৮৭৯ সালের নভেম্বরে। (মজুমদার, পৃ ১৮৪)। মজুমদারের বক্তব্য হল, এই অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা সম্ভবত অমৃতবাজার পত্রিকায় পড়ে, তার দ্বারা অনুপ্রাণিত বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু যে উপন্যাস সমাপ্ত হয়েছে ১৮৮০ সালের কোন এক সময়ে সে-উপন্যাসের প্রেরণা এসেছে ১৮৭৯ সালের নভেম্বরের মামলার একটি বিবরণ থেকে, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করা শক্ত। বিশেষত, আনন্দমঠের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ উপন্যাস লেখেন 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। উক্ত উপন্যাস বঙ্গদর্শনে বেরিয়েছিল ১২৮২-১২৮৪ সালে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র পরে 'ক্ষুদ্র কথা'র আকারে 'রাজসিংহ' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় ১২৮৪ চৈত্র থেকে ১২৮৫ ভাদ্র মাসে। তার পরের উপন্যাসই আনন্দমঠ। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের উক্তি মেনে নিলে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ হওয়ার পর তা ১২৮৭ সালের চৈত্র থেকে ধারাবাহিকভাবে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এ থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, আনন্দমঠ রচনা ১২৮৫ সালের ভাদ্রের কোনো এক সময় আরম্ভ হয়ে ১২৮৭ সালের চৈত্রের আগে সমাপ্ত হয়েছে। ১২৮৫ সালের ভাদ্র হল ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর। কিছুদিন বিরতি দিলেও ১৮৭৯ সালের প্রথম ভাগেই আনন্দমঠ রচনা শুরু হয়েছে বলে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। প্রকৃতপক্ষে আনন্দমঠ রচনা ১৮৮০ সালের জুলাই মাসের ১৫ তারিখের পূর্বেই সমাপ্ত হয়েছিল। ওই তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র চুঁচুড়া থেকে নবীনচন্দ্রকে লিখেছেন, তিনি একখানি উপন্যাস রচনা শেষ করেছেন (I have got through···a novel)। পরিষৎ-সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় বলেছেন, এই উপন্যাসই আনন্দমঠ। দ্রষ্টব্য, শতবার্ষিকী সং 'Essays and Letters', পৃ ২০০, পঞ্চদশ সংখ্যক চিঠি, ও তৎসংক্রান্ত পাদটীকা।

তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বলেছেন, তাঁর আনন্দমঠ, 'সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহে'র কাহিনীর দ্বারা অনুপ্রাণিত। এবং 'সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহে'র প্রেক্ষাপটেই তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসও পরিকল্পিত।

উপরন্তু ফাড়কের মামলারও পূর্বে, বঙ্গভূমিতেই 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক রচনার জন্য নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাসের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের বিচার হয়। এই নাটকে এক বাঙালী যুবক একজন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলি করেছিল এবং কারাগারে

অবরুদ্ধ বন্দীরা কারাগার ভেঙে পালিয়েছিল। (দ্রষ্টব্য : দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব আর্টস কর্তৃক প্রকাশিত 'Bankimchandra Chatterjee : Vandemataram' গ্রন্থে ডাঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের প্রবন্ধ 'Vandemataram and the Indian National Struggle', পৃ ২০)। এই নাটক শম্ভু মিত্র-সম্পাদিত 'বহুরূপী' পত্রিকার ৪২-'বিশেষ' [পুরাতন থিয়েটার সংখ্যা]-সংকলন, [মার্চ, ১৯৭৪]-এর, ১৬৭-২ ২ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। নাটকের ভূমিকায় বহুরূপী-সম্পাদক বলেছেন, 'ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ চিত্র এই নাটকে অঙ্কিত।' এই নাটক সম্পর্কে যে মামলা হয়েছিল তার বিবরণও 'বহুরূপী'র উক্ত সংখ্যায় ৬১-৬৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'বহুরূপী'-সম্পাদক মন্তব্য করেছেন, '১৮৭৬-এর ৪ মার্চ তারিখে 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতি-নাট্য অভিনয়ের সময় পুলিশের ডেপুটি কমিশনার সেখানে গিয়ে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু এবং মতিলাল সুর, বেলবাবু প্রভৃতি আটজন অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ—আগে অভিনীত 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক অশ্লীল। আসল কারণ, এই নাটকটি ব্রিটিশ শাসনের অনাচারকে উদ্‌ঘাটিত করেছিল।···মামলায় উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলালের একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। হাইকোর্টের আপীলে তাঁরা খালাস পান। কিন্তু মার্চ মাসেই Dramatic Performances Control Bill কাউন্সিলে আসে এবং ১৮৭৬-এর শেষ দিকে তা আইনে পরিণত হয়।' [পৃ ৬৩]।

'সুরেন্দ্র-বিনোদনী'র বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা হয় ১৮৭৬-এর মার্চে, আর ফাড়কের মামলার রায় বেরোয় ১৮৭৯-র নভেম্বরে।

৮. আনন্দমঠ, সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ, পৃ ১৫৯।

৯. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে স্বদেশপ্রেমের প্রথম উন্মেষ পরিলক্ষিত হয় 'মৃণালিনী'তে। কমলাকান্তের 'একটি গীত'-এর সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। অন্তিম স্তরে আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরাণী-সীতারামে তার পরিণত প্রকাশ। কিন্তু সীতারামের প্রেক্ষাপট স্বতন্ত্র।

৪

১০. 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ'। 'বন্দে মাতরম্'-এর রচনাকাল সম্পর্কে বিশ্বভারতীর তরুণ গবেষক, অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য 'দেশ' পত্রিকার ১৪ আগস্ট ১৯৭৬ সংখ্যায় 'বন্দে মাতরম্ : শতবর্ষ' শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন।

১১. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সংকলিত 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ', পৃ ২৮৭।

১২. 'বঙ্কিমকাহিনী', শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতিথি উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে একটি সভায় আমন্ত্রিত হয়ে শচীশচন্দ্র যে নিবন্ধ পাঠ করেন তারই ঈষৎ পরিবর্ধিত রূপ 'বঙ্কিমকাহিনী'। সাহিত্য-পরিষদে 'বঙ্কিম-জীবনী'র শেষে 'বঙ্কিমকাহিনী' এক সঙ্গে বাঁধাই করা আছে। 'জীবনী'র পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫৮।

'কাহিনীর' পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০। এই 'কাহিনী'রই ১৮-সংখ্যক কথা হিসাবে ৫২-৫৩ পৃষ্ঠায় 'বন্দে-মাতরম্' সম্পর্কিত পিতা-কন্যা-সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে। শচীশচন্দ্র দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁর বঙ্কিমজীবনী নতুন আকারে বিন্যস্ত করেছেন। দ্বিতীয় সংস্করণ দুই ভাগে, পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮৬৪।

১৩. গানটি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে-ভাবে গানটির উল্লেখ করেছেন তাতে মনে হতে পারে তিনি ধরে নিয়েছেন, গানটি রাজনারায়ণেরই লেখা। এই সুযোগে এই পৃষ্ঠার (১৩) একটি মুদ্রণপ্রমাদের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য। শেষ অনুচ্ছেদের পঞ্চম পংক্তিতে 'প্রবন্ধের একস্থলে'র বদলে হবে 'প্রবন্ধের আলোচনার একস্থলে'।

১৪. 'বিবিধ', পরিষৎ সংস্করণ, পৃ ৩৩১।

১৫. তদেব, পৃ ৩৪০।

১৬. ধর্মতত্ত্ব, পরিষৎ-সংস্করণ, পৃ ৫৯-৬০।

১৭. 'কৃষ্ণচরিত্রে'র প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে এই উক্তি লিপিবদ্ধ রয়েছে। দ্রষ্টব্য : পরিষৎ সংস্করণ', 'বিবিধ', ভূমিকা, পৃষ্ঠা সাত আনা।

১৮. 'বিবিধ', পরিষৎ-সংস্করণ, পৃ ৩৬৪।

১৯. কৃষ্ণচরিত্র, পরিষৎ স°, ভূমিকা, পৃষ্ঠা পাঁচ আনা।

২০. দ্রষ্টব্য, ড° রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলা দেশের ইতিহাস', তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৪।

২১. দ্রষ্টব্য, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত (১৯৭১) অনিল শীলের The Emergence of Indian Nationalism, পৃ ৩৬।

২২. তদেব, পৃ ৩৭।

২৩. তদেব, পৃ ২৭।

২৪. শ্রী অরবিন্দের ইংরেজি রচনাবলীর শতবার্ষিক সংস্করণ। তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১০১। অরবিন্দ Bankim Chandra Chatterjee' নামে এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি লেখেন 'Zero' ছদ্মনামে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, বাংলা ও বাঙালী সম্পর্কে ১৯০৬ সালে গোপালকৃষ্ণ গোখলের উক্তি—What Bengal thinks today India thinks tomorrow—অরবিন্দের উক্তিরই প্রতিধ্বনি।

২৫. টেণ্ডুলকর-রচিত মহাত্মা গান্ধীর জীবনী—'Mahatma', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২৪২।

২৬. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ ১৬৪।

২৭. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ ১৪০-১৪১।

৫

২৮. 'Mahatma', তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১০৪।

২৯. মধুসূদনের এই কবিতার ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'মালকোষ ঝাঁপ-তালে' যে গানটি রচনা করেন তা উদ্ধারযোগ্য :

জাগো শ্যামা জন্মদে
প্রসীদ প্রসন্নময়ি বর দে মা বরদে ।
তনয়ে হৃদয়ে ধরি উঠ মা শোক পাশরি
শুভ দে গো শুভংকরী মাগি পদ-কোকনদে ।
পোহাল যামিনী ঘোরা উঠ গো জননী ত্বরা
হেরি মুখ দুখহরা ভাসিব আনন্দহ্রদে ।

দ্রষ্টব্য : অরুণকুমার বসু, 'বাঙলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত', প্রথম সং শ্রীপঞ্চমী ১৩৮৪, পৃ ২০৬। অরুণকুমার তাঁর গবেষণাগ্রন্থের ১৯২ থেকে ২৬৪ পৃষ্ঠায় 'দেশাত্মবোধক গীতি'র আনুপূর্বিক বিবরণ নৈপুণ্যের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন ।

৩০. 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দ্বিতীয় সং, পৃ ১১৮। 'ভারতমাতা'র আলোচনায় অধ্যাপক ঘোষ বলেছেন, 'ভারতমাতা'র মধ্যে জাতীয় ভাবের অবতারণা হইলেও শেষ পর্যন্ত দীনদুঃখী ভারতসন্তানের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছেন কিন্তু মহারানী ভিক্টোরিয়া। ··পরিশেষে ধৈর্য, সাহস ও একতা এই তিনটি চরিত্র আনিয়া আভাস দেওয়া হইয়াছে যে, এই গুলিই পরাধীন ভারতবাসীর মুক্তিপথের ঐকান্তিক অবলম্বন ।

৩১. যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত 'জাতীয় সংগীতে'র সংকলন 'বন্দেমাতরম্' গ্রন্থে সখারাম গণেশ দেউস্করের ভূমিকা [৭ ভাদ্র, ১৩১২] ।

৩২. ১৮৩৮ সালে বঙ্গে তিন চন্দ্রোদয় হয়েছিল—বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র ।

উল্লেখপঞ্জীতে এই অধ্যায়ের (৫) ২৮-সংখ্যক টীকায় ভুলক্রমে লেখা হয়েছে 'Mahatma', তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১০৪ ।' প্রকৃতপক্ষে উক্তিটি শ্রী অরবিন্দের । দ্রষ্টব্য, শ্রী অরবিন্দের ইংরেজি-রচনাবলীর শতবার্ষিক সংস্করণ । তৃতীয় খণ্ড । 'Bankim Chandra Chatterjee' ।

৬

৩৩. 'ভূদেব-রচনাসম্ভার', তৃতীয় সং, ভাদ্র ১৩৭৫ । সম্পাদকীয় ভূমিকা, পৃ এক টাকা এক আনা ।

৩৪. 'ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য' । শিপ্রা লাহিড়ী । 'কবি ও কবিতা প্রকাশন', সং ১৫ আগস্ট ১৯৭৬, পৃ ১৮৯-২১৫ ।

৩৫. তদেব, পৃ ২১৬-২৩৮ ।

৩৬. তদেব, পৃ ৯ ।

৩৭. তদেব ।

৩৮. Memories of My Life and Times, Vol I, Edn. 1932, পৃ ২২৭ ।

৩৯. শ্রীমতী শিপ্রা লাহিড়ীর 'ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ১৯৭ ।

৪০. তদেব, পৃ ২০১-২০২ ।

৪১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'গীতবিতান—কালানুক্রমিক সূচী', প্রথম খণ্ড, সং ১৯৭৩, পৃ ৯৩।

৭

৪২. শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজি রচনাবলী, শতবার্ষিকী সং, সপ্তদশ খণ্ড, পৃ ৩৪৭।
৪৩. দ্রষ্টব্য, যোগেশচন্দ্র বাগলের 'মুক্তির সন্ধানে ভারত', সং ১৩৪৭, পৃ ২২৫।
৪৪. তদেব, পৃ ২৩৫।
৪৫. 'বাংলা দেশের ইতিহাস', ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২২।
৪৬. দ্রষ্টব্য, 'মুক্তির সন্ধানে ভারত', সং ১৩৪৭, পৃ ২৩৯।
৪৭. দ্রষ্টব্য, ড° রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলা দেশের ইতিহাস', ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২৩-২৪।
৪৮. তদেব, পৃ ২৪।
৪৯. তদেব, পৃ ২৭।
৫০. 'মুক্তির সন্ধানে ভারত', পৃ ২৪৮-৪৯।
৫১. রবীন্দ্রবচনাবলী [বিশ্বভারতী সং]-১০, পৃ ৬১৩-৬১৯
৫২. 'Tagore as a Political Thinker', Golden Book of Tagore, পৃ ১৭০-১৭১।

৮

৫৩. দ্রষ্টব্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী', ২য় খণ্ড, সং ১৩৬৮, পৃ ১৩৬-৩৮।
৫৪. প্রভাতকুমার লিখেছেন [২য় খণ্ড, পৃ ১৩৬] 'সেগুলি [রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-সংগীতগুলি]…অনতিকালের মধ্যে 'বাউল' নামে পুস্তিকায় প্রকাশিত হইল।' কিন্তু 'বাউল' গ্রন্থে মাত্র ২০টি গান প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত 'বাউল' গ্রন্থের গানের তালিকা : সার্থক জনম আমার, আমরা পথে পথে যাব সারে সারে, আমার সোনার বাঙলা, ও আমার দেশের মাটি, বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, আমি ভয় করব না, নিশিদিন ভরসা রাখিস, এবার তোর মরা গাঙে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ, আজি বাঙলা দেশের হৃদয় হতে, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, যে তোরে পাগল বলে, ওরে তোরা নাই বা কথা, যদি তোর ভাবনা থাকে, আপনি অবশ হলে, জোনাকি কী সুখে ঐ, মা কি তুই পরের দ্বারে, তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে, ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে, ঘরে মুখ মলিন দেখে [মোট ২০টি]
৫৫. রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, পৃ ১৪০।
৫৬. তদেব, পৃ ১৩৭।
৫৭. দ্রষ্টব্য, অখণ্ড গীতবিতান, সং পৌষ ১৩৭৭, পৃ ২৪৩-২৬৭।

৫৮. দ্রষ্টব্য, 'গীতবিতান—কালানুক্রমিক সূচী' পৃ ১২৬।

৫৯. তদেব, পৃ ১৩০।

৬০. তদেব, পৃ ১২৬-১৩২। গানগুলির বিস্তৃত বিবরণ সেখানে দ্রষ্টব্য।

৬১. সপ্তদশ ও অষ্টাদশ গান সম্পর্কে প্রভাতকুমারের 'কালানুক্রমিক সূচী', প্রথম খণ্ডের সংযোজন ও সংশোধন অংশ, পৃ ১৭৬, এবং অখণ্ড গীতবিতান-এর পৃ ৮২৩ দ্রষ্টব্য। এই সুযোগে এই অনুচ্ছেদে একটি মুদ্রণপ্রমাদের উল্লেখ করা কর্তব্য। ৪৪ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম পংক্তিতে মুদ্রিত 'দ্বাদশ ও দ্বাবিংশতি'র বদলে হবে 'দ্বাদশ ও চতুর্বিংশ'।

৬২. অখণ্ড গীতবিতান। 'স্বরলিপিপঞ্জী', পৃ ৮।

৬৩. এই গানটি সম্পর্কে অখণ্ড গীতবিতানের 'জাতীয় সংগীত' পর্যায়ের পৃষ্ঠা ৮১৮-৮১৯ এবং 'গ্রন্থপরিচয়', ৯৯০-৯৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১০

৬৪. দ্রষ্টব্য, উক্ত গ্রন্থ, চতুর্থ খণ্ড, পৃ ২৯।

৬৫. কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত, প্রথম স° মাঘ ১৩৪৩, পৃ ২৩১-২৮১।

৬৬. তদেব। সম্ভবত এই বয়কট-আন্দোলন নিয়ে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া' গ্রন্থে লিখেছেন, 'এমন সময় সব মাটি হোলো, যখন একদল লোক বললেন, বিলিতি জিনিস বয়কট করো। দোকানে দোকানে তাদের চেলাদের দিয়ে ধন্না দেওয়ালেন, যেন কেউ না গিয়ে বিলিতী জিনিস কিনতে পারে। রবিকাকা বললেন, এ কী, যার ইচ্ছে হয় বিলিতী জিনিস ব্যবহার করবে, যরে ইচ্ছে হয় করবে না। আমাদের কাজ ছিল লোকের মনে আস্তে আস্তে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়া—জোরজবরদস্তি করা নয়।... বিলিতী বর্জন শুরু হোলো, বিলিতী কাপড় পোড়ানো হোতে লাগল, পুলিশও ক্রমে নিজ মূর্তি ধরল। টাউনহলে পাবলিক মিটিঙে যেদিন সুরেন বাঁড়ুজ্জে বয়কট ডিক্লেয়ার করলেন রবিকাকা সেই মিটিঙেই দাঁড়িয়ে স্পষ্টই বললেন, 'আমি এর মধ্যে নেই।' দ্রষ্টব্য, 'ঘরোয়া', পৃ ২০-২১।

৬৭. 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী': ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৭০। পৃ ৭৩-৮০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পুস্তিকায় রামেন্দ্রসুন্দরের 'স্বদেশপ্রেম'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সমাজের অর্ধাঙ্গভাগিনী স্ত্রীজাতিকে সেই আন্দোলনের পশ্চাতে রাখিয়া পুরুষজাতির শক্তি ও উৎসাহ বর্ধন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি শক্তিরূপিণী স্ত্রীজাতির জন্য অপূর্ব ভাষায় 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' লিখিয়াছিলেন।'

'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'র ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন, 'বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের দিন অপরাহ্ণে জেমোকান্দি গ্রামের অর্ধসহস্রাধিক পুরনারী আমার মাতৃদেবীর

আহ্বানে আমাদের বাড়ির বিষ্ণুমন্দিরের উঠানে সমবেত হইয়াছিলেন ; গ্রন্থোক্ত অনুষ্ঠানের পর আমার কন্যা শ্রীমতী গিরিজাকর্তৃক এই ব্রতকথা পঠিত হয়।'

স্বদেশী ব্রতপালনে বাংলার পুরনারীগণ যে প্রবল উৎসাহে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার আরেকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর মাতৃদেবী প্রসঙ্গে। 'ঘরোয়া' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন :

'তখনকার সেই স্বদেশী যুগে ঘরে ঘরে চরকাকাটা, তাঁত বোনা, বাড়ির গিন্নি থেকে চাকর বাকর দাস দাসী কেউ বাদ ছিল না। মা দেখি একদিন ঘড় ঘড় করে চরকা কাটতে বসে গেছেন। মার চরকা কাটা দেখে হ্যাভেল সাহেব তাঁর দেশ থেকে মাকে একটা চরকা আনিয়ে দিলেন। বাড়ীতে তাঁত বসে গেল, খটাখট শব্দে তাঁত চলতে লাগল।···ছোটো ছোটো গামছা ধুতি তৈরী ক'রে মা আমাদের দিলেন—সেই ছোটো ধুতি, হাঁটুর উপর উঠে যাচ্ছে, তাই প'রে আমাদের উৎসাহ কত।' পৃ ১৫।

৯১

৬৮. 'ঘরোয়া', শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীরানী চন্দ। প্রথম স° আশ্বিন ১৩৪৮ ; পৃ ১৬-১৮।

৬৯. দ্র°, রবীন্দ্ররচনাবলী [বিশ্বভারতী]-৪, পৃ ৪৬৮-৪৭৪ ।

৭০. ড° রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলা দেশের ইতিহাস', ৪র্থ খণ্ডের ৪২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৯২

৭১. 'বাংলা দেশের ইতিহাস', চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৪৯।

৭২. তদেব, পৃ ৬৪-৬৫। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এই অধ্যায়ের কাহিনী-রচনায় মূলত ড° রমেশচন্দ্র মজুমদারের গ্রন্থখানিই অনুসৃত হয়েছে।

৯৩

৭৩. দ্রষ্টব্য, 'A Nation in Making', স° ১৯২৫, পৃ ২২০-২২৭।

৭৪. 'বাংলা দেশের ইতিহাস', চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৬৭।

৭৫. তদেব, পৃ ৬৭-৬৮।

৭৬. 'India Under Morley and Minto,—Politics Behind Revolution, Repression and Reforms' (London, 1964) এম. এন. দাস, পৃ ৩৮-৩৯।

১৪

৭৭. দ্রষ্টব্য, 'মুক্তির সন্ধানে ভারত', যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম সং ১৩৪৭, পৃ ২৩১-৩২।

৭৮. দ্রষ্টব্য, 'বাংলা দেশের ইতিহাস', চতুর্থ খন্ড, পৃ ৫৪।

৭৯. তদেব, পৃ ৫৩-৫৪।

৮০. 'The Swadeshi Movement in Bengal—1903-1908'; সুমিত সরকার, নভেম্বর ১৯৭৩, পৃ ৪২৬-৪৩৬।

৮১. 'বাংলা দেশের ইতিহাস, চতুর্থ খন্ড, পৃ ৭২।

১৫

৮২. এই অধ্যায়ের উপকরণ সংকলিত হয়েছে 'শিবরামু'র কানাড়ি ভাষায় লেখা মূল গ্রন্থের প্রহ্লাদ রাও অনূদিত ইংরেজি সংস্করণ 'Story of a Song' [অনুবাদ অক্টোবর ১৯৭২] থেকে। দ্রষ্টব্য, উক্ত গ্রন্থের 'The Great Headway' শীর্ষক নবম অধ্যায়, পৃ ১০৩-১১৪।

১৭

৮৩. 'জীবনের ঝরাপাতা', সং ফাল্গুন ১৮৭৯ শকাব্দ, পৃ ৩৪।

৮৪. তদেব, পৃ ৪৮।

৮৫. দ্রষ্টব্য, 'স্বরবিতান', সং শ্রাবণ ১৩৭০, পৃ ৮।

৮৬. 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ, সং কার্তিক ১৯৬৯, পৃ ২২৯-৩৩।

৮৭. দ্রষ্টব্য, 'মুক্তির সন্ধানে ভারত', পৃ ২৭৬-২৭৭।

১৮

৮৮. 'The Swadeshi Movement in Bengal', পৃ ৩৩।

৮৯. তদেব, পৃ ৫২৪।

৯০. 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ', পৃ ২৩৪। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই প্রসঙ্গের বিবরণ মুখ্যত 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের 'ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত, প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়' অনুসরণেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য, উক্ত গ্রন্থের পৃ ২২৬-২৫১।

৯১. তদেব, পৃ ২৩৪-৩৫।

৯২. তদেব, পৃ ২২৮।

৯৩. তদেব, পৃ ২৪২।

৯৪. তদেব, পৃ ২৩১।

১৯

৯৫. শিক্ষার বিকিরণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩।

৯৬. এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান লেখকের 'রবীন্দ্রকবিতা-শতক' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শেষ প্রবন্ধ 'ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত' রচনায়। দ্রষ্টব্য, উক্ত গ্রন্থ, পৃ ২০৩-২৩০।

২০

৯৭. 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ', প্রথম সংস্করণ, পৃ ৮৪-৮৫। এই গ্রন্থের 'পরিশিষ্টে' কাজী আবদুল ওদুদের 'বঙ্কিমচন্দ্র' এবং ড° মোহম্মদ শহিদুল্লার 'সাম্যবাদী বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধদ্বয় সংকলিত হয়েছে।

৯৮. প্রকৃতপক্ষে কৃপালনীর প্রবন্ধটি 'Bande Mataram and Indian Nationalism' নামে Visva-Bharati News (October 1937)-এ প্রকাশিত হয়েছিল। 'কম্রেড' পত্রিকায় তা পুনর্মুদ্রিত হয়ে থাকবে। শ্রীকৃপালনী 'বন্দে মাতরম্' গানের বিরুদ্ধেই তাঁর মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মত যে বিশ্বভারতী বা রবীন্দ্রনাথের মত নয়, একথা রথীন্দ্রনাথ জনসাধারণকে জানানো প্রয়োজন মনে করেছিলেন। Hindusthan Standard-পত্রিকার ২৪ অক্টোবর ১৯৩৭ তারিখে প্রকাশিত হয় যে, রথীন্দ্রনাথ উক্ত পত্রিকার জনৈক সংবাদদাতাকে জানিয়েছেন, 'the views on 'Bande Mataram' that had found expression in Prof. Krishna Kripalani's article in the Visvabharati magagine published from Santiniketan, did not represent the official view of Visvabharati or of the poet.' দ্রষ্টব্য, প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনী, চতুর্থ খণ্ড, সংস্করণ ১৩৭১, পৃ ১১২।

৯৯. সুভাষচন্দ্রের এই পত্রখানি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

১০০. সুধীরকুমার চৌধুরীর প্রবন্ধ 'রামানন্দ-প্রসঙ্গ'। দেশ ৩২ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, শনিবার ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২ বঙ্গাব্দ ; পৃ ৪১৫।

১০১. রবীন্দ্রজীবনী, চতুর্থ খণ্ড, সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৭১, পৃ ১১০-১১১। রবীন্দ্রনাথের এই পত্রখানি ১৯৩৭ সালের ২রা নভেম্বর 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল বলে রবীন্দ্রজীবনীকার পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

১০২ দ্রষ্টব্য, ড° রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত-সম্পাদিত, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত ইংরেজি 'বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি—বন্দেমাতরম্' (১৯৬৭), পৃ ৬-৮। উক্ত পুস্তিকার শেষ পৃষ্ঠায় 'নোটস'-এ বলা হয়েছে, 'Jawharlal Nehru's Statement on Vandemataram is his draft of the

Congress Working Committee's Resolution on the song passed on 28 October 1937. ড° দাশগুপ্ত উক্ত পুস্তিকার অন্তর্গত তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, 'The resolution was drafted by Nehru and it is preserved in his handwriting in the Nehru Memorial Museum.', পৃ ১৬।

১০৩. La, Marseillaise, The Encyclopaedia Americana, সংস্করণ ১৯৪৯, Vol 18, পৃ ৩২৯।

১০৪. তদেব।

১০৫ তদেব, Vol. 19, পৃ ৭০২।

১০৬. 'Mahatma', D. G. Tandulkar, Vol 4. পৃ ২৫৯।

২১

১০৭. 'বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ', তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থালয়, স° ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃ ৫৯০।

১০৮. দ্রষ্টব্য, 'প্রবাসী' অগ্রহায়ণ ১৩৪৪, 'প্রসঙ্গকথা', পৃ ২৯২-২৯৪।

২২

১০৯. 'Rabindrnath Tagore, A Centenary Volume 1861-1961', Introduction, p xvi.

১১০. টেণ্ডুলকরের গান্ধীজীবনী 'Mahatma', অষ্টম খণ্ড, পৃ ৯২।

১১১. তদেব, পৃ ৯৩।

১১২. তদেব, পৃ ৯৯।

১১৩. 'সংবিধান, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত', অনুপ চক্রবর্তী। দ্রষ্টব্য, সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত 'স্বদেশ ও সংকল্প', স্বাধীনতা সংখ্যা, ১৫ আগস্ট ১৯৭৭, পৃ ১৪-১৫।

১১৪. The Cambridge History of India, Vol. IV, পৃ ৬০৯। 'Story of a Song' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ১৩৪।

১১৫. 'Story of a Song' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ১৩৫-১৩৬।

১১৬. আনন্দবাজারের [সুরেশচন্দ্র মজুমদারের] প্রয়াসের কথা ইন্দ্র মিত্র তাঁর 'ইতিহাসে আনন্দবাজার' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

'১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে আনন্দবাজার হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড তিমিরবরণের সুর সংযোজনায় ও পরিচালনায় 'বন্দে মাতারম্' রেকর্ড প্রকাশ করেছে। ১২ ইঞ্চি ডবল-সাইডেড রেকর্ড। পল রোজারিও, জে মেন্ডিস, এল কোরিয়া, কালী সরকার, অমিয় ভট্টাচার্য, সুর্য পাল, ডেনিস, রামপ্রসাদ, মহম্মদ আলম শা, ফেডারিক বোস, ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী প্রভৃতি যন্ত্রসংগীতে

অংশ গ্রহণ করেছেন। কন্ঠসংগীতে অংশ গ্রহণ করেছেন ইভা গুহ, আরতি বল, শিবানী সরকার, পরেশ দেব, ধীরেন দাস, সুধীর দাস, সুধীর চক্রবর্তী, সাগরময় ঘোষ। ভারতে ও ভারতের বাইরে এই রেকর্ডের একমাত্র পরিবেশক —মেগাফোন কোম্পানী, ৭৭/১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।'

ইন্দ্র মিত্র তাঁর গ্রন্থে ১৯৩৯ সালের ১৬ এপ্রিল তারিখে আনন্দবাজারে এই সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল তাও সংকলিত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, 'ইহা সম্পূর্ণ সংগীতের রেকর্ড : ইদানীন্তন কালের প্রবর্তিত রীতি অনুসারে মাত্র অনুমোদিত দুই কলির রেকড নহে।'...'তৎকালে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বলিয়াছিলেন যাহাতে সমগ্র বন্দে মাতরম্ সংগীত ভারত-বর্ষের সর্বত্র সহজে প্রচারিত হইতে পারে, বাংলা দেশের পক্ষ হইতে তাহার উদ্যোগ করা কর্তব্য। 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের এই নূতন রেকর্ড সেই উদ্যোগেরই ফল।'...'সংগীতের সহিত রেকর্ডের অপর দিকে সংগীতের অর্কেষ্ট্রা স্বতন্ত্রভাবে প্রদত্ত হওয়ায় ইহা শ্রোতৃবৃন্দের অধিকতর আনন্দ বিধান করিবে।'

দ্রষ্টব্য, 'ইতিহাসে আনন্দবাজার', ইন্দ্র মিত্র। প্রথম সংস্করণ, ৪ অক্টোবর ১৯৭৫, পৃ ১১৫-১১৬।

এই রেকর্ড-সংগীতের অন্যতম গায়ক সাগরময় ঘোষকে প্রশ্ন করে আমরা জেনেছি, তিমিরবরণ 'দুর্গা' রাগে বন্দে মাতরমে নতুন সুর যোজনা করেছিলেন।

মাস্টার কৃষ্ণ রাও অর্কেস্ট্রার উপযোগী করে বন্দে মাতরমে যে সুর যোজনা করেন তার কথা 'Story of a Song' গ্রন্থের 'The Herculean Task' শীর্ষক ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১৪২-১৪৯ পৃষ্ঠায় বিবৃত করা হয়েছে। কৃষ্ণ রাও তাঁর সুরের নাম দিয়েছেন 'রাষ্ট্রীয় রাগ'। 'বন্দে মাতরম্' সংগীত অর্কেস্ট্রার উপযোগী নয়, এই ধারণা যে ভ্রান্ত তা যাঁরা প্রমাণ করলেন তাঁদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র মজুমদার এবং মাস্টার কৃষ্ণ রাও-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১১৭. গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর পরিষদ্ ভারতের সংবিধান রচনা সম্পূর্ণ ক'রে তা বিধিবদ্ধ করেন। সংবিধানের মুখবন্ধে বলা হয়েছে, 'In our Constituent Assembly this twenty-sixth day of November, 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution.'

কিন্তু গণপরিষদ তার পরেও আরো দুমাস ছিল। শেষ অধিবেশন হয় ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি। ওই দিনের বিবরণীর পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখা যাচ্ছে সভাপতি বলছেন, 'I have had co-operation from

the Members all these years. I hope it will not be denied to me today, i. e., on the last day.

তারপর সংবিধানের তিন কপিতে সদস্যগণ স্বাক্ষর করেন। এক কপি হিন্দী ভাষায় হাতে লেখা এবং শিল্পীদের দ্বারা চিত্রাঙ্কিত, দ্বিতীয় কপি ইংরেজি ভাষায় মুদ্রিত, তৃতীয় কপিও হিন্দী ভাষাতেই লেখা।

সদস্যগণের স্বাক্ষরযোজনা সমাপ্ত হলে সবাই সমস্বরে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেন। তারপর মাদ্রাজের অনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার বলেন, 'সভাপতির অনুমতি পেলে আমরা সবাই 'জনগণমন' গানটি গাইব।' সভাপতি অনুমতি দেন। শ্রীমতী পূর্ণিমা ব্যানার্জি ও অন্যান্যরা 'জনগণমন' গান শুরু করেন। সবাই দাঁড়িয়ে সেই সমবেত সংগীতে যোগদান করেন। গান শেষ হলে লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র ও অন্যান্য সদস্যগণ দাঁড়িয়ে 'বন্দে মাতরম্' গান করেন। 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া শেষ হলে সভাপতি বলেন, **'The House will stand adjourned, sine die.** রিপোর্টের সর্বশেষ পংক্তিতে লেখা আছে, **'The Constituent Assembly then adjourned sine die.'**

দ্রষ্টব্য : **Constituent Assembly Debates Report, Vol XII, 24th Jan., 1950,** পৃ ৭।

লক্ষণীয় যে, 'ভারতের সংবিধান' বিধিবদ্ধ হয়েছে ১৯৪৯ সালের নভেম্বরে। আর গণপরিষদে সভাপতির বিবৃতি অনুসারে ভারতের জাতীয় সংগীত [**National Anthem**] সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ১৯৫০ সালের জানুয়ারিতে। সুতরাং 'জাতীয় সংগীত' ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

২৩

১১৮. বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, সাহিত্য পরিষৎ, 'বিবিধ খণ্ড', পৃ ৪১১-৪১২।

১১৯. **The Encyclopaedia Britanica, 11th Edn., Vol. VI, pp 9-10.**—দ্রষ্টব্য : পরিষৎ সংস্করণ 'আনন্দমঠে'র সম্পাদকীয় ভূমিকা, পৃ ছয় আনা।

১২০. বঙ্কিম-শতবার্ষিক সং, সাহিত্য পরিষৎ, 'বিবিধ' খণ্ড, পৃ ২৩৩।

১২১. দ্রষ্টব্য, 'বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী স্মারক সমিতি' কর্তৃক প্রকাশিত বন্দে মাতরম্ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে' অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ 'মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ'। পৃ ১০-১৫।

১২২. **'The Soul of India', Edn. 1958,** পৃ ১৩৪।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ড° সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 'সাহিত্য অকাদেমি'-প্রকাশিত তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি' নামক ইংরেজি গ্রন্থে [প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারি ১৯৭৭] বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃমূর্তি'র সমগোত্রীয় একটি ইতালীয় মাতৃমূর্তি'র সন্ধান দিয়েছেন। তিনি বলছেন,

The principal appeal of Bande Mataram, poetically and ideologically, is that it presents the Mother as both immanent and transcendent. It is thus different from poems like Carducci's 'Ode on the Clitumnus', in which Italia is embedded in the land and its history, but, despite occasional references to ancient gods, seldom soars beyond what is temporal. Equally different is it from Tagore's 'Janaganamana' and similar poems, where India is subordinated to a God who determines her destiny or to an Eternal Charioteer who controls India as well as other countrie . The goddesses referred to in the song are but different facets of the Mother's versatile personality. The only parallel···is to be found in the motto and creed of a secret society called the Delphic Priesthood, which strove for the independence and unification of Italy in early nineteenth century. The name itself, it may be pointed out, is reminiscent of paganism : 'The Delphic Priest, the patriotic priest, the priest militant, spoke thus : My mother has the sea for her mantle, high mountains for her sceptre,' and when asked who his mother was, replied : 'The lady with the dark tresses, whose gifts are beauty, wisdom, and formerly, strength ; whose dowry is a flourishing garden, full of fragrant flowers, where bloom the olive and the vine, and who now groans, stabbed to the heart.'

ড° সেনগুপ্ত এই ডেলফিক্ ঋত্বিকের সঙ্গে 'আনন্দমঠে'র সত্যানন্দের সাদৃশ্য কল্পনা করে প্রশ্ন করেছেন, 'Bankimchandra, a great creative artist, was also a profund scholar with a wide-ranging curiosity. Did he by any chance come to know of the Delphic Society ?' [পৃ. ৫৫]

১২৩. The Soul of India, পৃ. ১০১।

২৪

১২৪. "Villages and Towns as Social Patterns", Benoy Kumar Sarkar, কলিকাতা ১৯৪১, পৃ ৩৫৭। অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায়ের 'Bande Mataram' and Indian Nationalism গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ৭। এই গ্রন্থে 'বন্দে মাতরম্' বলতে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত নয়, 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার কথাই বলা হয়েছে।

১২৫. 'সাধনা', শ্রাবণ, ১৮৯৪। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে উদ্ধৃত। সং বৈশাখ ১৩৪৭, পৃ ৮৬।

১২৬. 'বঙ্কিমজীবনী', শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রথম সং, পৃ ১৬৩।

১২৭. 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র', পাদটীকা পৃ ৩৭।

১২৮. তদেব।

১২৯. 'বিজ্ঞানরহস্য', পরিষৎ সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৪৫, পৃ ৩৭-৩৮।

১৩০. 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রে' উদ্ধৃত, পৃ ৪১।

১৩১. 'Villages and Towns as Social Patterns', পৃ, ৩৫৭।

১৩২. 'ধর্মতত্ত্ব', পরিষৎ সং, পৃ ১৩৪।

১৩৩. তদেব।

১৩৪. The Complete Works of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, May 1900, Vol III, পৃ ৩০০-৩০১।

২৫

১৩৫. বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮৭, পৃ ৫৩৯। পরিষৎ সংস্করণ 'আনন্দমঠে'র সম্পাদকীয় ভূমিকায় উৎকলিত, পৃষ্ঠা ছয় আনা।

১৩৬. বঙ্গানুবাদ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, উদ্বোধন সংস্করণ, মহালয়া ১৩৫০, পৃ ২৭৬-২৭৭।

১৩৭. আনন্দমঠ, প্রথম খণ্ড, একাদশ অধ্যায়। পরিষৎ সং, পৃ ২৭-২৮।

২৬

১৩৮. আনন্দমঠ, পরিষৎ সং, ভূমিকা, পৃ সাত আনা।

১৩৯. অধ্যাপক ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'বিপিনচন্দ্র পাল : জীবন, সাহিত্য ও সাধনা'-র [প্রথম সং জন্মাষ্টমী, ১৩৮০], ৩৬০ পৃষ্ঠায় এই প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন, এবং ৩৬১-৬২ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধটির সার সংকলন করেছেন। ডঃ চক্রবর্তী বলেছেন, প্রবন্ধটি 'দুটি সংখ্যায়' প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে 'ধর্ম' পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় বিপিনচন্দ্রের এই অসামান্য প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। 'কবি ও কবিতা' পত্রিকায় দ্বাদশ বর্ষ

প্রথম সংখ্যার ১১৫ থেকে ১২৬ পৃষ্ঠায় এই দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

১৪০. 'ধর্ম,' প্রথম বর্ষ ঊনবিংশ সংখ্যা, ২৬ পৌষ ১৩১৬, পৃ ৫-৮।

১৪১. তদেব, ২১শ সংখ্যা, ১৮ মাঘ ১৩১৬, পৃ ৫-৮।

১৪২. তদেব, ২৫ মাঘ ১৩১৬, পৃ ৬-৮।

২৭

১৪৩. 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ', রেজাউল করীম, প্রথম সংস্করণ, মে ১৯৪৪, পৃ ৯৮-৯৯।

১৪৪. বর্তমান গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ১০২।

১৪৫. দ্রষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১৯।

১৪৬. আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত, শ্রীমদ্ভারতীবিদ্যাবণ্যমুনীশ্বরকৃত 'পঞ্চদশী', দ্বিতীয় সংকরণ, শ্লোকসংখ্যা ২৩।

১৪৭. দ্রষ্টব্য, 'কবি ও কবিতা', দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ ১১৯-১২০।

১৪৮. The Complete works of Swami Vivekananda, Vol III, Edn 1960, পৃ ২৩৮।

১৪৯. দ্রষ্টব্য, 'ধর্মতত্ত্ব,' চতুর্থ অধ্যায়, পরিষৎ সং, পৃ ২১।

১৫০. তদেব, অষ্টম অধ্যায়, পৃ ৪৫।

১৫১. 'আমার দুর্গোৎসব', কমলাকান্ত। পরিষৎ সং, পৃ ৬৩।

১৫২. 'আনন্দমঠ', প্রথম খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ, পরিষৎ সং, পৃ ৩০।

১৫৩. দ্রষ্টব্য, 'কবি ও কবিতা' দ্বাদর্শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা' পৃ ১২১।

১৫৪. 'আনন্দমঠ', প্রথম খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ, পরিষৎ স°, পৃ ২২-২৩।

১৫৫. দ্রষ্টবা, বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ৯৮।

১৫৬. দ্রষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ৯৯।

১৫৭. আনন্দমঠ, পৃ ১০০।

১৫৮. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সংকলিত 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ,' পৃ ২৮৭। দ্রষ্টব্য : বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ৯।

১৫৯. 'বন্দে মাতরমের সুরযোজনা' : রাজ্যেশ্বর মিত্র। 'শিক্ষা', নবপর্যায় ৩য় বর্ষ, ১১শ-১২শ সংখ্যা, ৩০শে চৈত্র ১৩৮৩। শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী সম্পাদিত 'বন্দে মাতরম্ শতবার্ষিকী সংখ্যা', পৃ ৬৩। ললিতচন্দ্র মিত্র কিন্তু লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র যদুভট্টকে মাসিক ৭০ টাকা দিতেন।

১৬০. রবীন্দ্রজীবনী-১, চতুর্থ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৭৭, পৃষ্ঠা ২৭, পাদ-টীকা ৪।

১৬১. তদেব।

১৬২. 'বন্দে মাতরমের সুরযোজনা', 'শিক্ষা', 'বন্দে মাতরম্ শতবার্ষিকী সংখ্যা', পৃ ৬৪।

১৬৩. তদেব, পৃ ৬৫।

১৬৪. 'জাতীয়তার অগ্নিমন্ত্র', চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শিক্ষা', 'বন্দে মাতরম্ শতবার্ষিকী সংখ্যা', পৃ ৫৩।

১৬৫. 'হরেন্দ্র ঘোষের কণ্ঠে বন্দে মাতরম্' : সুশীলকুমার ঘোষ, 'শিক্ষা', 'বন্দে মাতরম্ শতবার্ষিকী সংখ্যা', পৃ ৭১-৭৪।

১৬৬. 'শিক্ষা'র 'হরেন্দ্র ঘোষের কণ্ঠে বন্দে মাতরম্' প্রবন্ধে উদ্ধৃত, পৃ ৭৩।

১৬৭. ১৯৪৭ সালের ২৯শে আগস্ট কলিকাতায় গান্ধীজীর যে প্রার্থনাসভার বিবরণ বর্তমান গ্রন্থের ১০৫-১০৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে সেই সভার ভাষণে মহাত্মা গান্ধী বলেন, 'there should be one universal notation for 'Bande Mataram' if it was to stir millions ; it must be sung by millions in one tune and one mode. After all, national songs could only be two or three. But they should all have their common notation. It was upto the Shantiniketan authorities or some such authoritative society to produce an acceptable notation.' দ্রষ্টব্য, টেণ্ডুলকর, অষ্টম খণ্ড, পৃ ৯৯।

১৬৮. দ্রষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ৭৮।

১৬৯. দ্রষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ৪৪-৪৭।

১৭০. 'চিঠিপত্র', দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৪৯, পৃ ৫৯। পত্রের তারিখ ২৮ অক্টোবর, ১৯১৬। রথীন্দ্রনাথ তখন শিকাগোতে শিক্ষার্থী ছিলেন।

২৮

১৭১. কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-সংশোধিত এবং উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সটীক বেদান্তসারে'র ৩৬-সংখ্যক এই সূত্রের বঙ্গানুবাদে বলা হয়েছে : 'এই অজ্ঞানসমষ্টি সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চের কারণ। সুতরাং ইহাকে কারণ-শরীর কহে। আনন্দপ্রচুরতাবশত এবং কোশের ন্যায় আবরকতাবশত ইহা আনন্দময় কোশ শব্দেও কথিত হইয়া থাকে। ইহাতে আকাশাদি সমুদায় বিলয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহা সুষুপ্তি, মহাসুষুপ্তি বা প্রলয় শব্দে অভিহিত হয়। সুতরাং এই বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানসমষ্টি স্থূল সূক্ষ্ম সমুদায় জগৎপ্রপঞ্চের বিলয়স্থান বলিয়া কথিত।' পৃ ২৭-২৯।

ভারতীবিদ্যারণ্যমুনীশ্বর-কৃত 'পঞ্চদশী' গ্রন্থের 'তত্ত্ববিবেক' নামক প্রথম অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে বলা হয়েছে :

অবিদ স্বন্যস্তদ্‌বৈচিত্র্যাদনেকধা ।

সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্ ॥

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ বঙ্গানুবাদে বলেছেন, 'উক্ত অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য সেই অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া জীবশব্দে কথিত হয়েন। সেই অবিদ্যার নৈর্মল্য ও মালিন্যের তারতম্য-বিশেষে দেব মানুষ গো অশ্ব প্রভৃতি জীবও অনেক প্রকার হয়। এই পূর্বোক্ত অবিদ্যার নাম কারণ-শরীর, সেই কারণশরীরের অভিমানী জীবসকলকে প্রাজ্ঞ বলা হয়।'

'বেদান্তসার' এবং 'পঞ্চদশী'—উভয়ই বৈদান্তিক গ্রন্থ। গ্রন্থদ্বয়ে ব্যবহৃত শব্দগুলির পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন জ্ঞান না থাকলে মূল এবং বঙ্গানুবাদের অর্থোদ্ধার দুঃসাধ্য।

দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-অনূদিত ও সম্পাদিত কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীর 'অন্নময়াদি পঞ্চকোশের সহযোগে পক্ষিরূপে আত্মনির্দেশ' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষায় 'কারণশরীরে'র অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য: দেব-সাহিত্য কুটীর সংস্করণ, মাঘ ১৩৭৪, পৃ ১০৬-১৪৮।

১৭২. 'ধর্মতত্ত্ব', পরিষৎ-সংস্করণ, পৃ ৮২।

১৭৩. তদেব, পৃ ৮৩।

১৭৪. তদেব, পৃ ৮৩।

১৭৫. 'কমলাকান্ত', পরিষৎ সংস্করণ, পৃ ৬৫।

১৭৬. তদেব, পৃ ৬৩।

১৭৭. তদেব, পৃ ৬৪।

১৭৮. তদেব, পৃ ৬৫।

১৭৯. তদেব, পৃ ৬৪।

১৮০. 'ধর্মতত্ত্ব', পরিষৎ সংস্করণ, পৃ ১১২।